মাইকেল মধুসূদন

অশোক প্রকাশন
কলিকাতা-সাত

প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৩
[মহাকবির মৃত্যু-শতবর্ষ]

MICHEAL MADHUSUDAN

BIOGRAPHY IN BENGALI

এ ৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-৭ হইতে অশোক প্রকাশন-এর পক্ষে
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক প্রকাশিত ও ১/১এ গোয়াবাগান স্ট্রীট কলিকাতা-৬
হইতে কে. বি. প্রিন্টার্স-এর পক্ষে শ্রীহরিপদ সামন্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

পদ্যে অসম সাহস প্রকাশ করলেন মধুসূদন। পাশ্চাত্য হোমর-মিল্‌টন-রচিত মহাকাব্য-সঞ্চারী মন ছিল তাঁর। তার রসে তিনি একান্তভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন বলেই তার ভোগমাত্রেই স্তব্ধ থাকতে পারেন নি। আষাঢ়ের আকাশে সজলনীল মেঘপুঞ্জ থেকে গর্জন নামল, গিরিগুহা থেকে তার অনুকরণে প্রতিধ্বনি উঠল মাত্র, কিন্তু আনন্দচঞ্চল ময়ূর আকাশে মাথা তুলে সাড়া দিলে আপন কেকাধ্বনিতেই। মধুসূদন সংগীতের দুর্নিবার উৎসাহ ঘোষণা করবার জন্যে আপন ভাষাকেই বক্ষে টেনে নিলেন। যে যন্ত্র ছিল ক্ষণধ্বনি একতারা তাকে অবজ্ঞা করে ত্যাগ করলেন না। তাতেই তিনি গম্ভীর স্বরের নানা তার চড়িয়ে তাকে রুদ্রবীণা করে তুললেন। এ যন্ত্র একেবারে নতুন, একমাত্র তাঁরই আপন-গড়া। কিন্তু তাঁর এই সাহস তো ব্যর্থ হল না। অপরিচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঘনঘর্ঘর মন্দ্রিত রথে চড়ে বাংলা সাহিত্যে সেই প্রথম আবির্ভূত হল আধুনিক কাব্য 'রাজবদুন্নত ধ্বনি'···অথচ এর অনতিপূর্বকালবর্তী সাহিত্যের যে নমুনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে এর কি সুদূর তুলনাও চলে। ··

নবযুগের প্রাণবান সাহিত্যের স্পর্শে কল্পনাবৃত্তি যেই নবপ্রভাতে উদ্‌ঘোষিত হল অমনি মধুসূদনের প্রতিভা তথনকার বাংলা ভাষার পায়ে চলা পথকে আধুনিক কালের রথযাত্রার উপযোগী করে তোলাকে দুরাশা বলে মনে করলেন না। আপন শক্তির 'পরে শ্রদ্ধা ছিল বলেই বাংলা ভাষার 'পরে কবি শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন। বাংলা ভাষাকে নির্ভীকভাবে এমন আধুনিকতায় দীক্ষা দিলেন যা তার পূর্বানুবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বঙ্গবাণীকে গম্ভীর স্বরনির্ঘোষে মন্দ্রিত করে তোলবার জন্যে সংস্কৃতভাণ্ডার থেকে মধুসূদন যে সব শব্দ আহরণ করতে লাগলেন সেও নূতন, বাংলা পয়ারের সনাতন সমদ্বিভক্ত আল ভেঙে তার উপর অমিত্রাক্ষরের যে বন্যা বইয়ে দিলেন সেও নূতন, আর মহাকাব্য খণ্ডকাব্য রচনায় যে রীতি অবলম্বন করলেন তাও বাংলা ভাষায় নূতন। এটা ক্রমে ক্রমে পাঠকের মনকে সইয়ে সইয়ে সাবধানে ঘটল না; শাস্ত্রিক প্রথায় মঙ্গলাচরণের অপেক্ষা না রেখে কবিতাকে বহন করে নিয়ে এলেন এক মুহূর্তে ঝড়ের পিঠে—প্রাচীন সিংহদ্বারের আগল গেল ভেঙে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। কাগজের অত্যধিক মূল্য, মুদ্রণের অত্যধিক ব্যয় এবং বইয়ের মন্দা বাজার সত্বেও এই গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দিয়ে ও প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে অশোক প্রকাশনের কর্তৃপক্ষ আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন।

অনবধানতাবশতঃ বইখানিতে কিছু কিছু বর্ণাশুদ্ধি ও মুদ্রণপ্রমাদ রয়ে গেল। সেজন্য পাঠক-পাঠিকারা মার্জনা করবেন, আশা করি। নমস্কারান্তে—

ঋষি দাস

বিষয়-সূচী



১

প্রস্তাবনা

রামমোহনকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, Inaugurator of Modern Age in India—'ভারতে আধুনিক যুগের প্রবর্তক।' তেমনি মাইকেল মধুসূদন ছিলেন ভারতীয় সাহিত্যে আধুনিক যুগের প্রবর্তক। আধুনিক বাংলা সাহিত্য যে গরিমায় আজ বিশ্ব সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত, মাইকেল মধুসূদনই তার সূচনা করেছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবসম্পদ্‌ ও আঙ্গিককে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে গ্রহণের পথ তিনিই দেখিয়েছিলেন সর্বপ্রথম।

বিশ্ব সাহিত্যের মহাসমুদ্রকে মন্থন ক'রে অমৃত সংগ্রহের জন্যে প্রয়োজনীয় দৈবী ও দানবিক দুই শক্তিরই অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর শক্তি ছিল দৈবী, কারণ, তাতে ছিল অতুলনীয় নিষ্ঠা, সাধনা ও আত্মপ্রত্যয়; তাঁর শক্তি ছিল দানবিক, কারণ, তাতে ছিল শক্তির অতুলনীয় দম্ভ এবং গগনস্পর্শী উচ্চাশা। তিনি কেবল ইংরেজী, গ্রীক, লাতিন, ইতালীয়, ফরাসী, জার্মান ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সমুদ্রকে মন্থন করেন নি, ঐসব সাহিত্যের মহাকবিদের সমকক্ষ হওয়ার উচ্চাশা ও অহংকার-ও পোষণ করতেন। তিনি হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিল্‌টন, ব্যাস ও বাল্মীকির রচনাকে কেবল আকণ্ঠ পান করেন নি, তিনি হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিল্‌টন, ব্যাস ও বাল্মীকির সমকক্ষ হয়ে তাঁদের সমান আসনে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবার উচ্চাশা ও অহংকার পোষণ করতেন। তাই তিনি বাল্যকালেই তাঁর প্রিয় বন্ধুকে বলতে দ্বিধা করেন নি,—"Oh! how should I like to see you write my 'Life,' if I happen to be a great poet, which I am

almost sure I shall be…" নিজের কবিত্ব-শক্তি সম্পর্কে দম্ভ ও তাঁর উচ্চাশা তিনি কৈশোরেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন।

মধুসূদনের মধ্যে যে দৈবী ও দানবিক শক্তির মিলন ঘটেছিল, তাই তাঁকে একদিকে যেমন কবিত্বের উত্তুঙ্গ গরিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল, অন্যদিকে তেমনি তাঁকে একদা দুঃখের অতল গহ্বরেও নিক্ষেপ করেছিল। তাঁর জীবনে আমরা দেখেছি, ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাসের রাজসিকতা, দৈন্য-দুঃখের চরম অবস্থা, দেখেছি দেবোপম বন্ধুপ্রীতি, পত্নীপ্রেম, সন্তান-বাৎসল্য, ক্ষুরধার বুদ্ধি, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য—আবার দেখেছি চরম হৃদয়-হীনতা, হঠকারিতা, ঔদাসীন্য, অবহেলা, নির্বুদ্ধিতা, অবিবেচনা, এমনকি স্বার্থপরতা। যে স্বর্গ ও নরকের মিলন ঘটেছে মর্ত্যলোকের সীমানায়, সেই স্বর্গ ও নরকের দুই কোটিকেই আমরা প্রত্যক্ষ করি তাঁর জীবনে। তাই তাঁর জীবন আমাদের যেমন উল্লসিত করে, তেমনি পীড়াও দেয়। মধুসূদনের জীবন-আলেখ্য আলোকে, অন্ধকারে, ঔজ্জ্বল্যে, কালিমায় এমন পরিপূর্ণ যে, তাকে বৈপরীত্যের সমাবেশও বলা চলে।

রামমোহন যখন বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন ভারতে কোম্পানি শাসন সবে শুরু হয়েছিল পিটের নিয়ামক আইন এবং সেই আইনবলে ওয়ারেন হেস্টিংসের বাংলার গভর্নর-জেনারেল পদ লাভের মধ্য দিয়ে। মধুসূদন যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন আরও অর্ধশতাব্দী অতিবাহিত হয়েছিল, ভারতে ইংরেজ শাসন হয়েছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। এই পঞ্চাশ বছরে ইংরেজরা ভারতে তার শাসনযন্ত্রকে যেমন শক্তিশালী ক'রে তুলেছিল, তেমনি তাদের সহায়তায় এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মনীষীরা বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে এক নবযুগের প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই কলেজ ইউরোপ-প্রত্যাগত রাজ-কর্মচারীদের এদেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হ'লেও এদেশীয় ভাষাসমূহের উন্নতিবিধানেরও যন্ত্রস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। ঐ সময়

কেবল এদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যসমূহের ক্ষেত্রে নয়, এদেশীয় সমাজ ও ধর্মের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রেও এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল সারা দেশে। ভারতবর্ষ তার সুষুপ্তির পঙ্কশয্যা থেকে উত্থিত হয়ে উন্নত শিরে আবার দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল।

তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে তার, ঈষৎ হ'লেও, পরিচয় ঘটেছিল। ইংরেজরা মুসলমানদের কাছ থেকেই এদেশ অধিকার করেছিল। তাই মুসলমানরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বৈরিতা পোষণ করতো এবং তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতো। আর হিন্দুরা ইংরেজদের পদানত হ'লেও মুসলমানদের অধীনতা থেকে মুক্তি পেয়ে কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল এবং সাময়িকভাবে হ'লেও ইংরেজদের সহায়ক হয়ে উঠেছিল। রামমোহন প্রভৃতি সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা মনে করতেন, ইংরেজরা ভারতবর্ষকে কেবল ঐক্য, শান্তি ও স্থিতিশীলতাই দেয়নি বা দেবে না, ইংরেজরা একদিন তাকে স্বাধিকারও দেবে।

হিন্দুরা ঐ সময়ে তুটি শিবিরে বিভক্ত হয়েছিলেন। একদল পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারাকে এদেশে প্রবাহিত ক'রে এদেশীয় সমাজ-সভ্যতাকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। অন্য দল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিকেই আঁকড়ে থাকতে চেষ্টা ,করছিলেন। প্রথম যুগে ইংরেজরা এদেশীয়দের সমাজব্যবস্থা ও ধর্মে হস্তক্ষেপ না করবার নীতি গ্রহণ করেছিল। তারা খ্রীষ্টান পাদরিদের পর্যন্ত তাদের অধিকৃত এলাকায় প্রবেশ ক'রে ধর্ম প্রচার করতে দিতে অসম্মত ছিল। পুরাতন-পন্থীরা একে তাঁদের সনাতনী সমাজ ও ধর্ম রক্ষার পক্ষে তুর্লভ সুযোগ মনে করেছিলেন। অন্যপক্ষে রামমোহন প্রভৃতির মতো প্রগতিবাদীরা সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে সরকারের হস্তক্ষেপ ও সাহায্য দাবী করছিলেন। সেজন্য এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার যে একান্ত প্রয়োজন, তা মুক্তকণ্ঠে তাঁরা প্রচার করছিলেন এবং তা নিয়ে সনাতনপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামও চালাচ্ছিলেন। এই উভয় শিবিরই ইংরেজদের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং ইংরেজদের সহায়তায়

নিজ নিজ পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। প্রগতিবাদীরা সনাতন হিন্দু সমাজ ও ধর্মের সংস্কার চাইলেও তাঁরাও হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে সনাতনপন্থীদের চেয়ে পশ্চাদ্‌পদ ছিলেন না। হিন্দুধর্মকে বিদেশীয়রা যখন পৌত্তলিক ও বহু-দৈবিক ব'লে নিন্দা করছিল, তখন রামমোহন প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছিলেন, মূল ও প্রকৃত হিন্দুধর্ম একেশ্বরবাদী এবং মূর্তি-পূজার বিরোধী। খ্রীষ্টধর্ম অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম হ'লেও সব খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ই একেশ্বরবাদী নয়। হিন্দুধর্মের জন্য রামমোহন যখন তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য ও সুতীক্ষ্ণ যুক্তি দিয়ে এইভাবে সংগ্রাম করছিলেন, তখন সনাতনপন্থীরা হিন্দুধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করলেও তার পৌত্তলিকতা, তার অনেকেশ্বরবাদিতা, তার কুসংস্কার, সকল কিছুকেই ধর্মের অবিচ্ছেদ্য ও অপরিবর্তনীয় অঙ্গ ব'লেই ঘোষণা করছিলেন।

মাইকেল মধুসূদনের জীবনে ধর্মান্তর গ্রহণ একটি প্রধান ঘটনা—যা তাঁর সমগ্র জীবনকে ঘোর দুর্বিপাকের মধ্যে ফেলে দেওয়ার অন্যতম কারণ। তাই মধুসূদনের জন্মের প্রাক্কালে হিন্দুধর্মের সংস্কার ও সংরক্ষণ নিয়ে যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল হিন্দু সমাজে, তার কথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ অনুসারে খ্রীষ্টান পাদরিরা ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সুযোগ পেয়েছিল। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্যে তারা হিন্দুধর্মকে হীন প্রতিপন্ন করতে এবং খ্রীষ্ট-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতে সতত ব্যস্ত ছিল। হিন্দুধর্মের উপর এই আক্রমণ রামমোহন বলিষ্ঠ হস্তে প্রতিরোধ করেছিলেন যুক্তি ও পাণ্ডিত্য দিয়ে। তিনি প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছিলেন, আদি ও মূল হিন্দুধর্ম—বেদান্তবাদী হিন্দুধর্ম—এক ও নিরাকার ব্রহ্মেই বিশ্বাসী ; সে তুলনায় ত্রীশ্বরবাদী (Trinitarian) খ্রীষ্টধর্ম বরং অনেকেশ্বরে বিশ্বাসী। রামমোহন যুক্তিতর্ক ও পাণ্ডিত্য দিয়েই কেবল হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন নি, তিনি ভারতবর্ষে নিরাকার একেশ্বরবাদী হিন্দুধর্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং মধুসূদন যখন মাতৃক্রোড়ে, তখন ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তৎকালীন হিন্দুসমাজের প্রগতি-

বাদী একটি বিরাট অংশ রামমোহন-প্রবর্তিত এই ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। এইভাবেই রামমোহন প্রগতিবাদী যুবসমাজকে খ্রীষ্টধর্মের প্লাবন থেকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু মধুসূদন এই প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা পাননি।

মধুসূদনের জন্মের কালে ও প্রাক্কালে আর একটি বিষয় হিন্দু সমাজের প্রগতিশীল অংশকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল, তা ছিল এ দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি কোন্ পথে অগ্রসর হ'লে এ দেশের মানুষের প্রকৃত কল্যাণ হবে। ইংরেজ সরকার এদেশীয়দের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাচীন ধারাকেই অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ অনুসারে কোম্পানিকে প্রতি বৎসর যে অর্থ এদেশীয়দের শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সেই অর্থ তারা সংস্কৃত ও ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাতেই ব্যয় করতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রগতিবাদী হিন্দুরা এ দেশের মানুষের উন্নতি তথা সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের জন্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবর্তন ও প্রসারের জন্যেই উৎসাহী ছিলেন। রামমোহন, ডেভিড হেয়ার ও বিচারপতি স্যার এডোয়ার্ড হাইড ঈস্টের চেষ্টায় বাংলাদেশের তৎকালীন ধনী হিন্দুদের দানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিন্দু বালকদের ইংরেজী শিক্ষার জন্যে 'হিন্দু কলেজ'। মধুসূদনের জন্মের সাত বছর আগে, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে, কলকাতায় 'হিন্দু কলেজ' স্থাপিত হয়েছিল—৩০৪ চিৎপুর রোডে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে। মধুসূদনের জীবন ও চরিত্র গঠনে এই হিন্দু কলেজের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক।

যখন হিন্দুসমাজের অগ্রণী ব্যক্তিরা নিজেদের অর্থে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারে উৎসাহী ও উদ্‌যোগী হয়ে উঠেছিলেন, তখনও কিন্তু ইংরেজ সরকার প্রাচীনপন্থী শিক্ষা-ধারাকেই পুনরুজ্জীবিত ও সম্প্রসারিত করতে চেষ্টা করছিল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার যখন এদেশীয়দের শিক্ষার জন্যে বরাদ্দ সরকারী অর্থ 'সংস্কৃত কলেজ' স্থাপনের জন্যে ব্যয় করবার সংকল্প করলো, তখন রামমোহন তৎকালীন বড় লাট লর্ড আমহার্স্টকে লেখা তাঁর বিখ্যাত

পত্রে লিখলেন: "the Sanskrit system of education would be best calculated to keep the country in darkness."

কিন্তু ইংরেজ সরকার রামমোহনের এই সুপরামর্শে কর্ণপাত করলো না। মধুসূদনের জন্ম বৎসরেই, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে, সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হ'লো সরকারী ব্যয়ে। এর দু বছর বাদে, ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে, কলকাতার পটলডাঙায় সংস্কৃত কলেজ ভবন নির্মিত হলে তারই একাংশে 'হিন্দু কলেজ' স্থান পেলো—যে 'হিন্দু কলেজ' ছিল মধুসূদনের বাল্য ও কৈশোরের লীলা-নিকেতন।

হিন্দু সমাজের অগ্রণী ব্যক্তিরা যখন ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন, তখন সেই সঙ্গে তাঁরা মাতৃভাষা বাংলার উন্নতির জন্যেও সতত সচেষ্ট ছিলেন। বাংলাভাষা যে উচ্চতর ভাবপ্রকাশের সুযোগ্য বাহন হতে পারে, তা প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছিলেন ইংরেজী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত রামমোহন স্বয়ং। ঐ সময়ে দেশে যে সব পাঠশালা প্রচলিত ছিল, সেগুলিতে বাংলাভাষা যাতে উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেদিকেও হিন্দু সমাজের অগ্রণী ব্যক্তিরা অমনোযোগী ছিলেন না।

মাতৃভাষার উন্নতিসাধন এবং ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্যে যে উদ্‌যোগ আয়োজন তৎকালীন বাঙ্গালী মনীষীরা করছিলেন, তারই জীবন্ত ফলশ্রুতি রূপেই যেন মধুসূদনের আবির্ভাব ঘটেছিল। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীনপন্থীদের সমর্থনে ইংরেজ সরকার সংস্কৃত কলেজ স্থাপন ক'রে এদেশে যে শিক্ষানীতি অনুসরণ করতে চেয়েছিল, তা যে ভ্রান্ত ছিল, তা প্রমাণ করবার জন্যেই যেন ঐ বৎসরই মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেছিলেন! তাঁর আবির্ভাব ছিল যেন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও মাতৃভাষার বিজয়-ঘোষণা! ইতিহাসের গতিরোধ করবার ব্যর্থ প্রয়াসের যোগ্য প্রত্যুত্তর!

২

কপোতাক্ষ তীরে

সাগরদাঁড়ি যশোহর শহর থেকে আঠাশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রাম বাংলার আরো বহু গ্রামের মতোই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপরূপ। কিন্তু অন্যান্য গ্রামের চেয়ে এই গ্রামের আরো একটি বিশেষ প্রাকৃতিক আকর্ষণ ছিল—এই গ্রামের প্রান্তবর্তী নদী কপোতাক্ষ। পায়রার চোখের মতো স্বচ্ছ জলে পূর্ণ এই নদ সাগরদাঁড়ি গ্রামখানিকে পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বেষ্টন ক'রে প্রবাহিত। এই নদীতট ছিল মধুসূদনের শৈশবের লীলাভূমি। তাই পরিণত বয়সে দূর প্রবাসে-ও মধুসূদন এই নদীর কথা ভুলতে পারেন নি—
"সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।"

সাগরদাঁড়ি মধুসূদনের জন্মস্থান হ'লেও মধুসূদনের পূর্বপুরুষদের আদিনিবাস ছিল খুলনা জেলার তালা গ্রামে। মধুসূদনের প্রপিতামহ ছিলেন রামকিশোর দত্ত। রামকিশোরের তিন পুত্র—রামনিধি, দয়ারাম, মাণিকরাম। রামকিশোর দত্তের মৃত্যু হ'লে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনিধি অনুজ ভাইদের নিয়ে সাগরদাঁড়িতে তাঁর মাতামহের গৃহে আশ্রয় নেন। তখন থেকেই রামকিশোরের বংশধররা সাগরদাঁড়িতে বাস করতে থাকেন।

রামকিশোরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনিধি ছিলেন মধুসূদনের পিতামহ। রামনিধির চার পুত্র—রাধামোহন, মদনমোহন, দেবীপ্রসাদ ও রাজনারায়ণ। রামনিধির পুত্রেরা সকলেই ছিলেন বিদ্বান ও কৃতী পুরুষ। রাধামোহন ছিলেন যশোহর আদালতের সেরেস্তাদার, মদনমোহন ছিলেন নদীয়া-কুমারখালির মুনসেফ, দেবীপ্রসাদ যশোহর আদালতের উকিল এবং রাজনারায়ণ কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের একজন প্রসিদ্ধ আইনজীবী। চার ভাই-ই প্রভূত অর্থোপার্জন করেছিলেন এবং সাগরদাঁড়ির দত্ত-পরিবার ধনে, মানে,

ঐশ্বর্যে বাংলাদেশের অন্যতম বিখ্যাত পরিবারে পরিণত হয়েছিল। দত্তদের প্রাসাদোপম সুবিশাল ভবন, দেবালয় ও চণ্ডীমণ্ডপ, সুরম্য জলাশয়—সকলই ছিল। দোল-দুর্গোৎসব, অসংখ্য আচার-অনুষ্ঠান, সমারোহের অন্ত ছিল না। ধনের সঙ্গে ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতি। দত্ত-ভ্রাতারা সকলেই সুশিক্ষিত ছিলেন। কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ ছিলেন ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত। তাই তাঁকে লোকে 'মুনশি রাজনারায়ণ' বলতো। সেই সঙ্গে তাঁদের ছিল কাব্যানুরাগ ও সঙ্গীতানুরাগ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের মতোই সাগরদাঁড়ির দত্ত-পরিবারের ওপর লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুয়েরই ছিল সমান কৃপা।

রাজনারায়ণ খুলনা জেলার কাটপাড়া গ্রামের জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা জাহ্নবী দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। কাটপাড়ার ঘোষেরাও ছিলেন সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবার। এঁদের বসতবাটিতে দুই-শতাধিক কক্ষ ছিল। উৎসব-সমারোহ ও বিলাস-ব্যসনের অন্ত ছিল না। এঁরা পল্লীগ্রামেও জুড়ি-ফীটন হাঁকাতেন। এই পরিবারে শিক্ষা-দীক্ষারও অভাব ছিল না। যে যুগে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না, সে যুগেও গৌরীচরণ কন্যাকে গৃহশিক্ষা দিতে কসুর করেন নি। জাহ্নবী দেবী সে যুগের মানদণ্ডে সুশিক্ষিতাই ছিলেন। মধুসূদনের সুহৃদ্ হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় জাহ্নবী দেবী সম্পর্কে লিখেছেন: "...She had a very good knowledge in Bengali literature. Her library was complete with 'Mahabharata,' 'Ramayana,' 'Chandi,' 'Annada Mangal' etc, the few Bengali books then extant."

মধুসূদন ছিলেন রাজনারায়ণ দত্ত ও জাহ্নবী দেবীর জ্যেষ্ঠ সন্তান। বাংলা ১২৩০ সালের ১২ই মাঘ শনিবার—১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি—মধুসূদনের জন্ম হয়।

মধুসূদনের সমাধিস্থলে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে যে সমাধি-স্তম্ভ স্থাপিত হয়েছিল, তাতে তাঁর জন্মবর্ষ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ (Born at Sagardari in

the District of Jessore in 1823 A. D.) উৎকীর্ণ আছে। বাংলা সালকে ইংরেজী সালে পরিবর্তনের সময়ে হিসাবের ভুলেই এই প্রমাদ ঘটেছে। সাধারণত বাংলা সালের সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করলেই ইংরেজী সাল পাওয়া যায়। কিন্তু পৌষের মাঝামাঝি থেকে ইংরেজী নূতন বৎসর আরম্ভ হওয়ায় ঐ সময় থেকে চৈত্র পর্যন্ত গণনার সময়ে ৫৯৪ যোগ করা দরকার। মাঘ মাসে মধুসূদনের জন্ম হয়েছিল। তাই মধুসূদনের ইংরেজী জন্মবর্ষ ১৮২৩ না হয়ে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দই হবে।

মধুসূদনের জন্মের চার বৎসরের মধ্যে জাহ্নবী দেবীর গর্ভে প্রসন্নকুমার ও মহেন্দ্রনারায়ণ নামে রাজনারায়ণের আরও দুই পুত্র হয়। কিন্তু জন্মের এক বৎসরের মধ্যে প্রসন্নকুমারের ও পাঁচ বৎসরের মধ্যে মহেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু ঘটে। তাই মধুসূসদন ছিলেন রাজনারায়ণ ও জাহ্নবী দেবীর একমাত্র জীবিত পুত্র।

মধুসূদন শৈশব থেকে প্রাচুর্যের মধ্যেই মানুষ হয়েছিলেন। তাঁর মাতৃক্রোড়ে তাঁর ন' বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর স্নেহের অংশীদার থাকলেও তিনিই ছিলেন পিতামাতার নয়নের মণি। তাঁর সকল অভিলাষ, সকল আবদারই পূর্ণ হতো। বাল্যকালে অভাব-অনটনের আঁচ লেশমাত্র তাঁকে স্পর্শ করেনি। তাই শৈশব থেকেই অভাব-অনটনে দুঃখ-দৈন্যে পূর্ণ এই কঠিন পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেনি। তাঁর চরিত্রে পরবর্তী জীবনে যে অমিতব্যয়িতা এবং বাস্তব-বুদ্ধির অভাব তাঁকে শোচনীয় দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল, শৈশবের অতিপ্রাচুর্যই ছিল তার মূল কারণ।

তাঁর জীবনের অন্য দিক—সুবিপুল কল্পনা ও কবিত্ব-শক্তি, তারও বীজ উপ্ত হয়েছিল তাঁর শৈশবেই। কপোতাক্ষ-তীরের সেই ছায়াসুশীতল শ্যামশোভাময় নিভৃত পল্লীই কেবল তাঁর মনে কল্পনা ও কবিত্ব-শক্তি জাগ্রত করেনি, আশৈশব রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য-কাহিনীগুলিও তাঁর কল্পনা ও কবিত্ব-শক্তিকে উদ্রিক্ত করেছিল। তাঁর পিতামাতা ও পিতৃব্যরা সকলেই ছিলেন বিদ্যোৎসাহী।

সুখে দুঃখে, ঐশ্বর্যে দৈন্যে, স্বাস্থ্যে পীড়ায় যে জ্ঞানার্জন-স্পৃহা তাঁর চিরকালের সঙ্গী ছিল, তারও অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল তাঁর শৈশবেই। ইংরেজী প্রবচন অনুসারে বলা হয়, শিশুই ভবিষ্যৎ মানুষের জনক। মধুসূদনের জীবনে এই প্রবচন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল।

শৈশবে তাঁদের চণ্ডীমণ্ডপের পাঠশালায় মধুসূদনের বিদ্যারম্ভ হয়েছিল। সকলের পুরোভাগে থাকার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল মধুসূদনের চরিত্রের আর এক বৈশিষ্ট্য। পাঠশালায় সহপাঠীদের মধ্যে সর্বপ্রথম হওয়ার জন্যে তিনি সর্বদা চেষ্টা করতেন। তাঁর জনৈক জীবনীকার তাঁর বাল্যকাল সম্পর্কে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন :

> প্রাতঃকালে, পাঠশালার ছুটি হইলে, অন্যান্য বালকের ন্যায়, মধুসূদনও গৃহে আসিতেন। তাঁহার পুত্র-বৎসলা জননী তাঁহার জন্য নানাপ্রকার উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। মধুসূদনকে সম্মুখে বসাইয়া স্বহস্তে আহার না করাইলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। কিন্তু আহার করাইতে একটু বিলম্ব হইলে মধুসূদন অস্থির হইতেন। তাঁহার সমবয়স্ক অপরাপর বালকেরা, আহার করিতে বসিয়া, আহার্য বস্তুর জন্য, যখন চীৎকার ও কোলাহল করিত, মধুসূদন, সেই সময়ে, শীঘ্র-শীঘ্র কোনরূপে আহার সম্পন্ন করিয়া, এক একদিন হয়ত, অসিদ্ধ ব্যঞ্জন দিয়াই আহার করিয়া সকলের অগ্রে গিয়া পাঠশালায় বসিতেন। পাঠশালার ছাত্রদিগের মধ্যে কিসে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিল। কি গ্রামস্থ গুরুমশায়ের পাঠশালায়, কি হিন্দু কলেজে, সহাধ্যায়িগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে লেখাপড়ায় অতিক্রম করিবে, ইহা তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। যেরূপ আদরে ও গৌরবে তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল, রাজপুত্রগণেরও বোধ হয়, সেরূপ হয় না। তাঁহার বাল্যের ভোগবিলাসের কথা অবগত হইলে, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের অমিতব্যয়িতার ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য তাঁহাকে দোষ দিতে

প্রবৃত্তি হয় না। তিনি স্নানার্থে গমন করিলে, একেবারে ৫।৭ চুল্লীতে অন্ন প্রস্তুত হইতে থাকিত। প্রত্যাগমন করিয়া যে চুল্লীর অন্ন সর্বাপেক্ষা সুসিদ্ধ হইত, তিনি তাহাই আহার করিতেন।

মধুসূদনের বাংলা ভাষায় প্রথম পাঠ পাঠশালার গুরুমশায়ের কাছেই হয়েছিল। কিন্তু এই পাঠ পাঠশালাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জাহ্নবী দেবী বাংলা ভাষায় সুশিক্ষিতা ছিলেন। তৎকালীন প্রচলিত বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। মধুসূদন শৈশবে ও বাল্যে মায়ের অঞ্চলের নিধি ছিলেন। তাই মায়ের সদা-সাহচর্য শৈশবেই মধুসূদনকে বাংলা সাহিত্য ও কাব্যকাহিনীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ দিয়েছিল। বাংলা মহাভারত, রামায়ণ, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতির রচনা বালক মধুসূদনের মনে কাব্যানুরাগ সহজেই সঞ্চারিত করেছিল।

তখনো সরকারী কাজকর্মে, আইন-আদালতে, ফারসী ভাষারই ব্যবহার প্রচলিত ছিল। দেশে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা ও প্রসারের সূচনা হ'লেও তখনও সরকারী কাজকর্মে ও আইন-আদালতে ইংরেজীর প্রচলন হয়নি। তাই রাজনারায়ণ তাঁর পুত্রের জন্য ফারসী ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা করেছিলেন। সাগরদাঁড়ি থেকে অনতিদূরবর্তী শেখপাড়া গ্রামে এক মৌলবীর কাছে মধুসূদন ও তাঁর পিতৃব্যপুত্রেরা সকলেই ফারসী শিখতে যেতেন। শৈশবেই ফারসী ভাষার সঙ্গে মধুসূদনের পরিচয় হয়েছিল। মৌলবী সাহেব ফারসী ভাষা ও সাহিত্য ভালোই জানতেন। তার ওপর বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁর দখল ছিল। তিনি ছাত্রদের ফারসী ভাষার বহু শ্রেষ্ঠ কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনাতেন এবং ছাত্রদের মুখস্থ ও আবৃত্তি করাতেন। এইভাবে ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে শৈশবে পরিচয় ঘটায় তা মধুসূদনের কবিত্ব-শক্তিকে জাগ্রত করবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। ফারসী কবিতা ও গান মধুসূদনের খুবই প্রিয় ছিল। তিনি হিন্দু কলেজে পড়বার সময়ে প্রায়ই ফারসী 'গজল' গেয়ে সহপাঠী ও বন্ধুদের শোনাতেন।

বাল্যকাল থেকেই মধুসূদন ছিলেন সঙ্গীতানুরাগী। তাঁর ছিল মধুর কণ্ঠ। বালক মধুসূদন পল্লীর পথে ও কপোতাক্ষের তীরে ঘুরে বেড়াবার সময়ে প্রায়ই গান গাইতেন। অনেক সময়ে গানের কলি বা পদ ভুলে গেলে তিনি তা নিজেই রচনা করে পূরণ করে নিতেন। এইভাবে তাঁর সঙ্গীতানুরাগ তাঁর কাব্য কবিতা রচনার একটি উৎস হয়ে উঠেছিল। মধুসূদনের এই সঙ্গীতপ্রিয়তা তাঁর সারা জীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। অত্যধিক মদ্যপানের ফলে পরবর্তী জীবনে তাঁর কণ্ঠস্বর ভগ্ন ও কর্কশ হয়েছিল। কিন্তু সংগীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ বিন্দুমাত্র কমেনি। তাঁর জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু মশায় লিখেছেন:

> বাল্যকাল হইতে, কবিতার ন্যায়, গীতবাদ্যের দিকেও তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যগণের ন্যায় তিনিও, আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে গলদশ্রু হইতেন। অবস্থার কোনরূপ পরিবর্তনে তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের হ্রাস হয় নাই। তাঁহার ব্যারিস্টার হইয়া ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর, কোন ব্রাহ্মণ একবার তাঁহার নিকট একটি মোকদ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ জানিবার জন্য গিয়াছিলেন। মধুসূদনের সঙ্গে ব্রাহ্মণের পূর্বপরিচয় ছিল এবং তিনি জানিতেন যে, ব্রাহ্মণ অতিসুন্দর "সখীসম্বাদ" গান করিতে পারেন। মধুসূদন মোকদ্দমার কথা রাখিয়া "সখীসম্বাদ" শুনিবার জন্য ব্রাহ্মণকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, এবং তাঁহার নিকট ক্রমান্বয়ে দশ-পনেরটি সখীসম্বাদ শুনিয়া, বিনা অর্থ গ্রহণে তাঁহার মোকদ্দমা সম্পর্কে উপযুক্ত পরামর্শ দান করিলেন।

পল্লী-প্রকৃতি ও পারিবারিক পরিবেশ, সকলই মধুসূদনের মনে কল্পনা, কবিত্বশক্তি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাইবার পক্ষে অনুকূল ছিল। মধুসূদন তাঁর জীবনের প্রথম আট-ন বছর সাগরদাঁড়িতেই কাটিয়ে ছিলেন। সাগরদাঁড়িতে তিনি সুদীর্ঘকাল প্রত্যাবর্তন করেনি। সম্ভবত ন বছর বয়সেই তিনি কলকাতায় চলে এসেছিলেন। এখন কপোতাক্ষ তীর থেকে তাঁর শিক্ষাকেন্দ্র স্থানান্তরিত হইয়াছিল ভাগীরথী তীরে।

৩

হিন্দু কলেজে

মধুসূদনের বয়স যখন সাত বছর, তখন পিতা রাজনারায়ণ দত্ত সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করবার জন্য কলকাতা চলে আসেন। গোড়ার দিকে তিনি খিদিরপুরে একটি ভাড়াটে বাড়িতে বাস করতে থাকেন। অল্পদিন বাদে তাঁর বন্ধু প্রতিবেশী রামকমল মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় তিনি বড় রাস্তার উপরে একখানি সুন্দর দ্বিতল বাড়ি কেনেন। রাজনারায়ণ এখানে একাকীই থাকতেন। তাঁর স্ত্রী জাহ্নবী দেবী দুই পুত্র মধুসূদন ও মহেন্দ্রকে নিয়ে সাগরদাঁড়িতেই ছিলেন। সম্ভবত যে বৎসর মহেন্দ্রের মৃত্যু ঘটে, সেই বৎসর কনিষ্ঠ শিশুপুত্রের মৃত্যুতে শোকাতুরা জাহ্নবী দেবীকে গ্রামে একাকিনী রাখা সমীচীন নয় ভেবেই রাজনারায়ণ দত্ত মধুসূদনসহ জাহ্নবী দেবীকে খিদিরপুরে আনেন।

রাজনারায়ণ নিজের বুদ্ধিবলে অল্প দিনের মধ্যেই কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাজে নিজের স্থান ক'রে নেন। ওকালতিতে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখান এবং প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। তিনি যশোহরেও অনেক ভূসম্পত্তি কেনেন এবং সেখানে একজন বিশিষ্ট জমিদার ব'লে পরিচিত হন। তাঁর অন্যতম চরিতকার নগেন্দ্রনাথ সোম লিখেছেন যে, "তিনি (রাজনারায়ণ) ব্যবহারশাস্ত্রে এরূপ পারদর্শী ছিলেন যে, প্রথমে তাঁহাকেই সরকারী উকিল নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু প্রসন্নকুমার ঠাকুর যোগাড়-যন্ত্র করিয়া উক্ত পদে নিযুক্ত হন।" নগেন্দ্রনাথ সোম মধুসূদনের বন্ধু হরিমোহন ব্যানার্জির 'Recollections of Michael M. S. Datta' থেকেই উপরোক্ত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। হরিমোহন লিখেছেন: "Moonshe Rajnarayan's practice was so

extensive that it was almost settled that he will be chosen as Government Pleader in Sadar Dewani, but preferment goes by letter and recommendation and he was superseded by Prasanna Kumar Tagore".

রাজনারায়ণ ওকালতিতে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন এবং প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি যে সদর দেওয়ানী আদালতের সরকারী উকিলের পদের জন্যে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর 'যোগাড়যন্ত্র' করে সেই পদে নিজে নিযুক্ত হয়ে তাঁকে বঞ্চিত করেছিলেন, তা সত্য নয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল (১লা বৈশাখ, ১২৫৫) তারিখে প্রকাশিত 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকায় 'সন ১২৫৪ সালের সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ' থেকে এই উক্তির বিরুদ্ধে একটি ছোট্ট প্রমাণ দিয়েছেন :

> পৌষ [১২৫৪] : —সদর আদালতের জজেরা খাস আপীল-ঘটিত মকদ্দমার উকিলবাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে সর্বশ্রেষ্ঠ, অপিচ গোলাম সবদার এবং রমাপ্রসাদ রায় বাবুকে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য করিয়াছেন। পরন্তু রাজনারায়ণ দত্ত প্রভৃতি কয়েকজনকে অযোগ্য বলিয়া পদচ্যুত করিলেন।

রাজনারায়ণ যে সরকারী উকিলের পদের জন্যে প্রার্থী ছিলেন এবং সে পদ তিনি, যে কারণেই হ'ক পান নি, তা সুনিশ্চিত। এতে তাঁর সম্মান মর্যাদা বৃদ্ধির পথে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটলেও তাঁর অর্থোপার্জনের পথে কোনও বিঘ্ন বা অন্তরায় ঘটেনি। রাজনারায়ণ যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন এবং ঐশ্বর্য ও বিলাসের মধ্যে জীবন কাটাতেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

তিনি পুত্রকে সুশিক্ষিত ক'রে তোলার জন্যেও চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। সাগরদাঁড়িতে মায়ের কাছে থেকে মধুসূদন বাংলা ভাষা ও ফারসী কিছুটা শিখেছিলেন। কিন্তু তখনকার যুগের হাওয়া কোন্

দিকে, রাজনারায়ণ তা ভালভাবেই জানতেন। তাই পুত্রকে হিন্দু কলেজেই ভর্তি ক'রে দিলেন।

মধুসূদনের জীবনীকাররা লিখেছেন যে, মধুসূদন ১৩ বৎসর বয়সে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কতকগুলি নির্ভুল যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছেন যে, মধুসূদন ন বছর বয়সে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দেই হিন্দু কলেজের সর্বনিম্ন শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন।

তখনকার হিন্দু কলেজ দু ভাগে বিভক্ত ছিল—জুনিয়র স্কুল ও সিনিয়র স্কুল। দুই মিলিয়ে সর্বসমেত তেরোটি শ্রেণী ছিল। সর্বোচ্চ শ্রেণীকে প্রথম শ্রেণী ও সর্ব নিম্ন শ্রেণীকে ত্রয়োদশ শ্রেণী বলা হ'তো। সর্বনিম্ন ত্রয়োদশ শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত আটটি শ্রেণী নিয়ে ছিল জুনিয়র স্কুল। আর পঞ্চম শ্রেণী থেকে সর্বোচ্চ প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত পাঁচটি শ্রেণী নিয়ে ছিল সিনিয়র স্কুল। সর্বনিম্ন ত্রয়োদশ শ্রেণীতে ছাত্ররা ইংরেজী ভাষা ও অঙ্ক প্রভৃতি কিছু শেখার পর পরবর্তী দ্বাদশ শ্রেণীতে প্রবেশ করতে পারতো। ৮ বছরের কম ও ১২ বছরের বেশী বয়সের ছাত্রকে জুনিয়র স্কুলে ভর্তি হ'তে দেওয়া হ'তো না। এই তথ্যগুলি ব্রজেন্দ্রনাথ এশিয়াটিক জার্নালের ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত করেছেন: "The college is divided into junior and senior schools. In the former, boys not less than eight, and not more than twelve, are admitted. In the latter, none are admitted above twelve, unless qualified to enter one of the senior classes. The utmost limit of admission is fourteen. The students begin in the junior school with the rudiments of English, and rise to the 7th class, by which time they have acquired a tolerable command of the English language, have mastered its grammar,

have advanced in arithmetics to vulgar fractions and have some acquaintance with the elements of geography".

সুতরাং বারো বছর বয়সের পরে জুনিয়র স্কুলে ভর্তি হওয়ার যে কোনও সুযোগ ছিল না, তা সুস্পষ্ট। তাছাড়া, ১৮৩৪ সালে মধুসূদন যে হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন, তার প্রমাণও আছে। তৎকালীন সংবাদপত্র থেকে জানা যায় ১৮৩৪ সালের ৭ই মার্চ শুক্রবার টাউন হলে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানে বালক মধুসূদন শেক্‌সপীয়রের নাটক থেকে গ্লস্টারের ভূমিকা আবৃত্তি ক'রে শোনান। ব্রজেন্দ্রনাথ উপযুক্ত যুক্তিই উত্থাপন করেছেন—"স্কুল-কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় আবৃত্তির ব্যাপারে সচরাচর সুপরিচিত পুরাতন ছাত্রদেরই নির্বাচিত করা হয়। এই কারণে মধুসূদন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্বনিম্ন বা ৮ম জুনিয়র শ্রেণীতে [ত্রয়োদশ শ্রেণীতে] প্রবেশ করিয়াছিলেন—এরূপ মনে করাই সঙ্গত। আরও একটি কথা, ৭ম জুনিয়র শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার পূর্বে জুনিয়র স্কুলের ছাত্রদিগকে সর্বনিম্ন শ্রেণীতে পাঠ লইতে হইত।"

নগেন্দ্রনাথ সোম 'মধুস্মৃতিতে' লিখেছেন: প্রথমে অল্পদিন খিদিরপুরের ইংরেজী স্কুলে পাঠাভ্যাসের পরে মধুসূদন হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিলেন।" সুতরাং এই উক্তিও ভুল।

মধুসূদন যে ন বছর বয়সে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আট বছর প্রতি বছর এক-এক শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে জুনিয়র স্কুলের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে—হিন্দু কলেজের ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠেছিলেন ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি যখন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম শ্রেণীতে পড়তেন, তখন তাঁর সহাধ্যায়ী হয়েছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ভূদেব চৌদ্দ বছর বয়সে ঐ বছর হিন্দু কলেজে এসে ভর্তি হন। তাঁর একখানি চিঠিতে তিনি লিখেছেন: "মধুসূদনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হিন্দু কলেজে। সংস্কৃত

কলেজ ছাড়িবার পরে আমি যখন হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে আসিয়া ভর্তি হই, তখন মধুও ঐ শ্রেণীতে পড়িত।" পর বৎসর মধুসূদন যখন ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ছিলেন, তখন তিনি সহাধ্যায়ীরূপে পান তাঁর সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ও শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু গৌরদাস বসাককে। গৌরদাস বসাক তাঁর Reminiscences of Michael M. S. Datta-এ লিখেছেন: "My acqaintence with Madhu began in 1840, when we were in the 6th class of the old Hindu College." ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দেই রাজনারায়ণ বসুও হেয়ার সাহেবের স্কুল থেকে হিন্দু কলেজে এসে ভর্তি হন। এঁরা তিনজনেই মধুসূদনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং তাঁদের বন্ধুত্ব ছাত্রজীবনের পরেও সুস্থায়ী হয়েছিল। এঁদের উৎসাহ, অভিমত ও প্রেরণা মধুসূদনের পরবর্তী সাহিত্যজীবনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন হিন্দু কলেজের জুনিয়র স্কুলের পাঠ সাঙ্গ ক'রে পঞ্চম শ্রেণীতে—সিনিয়র স্কুলের সর্বনিম্ন শ্রেণীতে—প্রবেশ করেন। ঐ বৎসরই সিনিয়র ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয়। সিনিয়র স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্ররা সিনিয়র বৃত্তি এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্ররা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারত। মধুসূদন ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পঞ্চম শ্রেণী থেকে পরীক্ষা দিয়ে জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। ঐ বৃত্তিলাভের ফলে পর বৎসর, ১৮৪২ সালে, পঞ্চম শ্রেণী থেকে একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময়ে রামগোপাল ঘোষ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ইংরেজীতে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। ঐ প্রতিযোগিতায় মধুসূদনও অংশ নেন। তিনি প্রতিযোগীদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে স্বর্ণপদক লাভ করেন। আর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন তাঁর প্রিয় বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি পান রৌপ্য পদক।

রচনাগুলির পরীক্ষক ছিলেন ইণ্ডিয়ান কলেজের সভাপতি ও সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য সি. এচ. ক্যামেরন। নগেন্দ্রনাথ তাঁর "মধুস্মৃতিতে" লিখেছেন, মধুসূদন "প্রথম শ্রেণীর সহিত প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।" কিন্তু এই উক্তি ঠিক নয়। কারণ, ঐ প্রতিযোগিতায় প্রথম শ্রেণীর ছাত্ররা যোগ দেয়নি। হিন্দু কলেজের ১৮৪২ সালের বার্ষিক বিবরণে লেখা হয়েছে :

It is right here also to mention that a Native Gentleman having offered a Gold Medal for the best, and Silver Medal for the second best Essays on Native Female Education, considered especially with reference to its effect on children of the next generation, Mr. Cameron, the Examiner, awarded the prizes thus the 1st to Modhusudun Dutta and No. 2 to Bhoodeb Mukherjee of the 2nd class. The first class were unwilling of compete these honours.

মধুসূদন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্তই পড়েছিলেন। দশ বৎসর তাঁর এই কলেজে কেটেছিল। এই দশটি বছর এই কলেজ তাঁর জীবনে কী প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা জানতে হ'লে ঐ সময়কার হিন্দু কলেজ সম্পর্কে কিছু জানা দরকার।

রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার এবং বিচারপতি এডোয়ার্ড হাইড ঈস্টের উৎসাহে এবং বিশিষ্ট ধনী হিন্দুদের বদান্যতায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। মধুসূদনের জন্ম বৎসরেই সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। এবং পরে পটলডাঙ্গায় গোল দীঘির পাড়ে সংস্কৃত কলেজ ভবন নির্মিত হ'লে সেই ভবনেই হিন্দু কলেজ ১৮২৬ সালে আশ্রয় নিয়েছিল। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত, এই তিনজনকে বাদ দিলে ঐ যুগের প্রায়

সকল মনীষীই হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। কালীপ্রসাদ ঘোষ, রামকৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, দ্বারকানাথ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামতনু লাহিড়ী, কেশবচন্দ্র সেন, আনন্দকৃষ্ণ বসু, মহেন্দ্রলাল সরকার, সকলেই ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। হিন্দু-কলেজ তখন আজকালকার স্কুল-কলেজ বলতে যা বোঝায়, ঠিক তা ছিল না—ছিল এক নব যুগের প্রাণকেন্দ্র। এই কলেজ থেকেই প্রাণের ধারা সারা দেশকে অভিষিক্ত করতো—রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সকল দিকেই সৃষ্টি করতো আলোড়ন।

হিন্দুদের বদান্যতাতেই হিন্দু কলেজ স্থাপিত ও পরিচালিত হচ্ছিল। কিন্তু ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের কোষাধ্যক্ষ জোসেফ ব্যারেটো কোম্পানী দেউলিয়া হওয়ায় কলেজের যে ভীষণ অর্থসংকট ঘটে, তার ফলে সরকারী সাহায্য নেওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। সরকারী সাহায্য নেওয়ায় সরকারী প্রভাবও এসে পড়ে। গোড়ার দিকে ইংরেজ সরকার খ্রীষ্টান পাদরিদের আনুকূল্য দেখান নি; কিন্তু এখন তাঁদের মনোভাবে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। হিন্দুদের বদান্যতায় স্থাপিত হিন্দু কলেজ কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতা বিস্তারের কেন্দ্র নয়, খ্রীষ্টধর্ম প্রচার এবং হিন্দুধর্মের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াবারও একটি কেন্দ্র হয়ে ওঠে। হিন্দুধর্ম ও সমাজ থেকে কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা দূর করবার জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন ব'লে হিন্দু কলেজ স্থাপনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা রামমোহনকেও হিন্দু কলেজের পরিচালকমণ্ডলী থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই হিন্দু কলেজ এখন হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধ সমালোচনায় এবং হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান ও বিধিনিষেধকে পদে পদে লঙ্ঘন করবার জন্যে প্রেরণা যোগাতে লাগলো। নূতন কিছু গড়বার জন্যে যে ভাঙার কাজ দরকার হয়, হিন্দু কলেজের নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্ররা সেই ভাঙার কাজে অত্যুৎসাহী হয়ে উঠলেন।

রামমোহন থেকে রাধাকান্ত দেব পর্যন্ত সকলেই মাতৃভাষার উন্নতির জন্যে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু হিন্দু কলেজের ছাত্রদের অধিকাংশই বাংলা ভাষাকে গ্রাম্য অশিক্ষিতের ভাষা ব'লে ঘৃণা ক'রে বাংলা ভাষার চর্চাকে অপমানজনক মনে করতে লাগলো। বাংলা গ্রন্থগুলি পাঠাগার থেকে নির্বাসিত হ'লো। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা ও চিঠিপত্র লেখাতেও বাংলা ভাষার ব্যবহার অগৌরবের বিষয় হয়ে উঠলো। স্বদেশীর আচার-ব্যবহারের সঙ্গে স্বদেশীর ভাষা ও সাহিত্য পরিত্যক্ত বা পরিত্যাজ্য বলে গণ্য হ'লো।

এজন্যে প্রধানত দায়ী করা হ'লো কলেজের তরুণ অধ্যাপক ডিরোজিওকে। মধুসূদনের হিন্দু কলেজে প্রবেশের বহু পূর্বে হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর রাজত্ব চলছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনে ডিরোজিওর অসাধারণ অধিকার ছিল। মাত্র তেইশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল এবং মাত্র কয়েক বছর তিনি হিন্দু কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদের মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তা বিস্ময়কর। ডিরোজিওর প্রতিভাও ছিল বিস্ময়কর। তিনি অসাধারণ কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন। মাত্র আঠারো বছর বয়সে লেখা তাঁর ইংরেজী কবিতাগুলি অনেক প্রবীণ কবিকেও লজ্জা দিতে পারতো। ছাত্রদের মানসিক বিকাশের দিকেই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি ছাত্রদের কেবল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত থাকতেন না, তিনি তাঁদের অনেককেই নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েও শিক্ষা দিতেন। তিনি তাদের পাশ্চাত্য কবিদের উৎকৃষ্ট রচনা, রোম গ্রীস প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ইতিহাস, তাদের স্বদেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের কাহিনী প্রভৃতি পড়ে শোনাতেন। তিনি নিজে কলেজে থাকার সময়ে 'হেস্পেরস' নামে যে কাগজ প্রকাশ করতেন, তাতে ছাত্রদের লিখতে উৎসাহ দিতেন। যুক্তিবাদ, স্বদেশপ্রেম এবং যাকেই কুসংস্কার ব'লে মনে করা হ'তো, তাকেই ছিন্নভিন্ন করবার একটা উদ্দাম উন্মত্ত প্রেরণা তাঁর ছাত্ররা

লাভ করতো তাঁর কাছ থেকে। হিন্দুধর্মের কুসংস্কারগুলির বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা গোমাংস খেতেও পশ্চাদ্‌পদ হতো না। ডিরোজিওর প্রেরণায় ও উৎসাহে নব্যবঙ্গের তরুণরা মেতে উঠলো। হিন্দু সমাজে গেল গেল রব উঠলো। হিন্দু কলেজের পরিচালকমণ্ডলী চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ফলে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিওকে কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হ'লো।

কিন্তু ডিরোজিও কলেজ থেকে বিতাড়িত হ'লেও তাঁর প্রভাবকে হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়িত করা গেল না। ডিরোজিও বিতাড়নের ছু বছর পরে মধুসূদন হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু তখনও ডিরোজিও ও নব্যবঙ্গের প্রভাব হিন্দু কলেজে পুরোমাত্রায় বর্তমান ছিল।

দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্মে সরকারের উৎসাহ ও সাহায্য দাবী ক'রে সংগ্রাম করেছিলেন রামমোহন। তাঁর মৃত্যুর ছু বছর বাদেই সরকার রামমোহনের দাবীকে স্বীকৃতি দিলেন এবং ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বড় লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তারেই সরকার উদ্‌যোগী হবেন, এই নীতি ঘোষণা করলেন। তাঁর কাউন্‌সিলের আইন সদস্ত ও বিখ্যাত ইতিহাসকার লর্ড মেকলে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অতিরঞ্জিত ভাষায় বললেন: "A single shelf of a good European library is worth the whole native literature of India and Arabia." নব্য শিক্ষিতদের কাছে মেকলের এই উক্তি বেদবাক্য ব'লে মনে হ'লো। মাতৃভাষা ও ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাদের ঘৃণা পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো।

এখন হিন্দু কলেজে ইংরেজী শিক্ষার উপরই নজর দেওয়া হ'লো। মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজে পড়েন, তখন হিন্দু কলেজের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে ইংরেজী সাহিত্যের পাঠসূচী কি ছিল, রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে দিয়েছেন। বেকনের 'এসেজ্', শেক্‌স্‌পীয়রের ম্যাক্‌বেথ, কিং লীয়ের, ওথেলো ও হ্যামলেট, মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট, লিসিডাস, কোমাস, ল্'এলেগ্রো, ইল্ পেন্‌সেরসো, সনেট্‌জ্‌

ইত্যাদি, পোপের 'এসে অন ক্রিটিসিজম্', 'রেপ অব দি লক', ইলয়সা টু আবেলার্ড, এলিজি অন দি ডেথ অফ এ ইয়ং লেডি, প্রোলোগ টু দি স্যাটায়ার্স্ ইত্যাদি, ইয়াং-এ নাইট থট্‌জ্ এবং গ্রেজ্ 'পোয়েম্‌জ্'। মধুসূদন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি শ্রেণীর নির্ধারিত পাঠসূচীর তোয়াক্কা রাখতেন না, ইংরেজী সাহিত্যকে গ্রোগ্রাসে গিল্‌তেন। পাঠসূচীর ভেতরে ও বাইরে, প্রাচীন ও আধুনিক কবি ও সাহিত্যকদের রচনার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। পরবর্তী কালে তিনি মিল্‌টনের অনুকরণে কাব্য রচনা ক'রে মহাকবি হ'লেও ছাত্রজীবনে কিন্তু তাঁর প্রিয় কবি ছিলেন স্কট ও বায়রন। বাইরনের জীবনও তাঁর কাছে অনুকরণীয় ও আদর্শ হয়ে উঠেছিল।

ইংরেজী সাহিত্যে মধুসূদনের অসাধারণ অধিকার জন্মেছিল। ঐ সময়ে কলেজের অধ্যক্ষ ও ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন ক্যাপটেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন। রিচার্ডসন সামরিক জীবন থেকে শিক্ষক জীবনে এলেও তাঁর শিক্ষাদানের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তাঁর সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন:

> আমাদিগের সময়ে কাপ্তেন সাহেব রিচার্ডসন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন।...ক্যাপ্তেন সাহেব ইংরাজি সাহিত্যশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেক্সপিয়র তিনি যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন, এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। মেকলে সাহেব তাঁহার সেক্‌স্‌পিয়র আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি ভারতবর্ষের সব কিছু ভুলিতে পারি, কিন্তু আপনার সেক্‌স্‌পিয়র আবৃত্তি ভুলিতে পারি না।' তিনি আশ্চর্যরূপে সেক্‌স্‌পিয়র বুঝাইয়া দিতেন।...কাপ্তেন সাহেব ইয়ারগোছ লোক ছিলেন। যদি কেহ 'অ্যামিস' শব্দকে 'এমিস' উচ্চারণ করিতেন, তাহা হইলে তখনই বলিতেন, 'ইউ আর এ মিস'। তিনি আমাদিগকে নাট্যালয়ে সর্বদা যাইতে বলিতেন।...

মধুসূদন কাপ্তেন রিচার্ডসনের অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। রিচার্ডসন কেবল সাহিত্য পড়াতেন না, তিনি সুকবিও ছিলেন। মধুসূদন অল্প বয়স থেকেই ইংরেজীতে রচনার জন্যে সুনাম করেছিলেন, তিনি ইংরেজীতে কবিতাও লিখতেন। ঐসব রচনা প'ড়ে রিচার্ডসন তাঁকে উৎসাহ দিতেন। মধুসূদনের কবিতা-রচনা-নৈপুণ্যে রিচার্ডসন এতোই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলিতে মধুসূদনের লেখা কবিতা ছেপেও মধুসূদনকে উৎসাহ দিতেন।

মধুসূদন হিন্দু কলেজের একজন শ্রেষ্ঠ ছাত্র ব'লে গণ্য ছিলেন। তাঁর এই শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁর বহু সহাধ্যায়ীই সাক্ষ্য দিয়েছেন। গৌরদাস বসাক লিখেছেন: "He was undeniably the Jupiter among the bright Stars of the College." বঙ্কুবিহারী দত্ত বলেছেন: "I was a very dull boy at the commencement ; but by diligence and exertion, became one of the stars of which Madhu was the Jupiter." কিশোরীলাল হালদার লিখেছেন: "In general literature and English Composition, our poet was second to none of his comtemporaries at the Hindu College." মধুসূদনের আর এক বন্ধু শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: "মধুসূদন অতীব বুদ্ধিমান ছিলেন। প্রথমাবধি সাহিত্যশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সময়ে সময়ে কবিতা লিখিয়া কাপ্তেন সাহেবকে দেখাইতেন। সাহেব তাঁহাকে যথোচিত উৎসাহ প্রদান করিতেন। সেই কারণে মধুসূদনের অহংকারের আধিক্য হয়, এবং তাঁহাকে আলেকজাণ্ডার পোপ বলিলে তিনি পুলকিত হইতেন। প্যারীচরণ সরকার তাঁহাকে 'পোপ' বলিয়া মধ্যে মধ্যে সম্বোধন করিতেন। আমি তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতাম। এমন কি মিল্টন, পোপ, ইয়ং, কাউপার, বায়রন প্রভৃতির কবিতার উপর তিনি যে সকল opinion প্রকাশ করিতেন, তাহা আমি গ্রহণ করিতাম।"

মধুসূদন হিন্দু কলেজে পড়বার সময়ে, বিশেষত শেষ দু বছরে বহু ইংরেজী কবিতা লেখেন। তাঁর লেখা অনেক কবিতাই ঐ সময়ে 'জ্ঞানান্বেষণ', 'Bengal Spectator', 'Literay Gleaner', 'Calcutta Literay Gazette,' 'Literary Blossom', 'Comet' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত্ হয়। ঐ সময়ে মধুর বয়স ছিল মাত্র সতেরো-আঠারো বছর। তিনি কবি ব'লে কলেজে সহাধ্যায়ীদের কাছে পরিচিত ছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে ইংরেজী ভাষায় একজন শ্রেষ্ঠ কবি হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় তাঁর মনকে অধিকার করেছিল। সেই সঙ্গে একটি ধারণাও তাঁর মনে বাসা বেঁধেছিল—ইংরেজী ভাষায় শ্রেষ্ঠ কবি হ'তে হ'লে চাই ইংলণ্ড যাওয়া।

তিনি ইংরেজী ভাষাতেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি করবেন, এই ধারণা ও সংকল্প তাঁর ছিল। বাংলা ভাষা অশিক্ষিতের ও বর্বরের ভাষা এবং তা বিস্মৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, হিন্দু কলেজের অন্য অনেক ছাত্রের মতো এই ধারণা তাঁরও ছিল। তাই তিনি ইংরেজীতে কথায় কথায় কবিতা রচনা করলেও বাংলা ভাষায় কবিতা লিখতে ঘৃণাবোধ করতেন। কিন্তু একবার তাঁর প্রিয় বন্ধু ও সহপাঠী গৌরদাস বসাকের অনুরোধে তিনি বর্ষা ঋতু বর্ণনা ক'রে একটি কবিতা লিখেছিলেন। ইংরেজীতে যাকে acrostic বলে, কবিতাটি সেই জাতীয়। এতে যে ক'টি চরণ আছে, সেগুলির আদ্যক্ষরগুলি একত্র করলে "গউর দাস বসাক" হয়। কবিতাটি এখানে দেওয়া গেল। এটিকে মাইকেলের প্রাপ্তব্য প্রথম বাংলা কবিতা বলা চলে।

বর্ষাকাল।

গভীর গর্জন সদা করে জলধর,
উথলিল নদনদী ধরণী উপ'র।
রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে,
দানবাদি দেব, যক্ষ সুখিত অন্তরে।

সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব,
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব।
স্বাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়,
কলহ করয়ে কোনমতে শান্ত নয়।

ঐ সময়ে রচিত আর একটি কবিতা :

হিমঋতু।

হিমন্তের আগমনে সকলে কম্পিত,
রামাগণ ভাবে মনে হইয়া দুঃখিত।
মনাগুণে ভাবে মনে হইয়া বিকার,
নিবিলে প্রেমের অগ্নি নাহি জ্বলে আর।
ফুরায়েছে সব আশা মদন রাজার
আসিবে বসন্ত আশা—এই আশা সার।
আশায় আশ্রিত জনে নিরাশ করিলে,
আশাতে আশার রস আশায় মারিলে।
সৃজিয়াছি আশাতরু আশিত হইয়া,
নষ্ট কর হেন তরু নিরাশ করিয়া।
যে জন করয়ে আশা, আশার আশ্বাসে
নিরাশ করয়ে তারে কেমন মানসে।

এইসব কবিতায় বর্ণাশুদ্ধি এবং ভাবগত ও ভাষাগত নানা দোষ আছে। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধুসূদন নিতান্ত ক্রীড়াচ্ছলেই এই কবিতাগুলি লিখেছিলেন। কারণ, ঐ সময় বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর প্রচণ্ড অবজ্ঞা ছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন, "বাংলা ভাষা ভুলে যাওয়াই ভালো।" সেদিন কে জানতো এই বাংলা ভাষাই তাঁর জীবনের সাধনার ধন হয়ে উঠবে, আর তিনিই হয়ে উঠবেন আধুনিক যুগে বাংলা-ভাষার প্রথম, ও হয়তো শেষ, মহাকবি—মহাকাব্যের রচয়িতা।

বাংলাভাষার প্রতি তাঁর যেমন উপেক্ষা ও অবজ্ঞা ছিল, তেমনি ইংরেজী ভাষার প্রতি ছিল তাঁর তেমনি আকর্ষণ, মোহ ও নিষ্ঠা। তিনি

সতেরো-আঠারো বছর বয়সে যেসব ইংরেজী কবিতা লেখেন, তা অনেক প্রবীণ কবিকেও লজ্জিত করতে পারতো। তাঁর ভাষা, তাঁর ভাব, তাঁর সুললিত প্রকাশভঙ্গি, সবই ছিল বয়সের তুলনায় বিস্ময়কর। ইংরেজী ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিদের সমান আসনে বসবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সঙ্কল্প ছিল তাঁর। কৈশোরকাল থেকেই বায়রন ছিলেন তাঁর অন্যতম প্রিয় কবি। কেবল বায়রনের মত একজন কবি হওয়াই নয়, তাঁর মতো বাধাবন্ধহীন জীবনও তাঁর কাছে আদর্শ ও লোভনীয় হয়ে উঠেছিল। টমাস মুরের লেখা কবি লর্ড বায়রনের জীবনচরিত পাঠ ক'রে তিনি প্রিয় বন্ধু গৌরদাস বসাককে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ

> I am reading Tom Moor's life of my favourite Byron—a splendid book, upon my word. Oh! How should I like to see you write my life, if I happen to be a great poet, which, I am almost sure, I shall be, if I can go to England.

তিনি ইংলণ্ড যেতে পারলেই ইংরেজী ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হ'তে পারবেন, একথাও কৈশোরেই তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। ইংলণ্ড গমনের ইচ্ছা যে তাঁকে কীভাবে পেয়ে বসেছিল, তা ঐ সময়ে লেখা তাঁর কবিতাগুলির কোন কোনটি থেকেও বেশ বোঝা যায়। ইংলণ্ড গমনের জন্য তাঁর এই আকুলতা ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে Literary Gleaner পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর একটি কবিতায় সুন্দররূপে ফুটে উঠেছিল।

Oft like a sad bird I sigh
To leave this land though mine own land it be ;
Its green robed meads,—gay flowers and cloudless sky.
Though passing fair, have but few charms for me.
For I have dreamed of climes more bright and free

Where virtue dwells and heaven-born liberty
Make e'en the lowest happy,—where the eye
Doth sicken not to see man bend the knee
To sordid interest—climes where science thrives,
And genius doth receive her guerdon meet,
Where man in all his truest glory lives,
And nature's face is exqusitely sweet;
For those fair climes I heave the impatient sigh,
There let me live and there let me die.

ইংলণ্ড সম্পর্কে এই উচ্ছ্বাস ও আকুলতা তিনি এক বছর আগেও প্রকাশ করেন তাঁর Extemporary Song নামে একটি কবিতায়:

I sigh for Albion's distant shore,
Its valleys green,—its mountains high :—
Tho' friends, relations I have none
In that far clime,—yet, oh ! I sigh
To cross the vast Atlantic wave
For glory or a nameless grave !

My father, mother, sister all
Do love me and I love them too,
Yet oft the tear drops rise and fall
From my sad eyes like winter's dew.
And oh ! I sigh for Albion's strand
As if she were my native land.

ইংলণ্ড গমনের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে কিভাবে পেয়ে বসেছিল, তা গৌরবাবুকে লেখা তাঁর আর একটি পত্র থেকেও বোঝা যায়। তমলুক একদা সামুদ্রিক বন্দর ছিল। মধুসূদন যখন তমলুক এসেছিলেন, তখন

সমুদ্র অনেক দূরে সরে গেলেও তমলুক থেকে অদূরে যেখানে রূপনারায়ণ নদ হুগলীর সঙ্গে মিশেছে, সেখান দিয়ে ইংলণ্ডগামী জাহাজগুলি কলকাতা থেকে সমুদ্র-অভিমুখে যেতো। ঐসব ইংলণ্ডগামী জাহাজ দেখে কিশোর মধুসূদনের হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠতো। তিনি ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পূজার ছুটিতে তাঁর বাবার সঙ্গে তমলুক রাজবাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি কয়েকদিন তমলুকে ছিলেন। এখানে তিনি যাত্রাগান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ছোটখাটো একটি প্রেমেও পড়েছিলেন—অবশ্য, সেটা ছিল সম্পূর্ণ বায়রনীয় ব্যাপার। তিনি ২০শে অক্টোবর তমলুক থেকে একটি পত্র গৌরদাসকে লেখেন:

> I am grieved to think that I will not meet ye to-morrow ; but, Gour, there is one consolation for me. I am come nearer that sea, which will perhaps see me at a period—which I hope is not far off—ploughing its bosoms for England's glorious shore. The sea from this place is not very far, what a number of ships have I seen going to England.

ইংলণ্ড গমনের জন্য কিশোর মধুসূদনের হৃদয় এইভাবে ব্যাকুল হয়ে উঠলেও জন্মভূমির প্রতি যে তিনি উদাসীন ছিলেন, তা নয়। বরং তাঁর দেশমাতৃমার মাথায় জয়ের মুকুট পরাবার জন্যই যেন তিনি ইংলণ্ড যাওয়ার জন্যে এমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। যে ভারতীয়দের ইংরেজরা ঘৃণার চক্ষে দেখতো, তাদের যেন তিনি দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, এই ভারতীয়রা ইংরেজদের চেয়ে কোনও অংশে হীন নয়। ইংলণ্ডের মাটিতে বসে ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখে ইংলণ্ডকে তিনি বিস্মিত ও হতবাক্ ক'রে দিতে চেয়েছিলেন একজন ভারতবাসীর শক্তি ও প্রতিভা দিয়ে। মাতৃভূমির জন্যে বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনাই ছিল তাঁর গোপন অভিলাষ। তিনি ঐ সময়ে লেখা তাঁর একটি ইংরেজী

কবিতায়—Written At The Hindu College By A Native Student—এই বাসনার কথা সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছিলেন :

Oh ! how my heart exulteth while I see
These future flowers to deck my country's brow,
Thus kindly nurtured in this nursery !—
Perchance unmark'd some here are budding now,
Whose temples shall with laureate wreaths be crown'd,
Twined by the Sisters Nine ; to whose angel tongues
Shall charm the world with their enchanting songs.
And time shall waft the echo of each sound
To distant ages : some perchance here are,
Who with a Newton's glance shall nobly trace
The course mysterious of each wandering star ;
And like a god unveil the hidden face
Of many a planet to man's wondering eye,
And give their names to immortality.

মধুসূদন এই কবিতায় কেবল দেশমাতৃকার প্রতিই তাঁর শ্রদ্ধা-নিবেদন করেন নি, তিনি তাঁর কলেজ ও কলেজের বন্ধুদের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। হিন্দু কলেজ বহু মনীষীও দেশপ্রেমিকের জন্ম দিয়েছিল। যে ডিরোজিওকে উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্নীতির দায়ে কলেজের অধ্যাপক-পদ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, সেই ডিরোজিও-ই হিন্দু কলেজে দেশপ্রেমের বীজ বপন করেছিলেন। ডিরোজিও তাঁর কাব্য-

গ্রন্থ Fakir of Jangeera-র উৎসর্গপত্রে দেশমাতৃকার উদ্দেশে যে কবিতাটি লিখেছিলেন, তা তাঁর দেশপ্রেমের অমর সাক্ষ্য হয়ে আছে :

My country ! In thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is that glory ; where that reverence now ?
The eagle pinion is chained down at last ;
And grovelling in the lowly dust art thou ;
Thy ministrel hath no wreath to weave for thee,
Save the sad story of thy misery !
Well, let me dive into the depths of time
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime
Which human eye may never more behold ;
And let the guerdon of my labour be
My fallen country ! one kind wish for thee.

পরপদানত জন্মভূমির জন্য যে গভীর বেদনা ডিরোজিওর এই কবিতার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, সেই বেদনাকে ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের মধ্যেও সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছিলেন। মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন ডিরোজিও হিন্দু কলেজের অধ্যাপনা থেকে বিদায় নিলেও তিনি দেশপ্রেমের যে বীজ বপন ক'রে দিয়েছিলেন, তা ঊষর ভূমিতে পড়ে বিশুষ্ক হয়নি, শত শত হৃদয়ে অঙ্কুরিত এবং পল্লবিত হয়েছিল। মধুসূদনের উর্বর হৃদয়ও সে বীজ থেকে বঞ্চিত ছিল না। ইংলণ্ড যাওয়া, ইংলণ্ডে বাস ও ইংরেজী ভাষায় একজন শ্রেষ্ঠ কবি হওয়া ও ইংরেজের মতো জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা কৈশোরে তাঁকে পেয়ে বসেছিল সত্য ; কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও তাঁর মনে সর্বদা জাগ্রত ছিল। পরবর্তীকালে ঢাকায় একটি ভাষণে তিনি

বলেছিলেন : "বন্ধুগণ। আমার বিদেশী পোশাকের জন্যে আপনাদের দুঃখিত হওয়ার কারণ নেই। আমার কোট-বুট যদি কোনদিন সাহেব হয়েছি বলে আমার বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়, তবে একখানা আয়নার দিকে চাইলেই আমার সে ভ্রম দূর হয়। আমার গায়ের রঙই আমার জাতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।" মধুসূদনের এই গভীর স্বাজাত্য বোধ বাল্যকাল থেকেই ছিল, যদিও বিজাতীয় খাদ্য, পরিচ্ছদ, ধর্ম, আচার তিনি জীবনে গ্রহণ করেছিলেন।

মধুসূদনের সকল সহাধ্যায়ীই বলেছেন, তিনি হিন্দু কলেজে তাঁদের সময়ের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক ছিলেন। তাঁর মেধা ও বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। তবে তিনি ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় যতোখানি মনোনিবেশ করতেন, অন্যান্য বিষয়ে ততোখানি মনোনিবেশ করতেন না। সাধারণত দেখা যায়, সাহিত্যের প্রতি যাঁদের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে, গণিতের প্রতি তাঁদের স্বাভাবিক বিরাগ ও বিতৃষ্ণা থাকে। মধুসূদনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

গণিতের চর্চা মধুসূদনের ভালো লাগতো না। বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকের মধ্যে সাহিত্যিকরা শ্রেষ্ঠতর, এইরকম একটি অভিমতও তিনি পোষণ করতেন। একবার ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সহাধ্যায়ীদের সঙ্গে তাঁর তর্ক হয়—শেক্‌স্‌পীয়র ও নিউটনের মধ্যে প্রতিভায় কে শ্রেষ্ঠতর। মধুসূদন বললেন, "শেক্‌স্‌পীয়র। শেক্‌স্‌পীয়র চেষ্টা করলে নিউটন হতে পারতেন, কিন্তু নিউটন চেষ্টা করলে শেক্‌স্‌পীয়র হতে পারতেন না।" কিন্তু ভূদেবের দল তা স্বীকার করলেন না। মধুসূদন তাঁর এই বক্তব্য প্রতিপন্ন করবার জন্যে গোপনে কিছুদিন গণিতশাস্ত্র অনুশীলন করতে লাগলেন।

অধ্যাপক রীজ সাহেব পড়াতেন গণিত। গণিত ও গণিতের অধ্যাপক রীজ সাহেব সম্পর্কে ছাত্রদের ভীতিটা কেমন ছিল রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' সুন্দর ও সরস বর্ণনা দিয়েছেন :

ভি. এল. রীজ আমাদিগের গণিতাধ্যাপক ছিলেন। ইনি এক অদ্ভুত জীব ছিলেন। ইনি ফ্রান্সের সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের ধ্বজাবাহক ছিলেন। নেপোলিয়নের প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল। তাঁহার কথা বলিতে ইহার মুখ দিয়া লাল পড়িত। ইনি আদোবে ছাত্রদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতেন না; কিন্তু গণিতের কেমন একটি নৈসর্গিক ভয়ানকত্ব আছে, তাঁহার অধ্যাপনের সময় আইলে কোন কোন বালক কলেজের রেল টপকাইয়া পালাইত। আমি কখনও রেল টপকাইয়া পালাই নাই; কিন্তু আমার স্মরণ হয়, তাঁহার ভয়ে সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় তলের হলে অন্য কতকগুলি ছোকরাদিগের সহিত লুকাইয়া ছিলাম। কমিটির মিটিঙ্গের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে ঐ হল বন্ধ থাকিত। আমরা সে দিন কোনরকমে তাহার ভিতর ঢুকিয়া ছিলাম। ইনি ইংরাজী ভাল উচ্চারণ করিতে পারিতেন না।

এ-হেন রীজ সাহেব একদিন ক্লাসে গণিতের একটি জটিল প্রশ্ন সমাধান করতে দিলে গণিতের ভালো ছাত্ররা কেউ তা সমাধান করতে পারলো না। তখন মধুসূদন খড়ি হাতে নিয়ে বোর্ডে অঙ্কটি নির্ভুল প্রণালীতে কষে দিলেন। তারপর নিজের আসনে ফিরে এসে বন্ধুদের উদ্দেশ ক'রে হেসে বললেন, "কেমন হলো তো? And so Shakespeare could be Newton, if he tried. কিন্তু আমার গণিতশেখা এই পর্যন্তই।"

মধুসূদনের পিতা ঐশ্বর্য ও বিলাসের মধ্যেই পুত্রকে লালিত করেছিলেন। ছাত্র মধুসূদন খিদিরপুরের বাড়ি থেকে রোজ পালকি চড়ে কলেজে আসতেন। সঙ্গে দুজন চাকর থাকতো। পোশাক-পরিচ্ছদে মধুসূদন অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। তিনি রোজ চার-পাঁচ বার পোশাক বদলাতেন। নিত্য-নূতন রকমের পোশাক পরে সহযাত্রীদের অবাক ক'রে দিতেন তিনি। নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর 'মধুস্মৃতিতে' লিখেছেন:

"(মধুসূদন) একদিন হঠাৎ ধুতি-চাদর পরিত্যাগ করিয়া বুট-পায়জামা ও আচকান পরিধান করিয়া উপস্থিত হইলেন; তারপর অচিরেই 'আচকান' পরিত্যাগ করিয়া, ইংরাজি কোট গ্রহণ করিলেন, ইহা আর কখনও ত্যাগ করেন নাই।"..."পরিচ্ছদের নূতনত্বে ও পারিপাট্যে তিনি সকলের আদর্শস্বরূপ ছিলেন। নিত্য নূতন সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিতেন। একদিন চুলছাঁটা মনোমতো হওয়ায়, তিনি একটি সাহেব-নাপিতকে একটি মোহর দিয়াছিলেন।"

অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে মধুসূদনের কখনও কোনো কার্পণ্য ছিল না। অভাবগ্রস্ত সহাধ্যায়ীদের তিনি সাহায্য করতে এগিয়ে আসতেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও সদা-হাস্যময় মুখ সহাধ্যায়ীদের সহজেই আকৃষ্ট করতো। তাঁর সহাধ্যায়ী বন্ধু ভোলানাথ চন্দ্র লিখেছেন: "Modhu fully justified his name—he was all মধু—all that endeared one to another." "Turning my mental telescope, I see afar off, in 1840, Modhu diminished into a boy of 15 or 16. His white clothing deepening his complexion; he looks very like an Ethiop boy. But I see 'Othello's visage in his mind'. The light from within peers through his eyes··· I very well remember Modhu's appearance at College. He was then a slim, tallish youth, who won friends by an engaging smile and address."

বায়রন তাঁর বাল্যবন্ধুত্ব প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন: "My School friendships were with me passions." মধুসূদনের সম্পর্কেও সে কথা বলা চলে। তাঁর বাল্যবন্ধুত্ব কতো গভীর ও অকৃত্রিম ছিল, তা গৌরদাস বসাকের উদ্দেশে লিখিত তাঁর কবিতা ও চিঠিগুলি পড়লে সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়।

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে মধুসূদন তাঁর সহাধ্যায়ী বন্ধুদের

খিদিরপুরের বাড়িতে প্রায়ই নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াতেন। মা জাহ্নবী দেবী তাঁদের সকলকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন এবং পোলাও, মাংস, মিষ্টান্নে উদরপূর্তি করিয়ে আপ্যায়িত করতেন। রাজনারায়ণ কেবল অকৃপণ ও ও বিলাসী ছিলেন না। তিনি নানা বিষয়ে অত্যাধুনিক ছিলেন। একবার এক নিমন্ত্রণ উপলক্ষে গৌরদাস বসাক ও ভোলানাথ চন্দ্র মধুসূদনের বাড়িতে গিয়ে দেখেন, রাজনারায়ণ বসু কৌচে বসে একটি বৃহৎ আলবোলায় ধূমপান করছেন। কিছুক্ষণের পর তিনি আলবোলার নলটি মধুসূদনের হাতে দিলেন এবং মধুসূদন পিতার সম্মুখেই ধূমপান করতে লাগলেন। এই দৃশ্য দেখে মধুসূদনের বন্ধুরা বিস্মিত হলেন, পরে এ বিষয়ে মধুসূদনকে প্রশ্ন করলে মধুসূদন বললেন, "My father minds not your common punctilios."

ঐ সময়ে কেবল রাজনারায়ণ দত্ত নয়, অনেক পিতাই এই ধরনের উদার মনোভাব পোষণ করতেন, যা নব্যবঙ্গের নব্যশিক্ষিত যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতার সহায়ক হয়েছিল। মধুসূদনের কালে ডিরোজিও ও তৎকালীন নব্যবঙ্গের প্রভাব কিছুটা হ্রাস পেলেও কলেজের অনেক ছাত্র তখনও মদ্যপানকে সভ্যতার চিহ্ন ব'লে মনে করতেন। ঐ সময়ে মদ্যপানকে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ও তাঁদের অভিভাবকরা কিভাবে নিতেন, তার একটি সুন্দর চিত্র রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে দিয়েছেন। অত্যধিক মদ্যপান মধুসূদনের জীবনে ধ্বংসের একটি প্রধান কারণ ছিল। তার সূচনা হয়েছিল হিন্দু কলেজেই। তাই হিন্দু কলেজে তাঁর সহাধ্যায়ী রাজনারায়ণ বসুর ঐ চিত্রটি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

> তখন হিন্দু কলেজের ছাত্ররা মনে করিতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। তখনকার কলেজের ছোকরারা মদ্যপায়ী ছিলেন বটে, কিন্তু বেশ্যাসক্ত ছিলেন না···আমি পাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল···, প্রসন্নকুমার সেন এবং নন্দলাল মিত্র প্রভৃতির সহিত কলেজের গোলদীঘিতে মদ খাইতাম, এবং এখন যেখানে

সেনেট হাউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শিককাবাবের দোকান ছিল, তাহা হইতে গোলদীঘির রেল টপকাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) উক্ত কাবাব কিনিয়া আনিয়া আমরা আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্র্যাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক কার্য মনে করিতাম।

রাজনারায়ণের পিতা নন্দলাল বসু ছিলেন রামমোহন রায়ের শিষ্য। তিনিও ঐ যুগের অন্যান্য আধুনিক পিতার মতো পুত্রের ঐ পানদোষকে কী চোখে দেখতেন, তার বিবরণ শুনলে রাজনারায়ণ দত্ত তাঁর পুত্রের পানদোষকে কী চোখে দেখতেন, তা-ও সহজে অনুমান করা চলে। রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন:

> পিতাঠাকুর আমার আচরণের বিষয় অবগত হইয়া আমাকে পরিমিত মদ্যপায়ী করিবার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। এই কৌশল অবলম্বন করাতে আমি প্রথম জানিতে পারিলাম যে, বাবারও যবনস্পৃষ্ট আহার চলে। মদ্যপান বিষয়ে রামমোহন রায়ের শিষ্যের ও হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে প্রভেদ ছিল। রামমোহন রায়ের শিষ্যেরা অত্যন্ত পরিমিতপায়ী ছিলেন। কিন্তু হিন্দু কলেজের অধিকাংশ ছাত্র এরূপ ছিলেন না।...সেকালে মুন্সী আমীর আলী সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল ছিলেন।...যে বাটীতে সদর দেওয়ানী আদালতের কার্য হইত, সেই বাটীতে খাস কমিশনের কার্য হইত। খাস কমিশন সদর দেওয়ানীর অঙ্গ ছিল বলিলেই হয়। মুন্সী আমীর আলী উভয় সদর দেওয়ানী ও খাস কমিশনে ওকালতি করিতেন।...প্রায় প্রতিদিন মুন্সী আমীর আলীর বাটী হইতে আমাদিগের বাসায় একটি টিনের বাক্স আসিত। আমি মনে করিতাম যে, মুন্সী আমীর আলী পিতাঠাকুরকে তরজমা করার জন্য সদর দেওয়ানীর কাগজপত্র পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। (পিতাঠাকুর খাস কমিশনের হেড ক্লার্কের কার্য করিতেন, আবার ঠিকা কাগজ তরজমা

করিয়াও কিছু উপার্জন করিতেন)। একদিন সন্ধ্যার পর আমাকে পিতাঠাকুর তাঁহার লিখিবার ঘরে ডাকিলেন। ডাকিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম না যে, ব্যাপারটা কি। তারপর দেখিলাম, তিনি একটি দেরাজ খুলিয়া একটি কর্ক-স্ক্রু ও একটি সেরির বোতল ও একটি ওয়াইন গ্লাস বাহির করিলেন। তারপর টিনের বাক্সটি খুলিলেন। টিনের বাক্স খোলা হইলে আমি দেখিলাম যে, তাহাতে সদর দেওয়ানীর কাগজ নাই, পোলাও, কালিয়া কোপ্তা রহিয়াছে। পিতাঠাকুর আমাকে বলিলেন, "তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর এই সকল উত্তম দ্রব্য আহার করিবে, কিন্তু মদ (সেরি) তুই গ্লাসের অধিক পাইবে না; যখন শুনিব অন্যত্র মদ খাও, সেইদিন অবধি এই খাওয়া বন্ধ করিয়া দিব।" কিন্তু আমি সেইরূপ পরিমিত পানে সন্তুষ্ট হইতাম না। অন্যত্র পান করিতাম।

অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে পীড়িত হয়ে রাজনারায়ণ বসু হিন্দু কলেজ ত্যাগ করেছিলেন, অবশ্য, তা কলেজের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়ে একাধিক বৎসর পড়ার পর। কিন্তু মধুসূদন মদ্যপানের ফলে পীড়িত হননি। তিনি কলেজে পঠনকালে সমুজ্জ্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি কলেজ ত্যাগ করেছিলেন অন্য কারণে। পরবর্তী জীবনে রাজনারায়ণ মদ্যপান সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিলেন এবং চরিত্রবলে বাঙ্গালীর কাছে ঋষি রাজানারায়ণ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু মধুসূদন কলেজে সভ্যতার চিহ্নরূপে মদ্যপান করলেও তিনি যে ঐ সময়ে অত্যন্ত পরিমিত মদ্যপায়ী ছিলেন, তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু পরবর্তী জীবনে মদ্যপান তাঁকে পেয়ে বসেছিল এবং জীবনকে অকাল নির্বাপণের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

মধুসূদন হিন্দু কলেজের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময়ে এদেশীয়দের স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে যে নিবন্ধ লিখে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন:

It is a fact almost as undisputed as any axiom of Euclid, that nothing can be more difficult for a man than to emancipate his mind from impressions, left upon it in youth—the season of his life wherein the mind, like wax, receives and retains anything inculcated upon it—and that the notions and prejudices which he imbibes in his younger days, exert a very great influence over him in his after life.

মধুসূদনের এই উক্তি স্বতঃসিদ্ধের মতোই সত্য ছিল। তাঁর জীবনের প্রচণ্ড স্রোতস্বিনীর ধারা তাঁর বাল্যের ও কৈশোরের দিনগুলির মধ্যেই উৎসরূপে নিহিত ছিল। তিনি ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে যখন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন, তখন তাঁর বয়স ছিল আঠারো বৎসর। ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত হয়ে গড়পড়তা বাঙ্গালীর তুলনায়, যৌবন তাঁর দেহে ও মনে অনেক পূর্বেই এসেছিল। ঐ সময়ে মধুসূদনের দেহে ও মনে ছিল নবযৌবনের উদ্দামতা ও প্রাণশক্তির দুঃসাহসিকতা—যা সহজেই তাঁকে অবিবেচনা ও হঠকারিতার পথে ঠেলে দিয়েছিল—ঠেলে দিয়েছিল জীবনের কুসুমাস্তীর্ণ সুখের পথ থেকে—দুঃখ-দৈন্যে ভরা এক সুকঠোর দুর্গমতার মধ্যে।

সম্ভবতঃ মধুসূদনের এই অকালযৌবনই তাঁর কাল হয়েছিল। এই উদ্দাম যৌবন ও উচ্ছল প্রাণশক্তিই তাঁকে হঠকারিতা, অপরিণামদর্শিতা, এমন কি, হৃদয়হীনতা এনে দিয়েছিল।

৪

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ

গোড়ার দিকে কোম্পানি সরকার খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের তাঁদের অধিকৃত এলাকায় স্থান দেননি। তাই খ্রীষ্টান পাদরিরা দিনেমার-অধিকৃত শ্রীরামপুর থেকেই বাংলাদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁরা হিন্দুধর্ম ও সমাজকে তাঁদের বহু দেবদেবীর পূজা ও নানাবিধ কুসংস্কারের জন্যে আক্রমণ করতেন। বহু দেবদেবীর পূজা ও হিন্দু সমাজের নানাবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রামমোহন জেহাদ ঘোষণা করলেও তিনি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন —তিনি প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছিলেন, প্রচলিত পৌরাণিক হিন্দুধর্ম মূল হিন্দুধর্ম নয়, মূল হিন্দুধর্মে এক ও অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার কথাই বলা হয়েছে এবং হিন্দু সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের সঙ্গে হিন্দুধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই, কারণ সেগুলি নিতান্তই লৌকিক ব্যাপার এবং সেগুলি হিন্দু শাস্ত্রসম্মতও নয়। হিন্দু সমাজের সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্য-বিবাহ, বর্ণভেদ প্রভৃতিকে তিনি কঠোর ভাবে আঘাত করেছিলেন। অন্য পক্ষে, তিনি খ্রীষ্টের বাণীকে মানবধর্মের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ মনে করলেও Trinitarian বা ত্রীশ্বরবাদী খ্রীষ্টানদের তিনি বহু দেবদেবীতে ও অবতারবাদে বিশ্বাসী এবং পৌত্তলিক ব'লে প্রমাণ করতে দ্বিধা করেন নি। তাঁর আক্রমণের ফলে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকরা পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিল এবং হিন্দু সমাজের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত অংশ তাঁরই অনুগামী হয়ে উঠেছিল। ফলে ঐ সময়ে হিন্দু সমাজের পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত যুক্তিবাদী অংশ ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি ক'রে হিন্দুধর্মকে খ্রীষ্টধর্মের প্লাবন থেকে রক্ষা করছিল। তাই খ্রীষ্টান পাদরিরা রামমোহনকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রধানতম অন্তরায় ব'লে মনে করছিলেন।

মধুসূদনের জন্মের চার বছর পরে, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে, ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু রামমোহনের অন্যতম প্রিয় শিষ্য এবং ব্রাহ্ম সমাজের উৎসাহী সদস্য ছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন নিতান্ত বৈষয়িক মানুষ, অর্থোপার্জন ও ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও অবলম্বন ছিল, আধ্যাত্মিকতা তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে নি। তাই তিনি হিন্দু সমাজের চিরপ্রচলিত উৎসব-আড়ম্বরপূর্ণ দোল-দুর্গোৎসব আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতিকেই ধর্ম বলে বিনা দ্বিধায় মেনে চলতেন—এসব সম্পর্কে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র বা আধুনিক যুক্তিতর্ক নিয়ে তিনি মাথা ঘামান নি। ফলে মধুসূদন আবাল্য যে হিন্দুধর্মের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তা ছিল বহু দেবদেবীতে এবং সহস্র কুসংস্কারে পূর্ণ সনাতনী হিন্দুধর্ম।

যখন খ্রীষ্টান পাদরিরা হিন্দু কলেজকে তাদের ধর্ম প্রচারের অন্যতম কেন্দ্র ক'রে তুললো এবং হিন্দু ধর্মকে হীন ও বর্বর প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হলো, তখন মধুসূদন তাই সহজেই তার শিকার হলেন। অন্যপক্ষে, ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং ব্রাহ্ম ধর্ম আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ বা নন্দকিশোর বসুর পুত্র রাজনারায়ণ বসুকে খ্রীষ্টধর্ম বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করতে পারলো না—তাঁরা হিন্দুধর্মকেই শ্রেষ্ঠ ব'লে গ্রহণ ক'রে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণেই জীবন উৎসর্গ করলেন। তাই যতো সহজে খ্রীষ্টান পাদরিদের প্রচার মধুসূদনের চোখ ঝলসে দিতে পেরেছিল, ততো সহজে দেবেন্দ্রনাথ বা রাজনারায়ণ বসুর চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারে নি।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম আন্দোলন কিছুদিন —দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে পুনরুদ্দীপ্ত হওয়ার কাল পর্যন্ত—স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। ফলে খ্রীষ্টান পাদরিদের প্রচারের সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং হিন্দু কলেজের কিছু সম্ভ্রান্তবংশীয় বালক খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল। ডিরোজিওর প্রভাব হিন্দুধর্মের কুসংস্কার

দূরীকরণের পরিবর্তে অধিকাংশ স্থলেই হিন্দুধর্মের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষই ছাত্রদের মনে উদ্রিক্ত করেছিল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি হিন্দু কলেজের প্রসিদ্ধ ছাত্ররা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগের ছাত্র, তখন ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পাদরিরা কৃষ্ণমোহনকে দিয়ে হিন্দু কলেজের সামনেই একটি গির্জা নির্মাণ করাতে যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছিল। হিন্দু কলেজের পরিচালক শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতির চেষ্টায় তাদের সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল।

মধুসূদন ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যকে নিজের ভাষা ও সাহিত্যরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। তাদের পরিচ্ছদ, চাল-চলন সবই তিনি অনুকরণ করছিলেন। ইংলণ্ডে গমন ও ইংলণ্ডে বাস ছাড়া ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি হওয়া যে যায় না, এবং ইংরেজী ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হওয়ার জন্যে ইংলণ্ড যাওয়া যে তাঁর চাই-ই, সে বিষয়েও তাঁর মনে কোনও সংশয় ছিল না। ইংরেজের সমাজ ও জীবনকে গ্রহণ করতে হ'লে ইংরেজের ধর্মকেও গ্রহণ করা যে অপরিহার্য, তাও মধুসূদন জানতেন। খ্রীষ্টধর্মের বহিরঙ্গ খ্রীষ্টানদের খাদ্য, পরিচ্ছদ ও চালচলন তিনি ইতি-পূর্বেই অধিগত করেছিলেন। সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার বিরুদ্ধে কোনও যৌক্তিকতা তিনি দেখেন নি, যদি এই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ তাঁকে ইংলণ্ড গমন, ইংলণ্ডে ইংরেজ সমাজে বাস এবং ইংরেজী ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হওয়ার সুযোগ এনে দেয়।

তাঁর যে কল্পনা ও অনুভূতি স্বর্গ মর্ত্য পাতালে বিচরণ করতো, সেই কল্পনা ও অনুভূতি দিয়ে তিনি কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ফলে তাঁর পিতামাতার মনে যে দুঃসহ দুঃখ-বেদনা আনতে পারেন, তা কল্পনা ও গভীরভাবে অনুভব করেন নি। তিনি ছিলেন পিতামাতার একমাত্র জীবিত সন্তান, পিতামাতার সকল আশা-ভরসা, স্নেহ-সান্ত্বনা তাঁকে কেন্দ্র ক'রেই গড়ে উঠেছিল। সুতরাং তাঁর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ কেন, ইংলণ্ড গমন ও ইংলণ্ডে বাস যে তাঁর পিতামাতাকে প্রায় সর্বস্বহারা ক'রে প্রচণ্ড দুঃখ

দেবে, তা তাঁর না জানবার কথা নয়। ভারতের কতো মহামানব নিজ সংকল্প সাধনের জন্য সংসার-স্বজন ত্যাগ ও স্নেহমমতার বন্ধন কঠোর হস্তে ছিন্ন ক'রে গৃহত্যাগ করেছিলেন। মধুসূদন তাঁর একমাত্র সংকল্প ও সাধনার জন্য যে গৃহত্যাগে উদ্‌যোগী হবেন, তাতে আর বিস্ময়ের কী আছে!

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর তারিখে তিনি গৌরদাসকে লিখেছিলেন:

> I am plotting against my own parents. [I won't explain this, understand it yourself] By the bye, last evening you had the impudence to tell me (at the M. I.) that you will inform my father about my intention of running away to E—d and thereby prevent me from doing so. If these are what really you think, you are no friend of mine, I can assure you. If these are your sentiments, you be d—d! Perhaps, you think I am very cruel, because I want to leave my parents. Ah! my dear! I know that, and I feel for it. But "to follow Poetry," (says A. Pope,) "one must leave both father and mother." Too much of this. You are wise, think on it.

হয়তো মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ কিছু বিলম্বিত হতো। হয়তো তিনি হিন্দু কলেজের পাঠ সাঙ্গ ক'রে পরে এ বিষয়ে উদ্‌যোগী হতেন। কিন্তু তাঁর পারিবারিক একটি ঘটনা এই সময় তাঁকে পরিবারের ও সমাজের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে উৎসাহী করলো। মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজের সিনিয়র স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, তখন, ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর পিতামাতা তাঁর জন্যে এক জমিদারের পরমা

সুন্দরী কন্যাকে পাত্রী স্থির করলেন। ঐ সময়ে মধুসূদনের বয়স ছিল আঠারো বছর। সুতরাং কন্যার বয়স নিশ্চয় আট-দশ বছরের বেশি ছিল না। ঐ সময়ে নব্যবঙ্গের তরুণরা বাল্যবিবাহেরও বিরোধী ছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সুপরিচিত মধুসূদনও যে বাল্যবিবাহের বিরোধী থাকবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তাছাড়া, মধুসূদন ছিলেন precocious, যাকে মন্দ অর্থে বলে, অকালপক্ক বালক। তাঁর মানসলোকে যে প্রিয়া তখন বিরাজ করতো, তা কোনও জমিদারের অষ্টমবর্ষীয়া বা দশমবর্ষীয়া বালিকা নয়। তার প্রমাণ তাঁর ঐ সময়ের লেখা বহু কবিতা।

যেমন,

I loved a maid, blue-eyed maid
As fair a maid can e'er be, O.
But she, oft with disdain, repaid
My fondness and affection, O.
For her I sighed, and e'er shall I sigh,
Tho' she shall ne'er be mine, O.
For this sad heart's starless sky
None but herself can light, O.

কিংবা,

Go, fortunate lines ! and tell the maid
That 'tis for her I die !
O ! that some tears when I am dead,
Descending from that lovely eye
May hallow my untimely bier
And soothe my spirit lingering there !

কিংবা,

Oh ! That thou wast as fair within
As thy ang'lic outward is

Then, of what value hast thou been
In this earth, a perfect bliss!

Lady! tho' beautiful thou art,
Tho' Nature hath gi'en the ev'ry grace
Yet, Oh! how cruel is thy heart,
Thou art deaf to the voice of distress.

কিংবা,

O! deign to give a thought on me,
When these sad lines do meet thine eye,
Think then on him who oft for thee,
Sweet one! doth unregarded sigh!

কিংবা প্রিয়বন্ধু গৌরদাস বসাকের উদ্দেশে তিনি ইংরেজীতে যে acrostic কবিতাটি—এই কবিতার আদ্যক্ষরগুলি একত্র করলে গৌরদাসের পুরো নামটি হয়—রচনা করেন, সেটিও :

G-o! simple lay! and tell that fair,
O-h! 'tis for her, her lover dies!
U-ndone by her, his heart sincere
R-esolves itself thus into sighs!
D-ear cruel maid! tho' ne'er doth she
O-nce think, for her thus breaks my heart,
S-ad fate! Oh! yet must I love thee,
B-e thou unkind, till life doth part!
Y-oung Peri of the East! thou maid divine!
S-weet one.! Oh! let me not thus die :
A-ll kind, to these fond arms of mine
C-ome! and let me no longer sigh!

এই কবিতাগুলি থেকে সহজেই বোঝা যায়, এক গ্রাম্য জমিদারের পরমা সুন্দরী হ'লেও বালিকা-কন্যাকে বিবাহ করবার মতো মনের অবস্থা মধুসূদনের ছিল। কিশোর মধুসূদনের মানসসুন্দরী, কল্পলোকের নর্ম-সহচরী ছিল a blue-eyed maid, এক dear cruel maid, এক Young Peri of the east. কবি-প্রিয়া কল্পিতা হ'লেও, তার কাল্পনিক রূপে বিভোর ও জর্জরিত হলেও একদিন এমনই কারো আসার জন্যে নিশ্চয় কবির মন সকল কামনা নিয়ে উন্মুখ হয়ে ছিল। তাছাড়া, যিনি ইংলণ্ডে গিয়ে ইংরেজদের সমাজে বাস করতে দৃঢ়সংকল্প, তিনি একটি গ্রাম্য বালিকা বধূ নিয়েই বা করবেন কী!

তাই যখন মধুসূদনের পিতামাতা তাঁর সঙ্গে একটি বালিকার বিবাহ স্থির করলেন, তখন স্বপ্নবিভোর মধুসূদন নিশ্চয় তাতে আপত্তি ও অসম্মতি জানালেন। কিন্তু দেখলেন, তিনি যে সমাজ-সংসারে মানুষ, সেখানে তাঁর অসম্মতির কোনও দাম নেই। এই সমাজ-সংসারে থাকতে হ'লে, তাঁর পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সিদ্ধান্তকেই শিরোধার্য ক'রে নিতে হবে তাঁকে। কিন্তু মধুসূদনও এতো সহজে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত নন। তাঁর এই মনোভাব ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর গৌরদাসকে লেখা তাঁর একটি পত্রে তিনি সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছেন:

> ···You don't know the weight of my afflictions I wish (Oh! I really wish) that somebody would hang me! At the expiration of three months from hence I am to be married;—dreadfull thoughts! It barrows up my blood and makes my hair stand like quills on the fretful porcupine! My betrothed is the daughter of a rich Zemindar;—poor girl! What a deal of misery is in store for her in the ever inexplora-

ble womb of Futurity! You know my desire for leaving this country, is too firmly rooted to be removed. The sun may forget to rise, but I cannot remove it from my heart. Depend upon it—in the course of a year or two more—I must either be in E–d or cease "to be" at all;—one of these must be done!

তিন মাস বাদেই তাঁর বিবাহ হবে। বিবাহ হ'লেও তিনি বিলাত যেতে দৃঢ়সংকল্প। সুতরাং তাঁর বিবাহিতা পত্নী—হতভাগিনী ঐ বালিকার জন্যে তাঁর সমবেদনারও সীমা নেই। কারণ, তিনি জানেন, হিন্দু ধর্ম ও সমাজের রীতিনীতি সংসারে স্বামী জীবিত থাকলেও ঐ বালিকার চিরবৈধব্য অনিবার্য।

মধুসূদন কিন্তু এই বিবাহকে নিয়তির বিধান ব'লে মেনে নিলেন না। এই অনভিপ্রেত বিবাহের হাত থেকে নিজেকে ও ঐ হতভাগিনী বালিকাকে রক্ষা করবার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সংসার ও সমাজ ত্যাগ ক'রে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের সংকল্প করলেন। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে তাঁর উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে—এই বিবাহের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে, বিলাত গমনেরও হয়তো সুবিধা হ'তে পারবে। তাঁর প্রতিবেশী নবীনকৃষ্ণ মিত্র খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবত নবীনকৃষ্ণও এ বিষয়ে তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে সাহায্য লাভের জন্যে হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত ও খ্রীষ্টধর্মযাজক রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তখন কৃষ্ণমোহন ক্রাইস্ট চার্চ খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের একজন পাদরিরূপে কর্নওয়ালিস স্কোয়ারে থাকতেন। মধুসূদন তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে জানালেন যে, তিনি ধর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু এবং খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে ইচ্ছুক। কৃষ্ণমোহন মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে লিখেছেন:

After two or three interviews and a great deal of conversation, I was impressed with the belief that the desire of becoming a Christian was scarcely greater than his desire of a voyage to England. I was unwilling to mix up the two questions ; and while I conversed with him on the first, I candidly told him that I could lend him no help as regards the second question.

কৃষ্ণমোহন লিখেছেন : ইংলণ্ড গমন সম্পর্কে তিনি সাহায্য করতে পারবেন না বলায় মধুসূদন নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন এবং কৃষ্ণমোহনের বাড়িতে তাঁর যাতায়াত বিরল হয়ে ওঠে। এর কিছুদিন বাদে কৃষ্ণমোহন তাঁর এক উচ্চপদস্থ ইংরেজ বন্ধুর কাছে কথাপ্রসঙ্গে হিন্দু কলেজের এই ছাত্রটি সম্পর্কে উল্লেখ করেন ; বলেন, ছাত্রটি খ্রীষ্টান হ'তে এবং বিলাত যেতে চায়। ইংরেজ বন্ধুটি এ ব্যাপারে কৌতূহলী ও আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং এই উৎসাহী তরুণের সঙ্গে দেখা করতে চান। পরে যখন মধুসূদনের সঙ্গে কৃষ্ণমোহনের দেখা হয়, তখন তিনি মধুসূদনকে তাঁর ঐ বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে বলেন এবং একটি পরিচয়পত্র দেন। ইংরেজ ভদ্রলোক মধুসূদনকে খুবই উৎসাহ দেন এবং মধুসূদনকে তৎকালীন ডেপুটি গভর্নর মিঃ বার্ডের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেন।

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের বিষয়ে মধুসূদন তাঁর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরও কিছু বলেননি। তিনি এ ব্যাপারে খ্রীষ্টান পাদরিদের পরামর্শ মতোই চলেন। গৌরদাস বসাককে পূর্বোক্ত পত্র লেখার দু মাস বাদে হঠাৎ একদিন সকলের অজ্ঞাতে মধুসূদন হিন্দু কলেজ থেকে অন্তর্হিত হলেন। কলেজ থেকে মধুসূদন বাড়ি না ফেরায় সকলে উদ্বিগ্ন ও ভীত হলেন। জাহ্নবী দেবী নানা অমঙ্গল আশঙ্কায় ভেঙে পড়লেন। পিতা রাজনারায়ণ অস্থির হয়ে উঠলেন, কলেজ, আত্মীয়-স্বজনের ও সহপাঠীদের বাড়ি, সর্বত্র মধুসূদনের খোঁজ করতে লাগলেন। কিন্তু মধুসূদনের কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না।

দু-তিন দিন পরে লোক-পরম্পরায় জানা গেল, মধুসূদন খ্রীষ্টান হ'তে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি যে কোথায়, কি অবস্থায় আছেন, তা জানা গেল না। আরও কয়েকদিন কাটলে জানা গেল, মধুসূদন পাদরিদের সঙ্গে 'ফোর্ট উইলিয়ম' দুর্গে আছেন।

মধুসূদন কেল্লায় আছেন, এই সংবাদ পেয়ে তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, গৌরদাস ও ভূদেব, সেখানে ছুটলেন। কেল্লায় ডঃ কারবাইনের বাড়িতে মধুসূদন ছিলেন। গৌরদাস ও ভূদেব বাড়ির নিচের তলায় অধীর হয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। এমন সময়ে ভূকৈলাসের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল এসে পৌঁছলেন এবং তিনি নিচে অপেক্ষা না ক'রে সোজা উপরে উঠে গেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তিনি ফিরে এসে জানালেন, পাদরিরা মধুসূদনকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেয় নি। তিনি ক্রোধের সঙ্গেই বললেন, "শয়তানরা তাকে কেল্লায় এনে লুকিয়ে রেখেছে। নইলে এর উপযুক্ত প্রতিফল পেতো।"

রাজা সত্যচরণের উক্তি বিন্দুমাত্র মিথ্যা ছিল না। মধুসূদন যদি কেল্লায় আশ্রয় না নিতেন, তবে পাদরিরা তাঁকে নিজেদের কাছে রাখতে পারতো না। মধুসূদনের সহাধ্যায়ী গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন:

> রাজনারায়ণবাবু বিত্তশালী লোক, তাতে কলকাতার অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে তাঁর ভাব ছিল। রাজনারায়ণবাবুর পুত্রকে পাদরিরা নিয়ে গিয়েছে শুনে তাঁরা সকলে রাজনারায়ণ বাবুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে তাঁকে সাহায্য করতে আগ্রহী হলেন। মধু কোন্ স্থানে লুক্কায়িত আছে তা জানতে পারলে, সেই স্থান থেকে তাকে বলপূর্বক বার করে আনার জন্যে তার পিতা দেশ থেকে লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালা এনে প্রস্তুত ক'রে রেখেছিলেন। আমার মাতুল এর প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং কলকাতার অনেকেই তাঁর সমর্থক ছিলেন। এইরকম কোলাহল হচ্ছে, এমন সময়ে একদিন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বাসাতে আমার মাতুলের কাছে উপস্থিত হলেন। সেই বৈঠকে হিন্দু কলেজের

শিক্ষক বাবু রামচন্দ্র মিত্রও উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণমোহনবাবু মাতুলকে বললেন, "আপনারা অনর্থক মধুর জন্য চেষ্টা করছেন। খ্রীষ্টান হওয়ার জন্য তার দৃঢ়সংকল্প হয়েছে। সে খোকা নয়, দুগ্ধপোষ্য বালক নয় যে, পাদরিরা তাকে ভুলিয়ে খ্রীষ্টান করবে। ধর্মের দোষগুণ নির্ধারণ করবার উপযুক্ত বুদ্ধি ও বয়স তার হয়েছে এবং হিন্দুধর্মের অসারতা জেনে মধু খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে অগ্রসর হয়েছে। এই দেখুন, তার কেমন বুদ্ধি। আপনারা পাছে তার প্রতি বল-প্রয়োগ করেন এই আশঙ্কায় সে লর্ড বিশপের কাছে আবেদন করে এবং তাঁর পরামর্শক্রমে কেল্লায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। কেল্লার কর্তা ব্রিগেডিয়ার পাউনি মধুকে নিজের কুঠিতে সাদরে আশ্রয় দিয়েছেন। এখন আপনারা তার কেশস্পর্শ করতে পারবেন না।" কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে কেল্লায় মধুর থাকার কথা জেনে আমার মাতুল ও উক্ত রামচন্দ্রবাবু ও রাজনারায়ণবাবুর এক ভ্রাতুষ্পুত্র মধুর সঙ্গে দেখা করতে কেল্লায় গিয়েছিলেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলাম। মধু কেল্লার মধ্যে গির্জাঘরে পাদরি ও সৈনিকদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করলো। আমার মাতুল, মধুকে তার পিতামাতার শোকের কথা বর্ণনা করে তাকে একবার বাড়ি গিয়ে তাঁদের সান্ত্বনা দিতে অনুরোধ করলেন। মধু সে কথায় কর্ণপাত করলো না। আমাদের সেলাম ঠুকে বিদায় দিলো। আমরাও নিরাশ হয়ে কেল্লা থেকে ফিরে এলাম।

এর কয়েকদিন বাদেই, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি মিশন রো-র এল্ড মিশন চার্চে মধুসূদন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেন। রাজনারায়ণ দত্তের মতো একজন সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী ব্যক্তির পুত্র খ্রীষ্টান হচ্ছে, তাই শহরে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এই সংবাদ এবং খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের স্থান ও কাল সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল। শহরে উত্তেজনা থাকায় পাছে ধর্মান্তর-অনুষ্ঠানের কালে কোনও বিঘ্ন বা

গোলযোগ ঘটে, এই আশঙ্কায় সশস্ত্র সৈনিক প্রহরী মোতায়েন করা হয়েছিল গির্জার বাইরে। শহরের বহু সম্ভ্রান্ত ইংরেজ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে নির্বাচিত সাক্ষীরূপে উপস্থিত ছিলেন। মধুসূদনের স্বরচিত একটি ইংরেজী স্তোত্র সমবেত নরনারীর মিলিতকণ্ঠে গীত হওয়ার পর ওল্ড মিশন চার্চের প্রধান যাজক আর্চডিকন ডেল্‌ট্রি মধুসূদনকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেন। এখন মধুসূদনের নূতন নামকরণ হয় "মাইকেল"—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ সম্পর্কে আমরা দুটি কারণ নির্দেশ করেছি—পিতামাতার নির্বাচিত এক বালিকার সঙ্গে অবাঞ্ছিত বিবাহ থেকে নিষ্কৃতি এবং ইংলণ্ড গমনে সুযোগ লাভের আশা। কিন্তু তাঁর কোন কোন জীবনীকার লিখেছেন, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা দেবকীর প্রতি মধুসূদনের প্রেম তাঁকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করেছিল। নগেন্দ্রনাথ সোম 'মধুস্মৃতিতে' লিখেছেন:

> রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেবকী নাম্নী রূপবতী বিদুষী দ্বিতীয়া কন্যার সহিত মধুসূদন পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রূপগুণের প্রতি পক্ষপাতী হইয়া মধুসূদন তাঁহার পাণিগ্রহণে একান্ত অভিলাষী ছিলেন। উক্ত কুমারীও মধুসূদনের বিবিধ সদ্‌গুণে তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হন। এ বিবাহে কন্যার পিতার কোন আপত্তি ছিল না; কিন্তু তিনি মধুসূদনকে সুরাপান ত্যাগ করিতে বলেন। মধুসূদন কিছুতেই পানদোষ ত্যাগ না করায় এ বিবাহ হয় নাই।

কিন্তু এই উক্তি যুক্তিসহ নয়। তাঁর কবিতায় যে প্রেমিকার আমরা উল্লেখ পাই, মধুসূদন তাকে বায়রনের Peri of the West-এর অনুসরণে Peri of the East বললেও, তা যে কবির কল্পিতা মানসী মাত্র, তাতে সন্দেহ নেই।

আমরা দেখি, মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পূর্বে, ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যখন তিনি পূজাবকাশে পিতার সঙ্গে তমলুকে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন তমলুক থেকে গৌরদাস বসাককে একটি পত্রে লিখেছিলেন : "I had here a little love affair ;—thus you see, from an anchorite and monk, I am becoming a decided Rake :…" কৃষ্ণমোহনের কন্যা দেবকীর প্রতি যদি পূর্ব থেকে মধুসূদনের কোনও প্রকার প্রেমানুরাগ থাকতো, তবে তা মধুসূদন নিশ্চয় তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ গৌরদাসকে জানাতেন। তমলুক থেকে ঐ পত্র লেখার মাত্র একমাস পরেই গৌরদাসকে লেখা অন্য একটি চিঠিতে তিনি এক জমিদার কন্যার সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধের কথা এবং তাঁর বিলাত গমনের দৃঢ়সংকল্পের কথা জানান। ঐ পত্র থেকেও বোঝা যায়, কৃষ্ণমোহনের কন্যার কথা তাঁর মনের কোণেও স্থান পায় নি। তাঁর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পরেও দেখি, কোন নারীর চিন্তা নয়, ইংলণ্ড গমনের চিন্তাই তাঁর সমগ্র মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। তিনি গৌরদাসকে একটি পত্রে লিখছেন : "I won't go to England till December next." যদি দেবকীর প্রেমে তিনি বিভোর হতেন, তবে ইংলণ্ড গমনের কথা চিন্তা না ক'রে দেবকীকে পাওয়ার কথাই চিন্তা করতেন এবং গৌরদাসকে লেখা তাঁর কোন না কোন পত্রে দেবকী নাম্নী কোনও নারীর প্রতি তাঁর আসক্তির কথা নিশ্চয় তিনি প্রকাশ করতেন।

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর কিছুদিন মধুসূদন গৃহচ্যুত সমাজচ্যুত হয়ে খ্রীষ্টান সমাজেই বাস করতে বাধ্য হন। জননী জাহ্নবী দেবী তাঁর পুত্রকে পুনরায় বুকে পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সমাজের কঠোরতায় খ্রীষ্টান পুত্রকে গৃহে স্থান দেওয়া সম্ভব ছিল না। অনেকে মধুসূদনকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে স্বগৃহে ও স্বসমাজে ফিরিয়ে আনতে মনঃস্থ করেন। কিন্তু মধুসূদন তাতে রাজী হন না।

মধুসূদন খ্রীষ্টান হওয়ার পর গোড়ার দিকে কিছুদিন মিশন রোর ওল্ড মিশন চার্চের পাদরি ডন্ এবং আর্চডীকন ডেল্‌ট্রির বাড়িতে বাস করেন। তারপরে কিছুদিন তিনি ডেকার্স লেনে ইংরজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত স্মিথ সাহেবের বাড়িতেও থাকেন। এই সময়ে তিনি স্বসমাজ ও বন্ধুবান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করছিলেন। এই নিঃসঙ্গতা তাঁর কাছে কতো দুঃসহ হয়ে উঠেছিল, তা ওল্ড চার্চ থেকে গৌরদাসকে লেখা তাঁর একটি পত্র থেকে বেশ বোঝা যায়।

"He is a friend indeed,—who helps you in need," says the proverb. Well, I'm "in need" and if you are my "Friend indeed", show it now. Do you think I want to borrow money from you ? Do you think I want to tease your interest with friends to procure me anything ? No. No. No. Nothing of the sort—Don't startle. Alas ! I am alone ! and I am in need, that is, I want company.

তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় বন্ধুরা তাঁকে কেউ অন্য চক্ষে দেখে, তাও তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি বন্ধুদের পত্র লেখার সময়ে নিজের নবলব্ধ খ্রীষ্টান নাম কখনও ব্যবহার করতেন না, লিখতেন, আগের মতোই M. S. Dutta—মধুসূদন দত্ত। একবার গৌরদাস তাঁর চিঠির পিঠে লিখেছিলেন, "To Christian M. S. Dutta", মধুসূদন তাতে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তিনি গৌরদাসকে লিখেছিলেন—"You write on the back of your letter "To Christian M. S. Dutta from G. D. B. *I do not like it.*"

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণই মধুসূদনকে অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল ; পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে মর্মান্তিক বেদনা দিয়ে তাঁকে হৃদয়হীন স্বার্থপরতার পরিচয় দিতে বাধ্য করেছিল, স্ব-সংসার ও স্ব-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক অপরিচিত সমাজের মধ্যে তাঁকে

নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয়েছিল। সে কথা মনে রেখে বিচার করলে মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণকে যথোচিত গুরুত্ব দেননি। কারণ, ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা মধুসূদনকে কখনও স্পর্শ করেনি। তাই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ মধুসূদনের জীবনে কেবল অনাবশ্যক ও অবান্তর ছিল না—ছিল তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ভুল।

৫
বিশপ্‌স্ কলেজ

মধুসূদন কিছুদিন খ্রীষ্টান পাদরি ও ইংরেজ পরিবারে বাস করলেও তাঁর স্নেহশীল পিতামাতা তাঁকে এরকম নিঃসঙ্গ নির্বাসিত জীবন বেশী দিন যাপন করতে দেননি। কিন্তু ধর্মভ্রষ্ট পুত্রকে স্বগৃহে স্থান দেওয়াও সমাজের কঠোর শাসনে অসম্ভব ছিল। তাই রাজনারায়ণ নিজেকে ও পুত্রশোকাতুরা জননীকে কিছুটা শান্তি ও সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পুত্রকে মাঝে মাঝে বাড়িতে ডেকে আনতেন ও আদর-যত্ন করতেন। প্রাচুর্য ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে লালিত মধুসূদনকে যাতে আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়তে না হয়, রাজনারায়ণ তারও ব্যবস্থা করেছিলেন। মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন: "খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করাতে মধুসূদনকে, জীবিকার জন্য, খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল; তাঁহার স্নেহময় পিতামাতা তাঁহার অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার আর্থিক অভাব দূর করিয়া দিলেন।" এই সময়ে মধুসূদনকে আদৌ খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল ব'লে মনে হয় না। কারণ, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের দু-চারদিন বাদেই তাঁর 'O Gour ! Doodeen char deenataye ato !!!" (দুদিন চারদিনেতেই এতো !!!) শীর্ষক চিঠিতে লেখেন: "You will say, you have no conveyance ; well, hire a palkee, do, I will pay. I have plenty of money" কদিন বাদেই আর একটি চিঠিতে তিনি গৌরদাসকে লেখেন: "But why not come and see me here to-day ? Come, take Mr. Kerr's permission ; hire a Palkee, I will pay."

এইসব চিঠি থেকে বোঝা যায়, মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর আদৌ আর্থিক অনটনে পড়েননি বা তাঁকে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হয়নি। সম্ভবতঃ গোপনে তাঁর মা তাঁকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করতেন।

যুক্তিতর্ক বা বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দ্বারা মধুসূদনের মতো একগুঁয়ে ছেলেকে নিজেদের মতে ও পথে আনা সম্ভব নয় জেনেই রাজনারায়ণ তাঁকে স্নেহ দিয়েই আবার জয় করতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া, স্নেহশীল পিতামাতা তাঁদের একমাত্র পুত্র মধুকে আর্থিক দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে রক্ষা করতেও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এদেশীয় বা বিদেশীয় কোন্ খ্রীষ্টান পরিবারে তাঁর পুত্র অতিথি বা গলগ্রহ হয়ে থাকে, এ-ও তাঁর পক্ষে অমর্যাদাকর ছিল। ইংলণ্ড গমনের অত্যুৎসাহে পুত্র ধর্মত্যাগ করেছে জেনে তিনি স্বব্যয়ে পুত্রকে ইংলণ্ড পাঠাতেও সম্মত হলেন।

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় মধুসূদন এক জমিদারের বালিকা কন্যাকে বিবাহের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন সত্য; কিন্তু ইংলণ্ড গমনের পথে তা যে তাঁকে কিছু সাহায্য করবে, তাঁর এই আশা যে মরীচিকা মাত্র, তা তিনি দু-চার দিনেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি পিতামাতার ও আত্মীয়-স্বজনের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে স্বসমাজে ও স্বসংসারে ফিরে আসার অনুরোধ রাখতে না পারলেও পিতার প্রতি বেশ কিছুটা আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। গৌরদাসকে একটি পত্রে মধুসূদন ঐ সময় লেখেন: I won't go to England till December next. I am now about to come and live with or rather near to my father. I am not going to England with Mr. Dealtry; my father won't allow that."

এরপর কিছুদিন সম্ভবতঃ মধুসূদন খিদিরপুরেই পিতামাতার সান্নিধ্যে পৃথক গৃহে বাস করেন। কিন্তু পরবর্তী ডিসেম্বর মাসেও, যে কারণেই হোক, তাঁর বিলেত যাওয়া হ'ল না। হিন্দু কলেজে ঐ সময় খ্রীষ্টান

বালকদের অধ্যয়নের সুযোগ না থাকায় মধুসূদনকে হিন্দু কলেজ ছাড়তে হয়েছিল। বস্তুতঃ, খ্রীষ্টান হওয়ার কিছু আগে থেকেই তিনি হিন্দু কলেজে যাতায়াত বন্ধ করেছিলেন। মধুসূদন ছিলেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র। মধুসূদনও তাঁকে খুবই ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। ক্যাপ্‌টেন রিচার্ডসন কলেজে অনুপস্থিত থাকা-কালে অধ্যাপক কার (Kerr) কলেজের অধ্যক্ষতা করতে থাকেন। যে কোন কারণেই হোক মধুসূদন অধ্যাপক কারের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। এই বিরক্তি কি পরিমাণ ছিল, তা বোঝা যায়, এই থেকে যে, কারের অধ্যক্ষতার সময়ে মধুসূদন কলেজ যাওয়া একেবারে বন্ধ ক'রে দেন। গৌরদাসকে লেখা তাঁর কয়েকখানি পত্র থেকে তা জানা যায়।

১৮৪২ সালের ২৬শে নভেম্বর রাত্রিতে তিনি গৌরদাসকে যে চিঠি লেখেন, তাতে তিনি লেখেন,

I believe you recollect my once hinting to you of a resolution or rather desire of keeping away from College during D. L. R.'s absence. Now I have made up my mind to it, that is, I will not go to College until D. L. R.'s return, be it of whatever duration. I don't care. I have no great liking for any of my fellow Collegians, except a few souls who love me, and whom I love ;—and I hate the d—d fellow K—r.

পরদিন ২৬শে নভেম্বর, তিনি গৌরদাসকে লেখেন :

To-morrow I won't go to College, this is my resolution. I hate College, I hate K-r. Mind I won't go to College to-morrow. I intend writing a note to the d—d fellow K—r for leave of two months. I hope he will grant it. If he won't, I don't care : but I will absent. I will. I will.

পরদিন ২৭শে নভেম্বর একটি পত্রে তিনি আবার গৌরদাসকে লেখেন :

By the bye—how are you getting on? Ye Collegians! H. C. [Hindu College] is an earthly "Pandemonium" with his d—d Satanic Majesty K—r at the head of its vile occupants; (you and a few others excepted, of course).

ঐদিন মধ্য রাত্রিতে গৌরদাসকে আবার লেখেন :

I will show you my wretched-self now and then; —but to College—I will not, I cannot go. I hate the d—d fellow K—r. He wounded my feelings.

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় রিচার্ডসন বিলাত চলে যান এবং কার সাহেবই হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ হন। মধুসূদন ও গৌরদাস বসাকের চিঠি পত্র থেকে জানা যায়, তাঁরা কিছুদিন Mechanical Institute-এ যোগ দিয়েছিলেন। মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজে যেতেন না, এই স্থানটি তখন তাঁর প্রিয় বন্ধু গৌরদাসের সঙ্গে মিলনের স্থান ছিল। এখানে মধুসূদন অঙ্কন প্রভৃতি শিখতেন। খ্রীষ্টান হওয়ার পর সম্ভবত তিনি এখানে যাওয়াও বন্ধ করেন।

পরবর্তী ডিসেম্বরে, অর্থাৎ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে, মধুসূদন যে বিলাত যাওয়ার প্রত্যাশা করেছিলেন, তাও কিন্তু কার্যে পরিণত হ'লো না। এইভাবে আরও কয়েক মাস কাটলো। একমাত্র পুত্রকে সুদূর প্রবাসে পাঠাতে মধুসূদনের পিতামাতার অনিচ্ছা থাকাই ছিল স্বাভাবিক এবং রাজনারায়ণ নিশ্চয় নানা অজুহাতে এবং পুত্রকে নানা স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে কালহরণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর পুত্র ধর্মত্যাগ করেছে ব'লে তিনি তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেননি। তাঁর পুত্র যে অসাধারণ মেধাবী ও তীক্ষ্ণধী, তাতে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। তাই মধুসূদন

যাতে সুশিক্ষিত ও যশস্বী হয়ে পরিণামে সুখী হতে পারেন, সে বিষয়ে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।

ঐ সময় এদেশীয় খ্রীষ্টান ও ইংরেজ বালকদের উচ্চ শিক্ষার জন্যে শিবপুরে একটি কলেজ ছিল। কলেজের নাম বিশপ্‌স্‌ কলেজ। মধুসূদন অচিরে বিলাত-গমনের আশা প্রায় ত্যাগ ক'রে এই কলেজে অধ্যয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাজনারায়ণ তাঁকে ঐ কলেজে ভর্তি ক'রে দিলেন এবং তাঁর শিক্ষার সমস্ত ভার আনন্দের সঙ্গেই বহন করতে স্বীকৃত হলেন।

মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের একুশ মাস বাদে, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে, বিশপ্‌স্‌ কলেজের সাধারণ বিভাগে (Secular Department) ভর্তি হলেন। এই বিভাগে ইউরোপীয় ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হ'তো। কলেজে অন্য যে একটি বিভাগ ছিল, তাতে যারা পরবর্তী জীবনে ধর্মযাজক হতে চায়, তারাই পড়তো। বিশপ্‌স্‌ কলেজে সুশিক্ষিত পাদরিরাই পড়াতেন। ছাত্রদের বাইবেল পড়া ও গির্জায় যাওয়া আবশ্যক ছিল।

মধুসূদন জীবনে বহু ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। বাংলা ভাষায় মহাকবি ব'লেই তিনি পরিচিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বহুভাষাবিদ্‌ও ছিলেন। ইংরেজী ভাষা তাঁর মাতৃভাষার সমতুল্য ছিল। তাছাড়া তিনি লাতিন, গ্রীক, জার্মান, ইতালীয় ও ফরাসী ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। জার্মান, ইতালীয় ও ফরাসী ভাষায় তিনি কথাবার্তা বলতে পারতেন; ইতালীয় ও ফরাসী ভাষায় তিনি কবিতাও লিখতে পারতেন। এছাড়া তিনি ফারসী, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু, হিন্দুস্থানী ও হিব্রু ভাষাও জানতেন। তাঁর এই বহুভাষা শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়েছিল বিশপ্‌স্‌ কলেজে। তখনকার বিশপ্‌স্‌ কলেজে অক্‌স্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষিত পাদরিরা এসে ইংরেজী, গ্রীক, লাতিন, হিব্রু প্রভৃতি ভাষা পড়াতেন। এই সময়ে মধুসূদন পণ্ডিত কুমার স্বামীর কাছে সংস্কৃত ভাষাও শেখেন। তবে মধুসূদন বিশপ্‌স্‌

কলেজে লাতিন ও গ্রীক ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্ররূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

মধুসূদন যে বিশপ্‌স্‌ কলেজে অত্যন্ত গভীরভাবে পড়াশুনোয় মনোনিবেশ করেছিলেন, গৌরদাসকে লেখা তাঁর ঐ সময়কায় সংক্ষিপ্ত পত্রগুলি থেকে তা বেশ বোঝা যায়। ১৮৪৫ সালের ২৭শে জানুয়ারি তিনি লেখেন :

It is a matter of regret to me that I haven't been able to answer your two very kind letters ere this; but if you were to know how my time is engaged here, I am sure you would excuse me. ···I must beg pardon for this short letter, but upon my word, I can't afford a minute more. So good-night.

১৮৪৬ সালের ১৩ই অক্টোবরও তিনি একটি চিঠিতে লেখেন :

Come by all means, if you can; but make up your mind to remain to a late hour, as I cannot exactly be at your service the whole day. I am very busy just now, but come by all means.

মধুসূদন হিন্দু কলেজের মতোই বিশপ্‌স্‌ কলেজেও কৃতী ছাত্ররূপে পরিচিত ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা। হিন্দু কলেজে অধ্যক্ষ কার সাহেব তাঁর মনে ব্যথা দেওয়ায় তিনি যেমন হিন্দু কলেজে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন, তেমনি বিশপ্‌স্‌ কলেজেও একটি বিষয়ে তাঁর আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়ায় তিনি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন।

কলেজে ভর্তি হওয়ার পর মধুসূদন দেখলেন যে, সেখানে ইংরেজ ও ভারতীয় ছাত্রদের জন্যে দুরকম পোশাকের ব্যবস্থা রয়েছে। ইংরেজ ছাত্ররা কোমরবন্ধযুক্ত কালো ক্যাসক ও মাথায় চতুষ্কোণ টুপি প'রে আসে। আর ভারতীয় ছাত্রদের পরতে হয় শুধু সাদা ক্যাসক। ইংরেজ ও

এদেশীয় ছাত্রদের মধ্যে পরিচ্ছদের এই তারতম্য মধুসূদনের আত্মসম্মানে আঘাত করলো। তিনি ইংরেজ ছাত্রদের মতোই কোমরবন্ধযুক্ত কালো ক্যাসক প'রে ও চতুষ্কোণ টুপি মাথায় দিয়ে কলেজে এলেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ আপত্তি ক'রে তাঁকে এদেশীয় ছাত্রদের মতো সাদা ক্যাসক পরতে বললেন। মধুসূদন রুখে দাঁড়ালেন, বললেন, হয় তাঁকে ইংরেজ ছাত্রদের পোশাক পরতে দিতে হবে, নয় তাঁকে তাঁর জাতীয় পোশাকে কলেজে আসতে দিতে হবে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ইংরেজ ছাত্রদের পোশাকে কলেজে আসতে অনুমতি দিলেন না। তখন মধুসূদন সাদা রেশমের কাবা প'রে তার ওপর নকশা-করা এক বিচিত্র ওড়না চড়িয়ে এবং উকীলদের মতো মাথায় শালের পাগড়ি এঁটে কলেজে এসে পৌঁছলেন। তাঁর এই বিচিত্র পোশাক দেখে কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক ডঃ উইলিয়ম কে বললেন যে, এই ছাত্রটির পোশাক বর্ণ বৈচিত্র্যে ইন্দ্রধনুকেও হার মানিয়েছে। শেষ পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ইংরেজ ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক ব্যবহারের অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন।

মধুসূদন কলেজে কালো কোমরবন্ধযুক্ত ক্যাসক ও চতুষ্কোণ টুপি ব্যবহার করতেন। কিন্তু কলেজের বাইরে তিনি ইংরেজদের মতোই জুতো-পোশাক পরতেন।

ঐ সময় রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিশপ্‌স্‌ কলেজের অধ্যাপক। তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন :

He (Modhoosudan) was a person of great intellectual power,—somewhat flightly in imagination, strong in his opinions and sentiments, of an independent mind and very tenacious of personal rights. This brought him into a momentary collision with the authorities of Bishop's College about his dress.

The ecclesiastical authorities had an idea at the time that natives of India should not be encouraged to imitate the English dress—the tail coat and beaver hat. It would have been infinitely better, if they had not interfered with questions beyond their province—for it was this interference which goaded a fiery spirit like Datta's into an obstinate resistance. The collegiate costume was a black cassock and a band and the square cap. There was nothing in these things that was peculiarly English. The authorities wished him to put on a white cassock instead of black. Datta said, 'either the collegiate costume or his own national dress'.

The former not being allowed, Datta appeared in the latter—which was a silk *Kaba* with a coloured turban like the pleader's headpiece and *shawl-roomal* worked all over. This looked too much like a fancy dress to be held as suitable for a student of Bishop's College.···the senior professor consulted me on the subject, saying, his dress had more colours than the rainbow. I cannot say that they were going to strike his name off the rolls—the authorities were certainly annoyed. The upshot of the thing was that Datta was allowed to wear the usual College costume which he adopted to use in College, and took the English coat and bevear-hat as his habit in society out of College.

এ ছাড়াও মাঝে মাঝে ছোটখাটো সংঘর্ষ যে লাগতো না এমন নয়।

স্বাধিকার সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তা ক্ষুণ্ণ হ'লেই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে তার প্রতিবাদ করতেন।

একবার বিশপ্‌স্‌ কলেজে এক নৈশ ভোজে এইরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল। ভোজনের প্রাক্কালে ছাত্রদের মদ পরিবেশন করা হচ্ছিল। ইউরোপীয় ছাত্রদের মদ দিতে দিতে মদ ফুরিয়ে গেল। ফলে এদেশীয় ছাত্রদের মদ আর দেওয়া গেল না। মধুসূদন স্টুয়ার্ডের কাছে নিজের প্রাপ্য মদ দাবী করলেন। কিন্তু স্টুয়ার্ড নিরুপায়। বিন্দুমাত্র মদ অবশিষ্ট ছিল না। তখন মধুসূদন ক্রোধে টেবিলের উপর গ্লাস ছুঁড়ে ভেঙে ফেললেন। স্টুয়ার্ড এই ঘটনার কথা কলেজের অধ্যক্ষকে জানালেন। তাতে কলেজ কর্তৃপক্ষ মধুসূদনের কোনও শাস্তির বিধান করলেন না সত্য, কিন্তু সেই থেকে বিশপ্‌স্‌ কলেজে ছাত্রদের মদ্যপান-রীতি বন্ধ হ'লো।

উপরের দুটি ঘটনা থেকে মধুসূদনের স্বাধিকার-চেতনা ও স্বাজাত্য-বোধ যে কতো প্রবল ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

একদিন কলেজের গির্জায় এক পাদরি বাংলা ভাষায় মানবজীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তৃতায় তিনি একটা উপমা দিয়ে বলছিলেন—"আমরা অদ্য তাম্বু ফেলিলাম, কল্য উঠাইয়া লইলাম এবং অন্যস্থানে তাম্বু গাড়িলাম।" এই বিলাতি বাংলা শুনে মাইকেল হেসে ফেললেন। উপাসনালয়ে হাসা নিশ্চয় অশোভন ও অপরাধ-জনক। ঘটনাস্থলে প্রধান যাজক (বিশপ) উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরে মধুসূদনকে তাঁর হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলে মধুসূদন বললেন, "ওরকম বিলিতি বাংলা শুনলে হাসি চাপা যায় না।"

মধুসূদন কেবল পোশাক-পরিচ্ছদেই নয়, জীবনযাত্রাতেও ইংরেজ ছাত্র ও ইংরেজদের অনুকরণ করতেন। তা ছিল যে কোন বাঙ্গালীর পক্ষে অতীব ব্যয়সাধ্য। মধুসূদনকে তাঁর পিতা বিশপ্‌স্‌ কলেজের খরচ বাবদ মাসে এক শ টাকা ক'রে দিতেন। তার মধ্যে কলেজের খরচের জন্যে লাগতো ৬০ টাকা, বাকি ৪০ টাকা মধুসূদন হাত খরচ

করতেন। মধুসূদনের মা-ও মধুসূদনকে মাঝে মাঝে টাকা দিতেন। কিন্তু অমিতব্যয়িতায় আবাল্য অভ্যস্ত মধুসূদনের এতে চলতো না। তাই মাঝে মাঝে অর্থাভাবে তাঁর প্রাণের মতো প্রিয় পুস্তকগুলিকেও বন্ধক দিতে হ'তো। তাঁর নিজের ভাষায়—"I was the neediest rascal in Bishop's College: I used to pawn my books."

প্রায় তিন বছর মধুসূদন বিশপ্‌স্‌ কলেজে পড়েছিলেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কোন কারণে মধুসূদনের পিতা মধুসূদনের প্রতি বিরক্ত হলেন এবং তিনি তাঁর পড়াশুনোর টাকা হঠাৎ বন্ধ ক'রে দিলেন। এই অবস্থায় মধুসূদন অত্যন্ত বিপাকে পড়লেন। তিনি সরকারী কোন কাজ পাওয়ার জন্যে সচেষ্ট হলেন। ঐ সময়ে সরকারের প্রধান সচিব ছিলেন (পরে স্যার ও ছোট লাট) ফ্রেডরিক হ্যালিডে। মধুসূদন তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদের জন্যে উমেদার হলেন। হ্যালিডে তাঁকে আশা-ভরসাও দিলেন। কিন্তু তা ছিল সময়-সাপেক্ষ। মধুসূদন প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায় পড়েছিলেন। কঠিন অর্থাভাবেও তিনি পিতার দ্বারস্থ হলেন না। অবশ্য, মা তাঁকে গোপনে মাসে মাসে অর্থ সাহায্য করতেন।

দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বহু ছাত্র বিশপ্‌স্‌ কলেজে পড়তেন। তাঁদের সঙ্গে মধুসূদনের বন্ধুত্ব হয়েছিল। সম্ভবত তাঁদের কারো কারো উৎসাহে তিনি ভাগ্যের সন্ধানে একদিন সকলের অজ্ঞাতে বাংলাদেশ ত্যাগ করলেন।

মধুসূদনের দেশত্যাগ ও মাদ্রাজ গমন সম্পর্কে কিশোরীলাল হালদার লিখেছেন:

At length a disagreement with his father arising out of a very trivial matter resulted in the discontinuance of the necessary charges and put an end to his College career. His prospects were gloomy all

around. But he was not the spirit to be daunted by such a dreary spectacle. He must chalk out a path in life for himself. He therefore made up his mind to leave the province at once and try his fortune in a distant part of the country. He had no alternative left him but of leaving for Madras as an adventurer, with some of his fellow students of that Presidency.

কিশোরীলাল পিতাপুত্রের শেষ মনান্তরের কারণকে a very trivil matter—অতি সামান্য বিষয়—বলেছেন। কি সেই সামান্য বিষয়, বলা যায় না। মধুসূদনের বয়স ঐ সময়ে তেইশ বছর হয়েছিল। বৈষয়িক রাজনারায়ণ তাঁর ধর্মত্যাগী পুত্রের মধ্যে অমিতব্যয়িতা, সাহেবিয়ানা, ভাষাশিক্ষা ও সাহিত্যচর্চার মতো অনর্থকরী বিষয়ের অনুশীলন ছাড়া আর কিছু আশার লক্ষণ দেখতে পাননি। রাজনারায়ণ হয়তো আশা করেছিলেন, কালক্রমে নিশ্চয় মধুসূদন তাঁর ভুল বুঝতে পারবেন, এবং খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ ক'রে স্বসমাজে ও স্বসংসারে ফিরে আসবেন। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। সুতরাং মধুসূদনের পশ্চাতে প্রচুর অর্থব্যয়কে রাজনারায়ণ নিশ্চয় অপব্যয়ই মনে করছিলেন। তাছাড়া পুত্রের প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ বন্ধ ক'রে তিনি হয়তো পুত্রকে স্বমতে আনতেও চেয়েছিলেন। মধুসূদনেরও পিতার উপর বিরক্ত হওয়ার কারণ ঘটেছিল। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর পিতা তাঁকে নিজ ব্যয়ে বিলাত পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রায় পাঁচ বছর অতীত হ'তে চললো, সে প্রতিশ্রুতি পূরণের কোন আশা বা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না। পিতা যে তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করবেন না, এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রাজনারায়ণ পুত্রকে নিয়মিত কয়েক বছর তাঁর শিক্ষার জন্য টাকা দিয়ে গেলেও মধুসূদনের প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট ছিল না। এইভাবে মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ফলে পিতাপুত্রের মধ্যে যে ফাটল ধরেছিল, তা ক্রমেই বিস্তৃত এবং শেষ পর্যন্ত

দুস্তর হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় a very trivial matter-ই পিতাপুত্রের চিরবিচ্ছেদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

ঐ সময়ে মধুসূদনের মনের অবস্থা কী রকম ছিল, অনেকদিন পরে মাদ্রাজ থেকে গৌরদাসকে লেখা তাঁর একটি পত্র থেকে বোঝা যায়। তাঁর অভাব-অনটনের কথা বন্ধুদের জানাবার মতো মানুষ ছিলেন না তিনি। তাই তিনি তাঁর স্বদেশ ত্যাগের সঙ্কল্পের কথা গৌরদাসের মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও কাউকে জানান নি। নীরবে, নিঃশব্দে, মাদ্রাজী দু-একজন সহাধ্যায়ীর সঙ্গে গোপনে ব্যবস্থা ক'রে, সকলের অজ্ঞাতে তিনি মাদ্রাজ যাত্রা করেছিলেন। তাই মধুসূদন লিখেছিলেন: When I left Calcutta, I was half mad with vexation and anxiety. Don't for a moment think that you alone did not receive a valedictory visit from me. I never communicated my intention to more than 2 or 3 persons. ঐ দু-তিন ব্যক্তি নিশ্চয় দক্ষিণ ভারতীয়ই ছিলেন।

তখন দেশে আধুনিক যানবাহনের প্রবর্তন হয় নি। না ছিল রেলপথ, না ছিল বাষ্পীয় পোত। তাই মাদ্রাজ-গমন যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য ও কষ্টসাধ্য ছিল। তখন মাদ্রাজ সুদূর বিদেশের সমতুল্যই ছিল।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মধুসূদন মাদ্রাজে এসে পৌঁছেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ বছর।

৬

মাদ্রাজ প্রবাসে

তখন মাদ্রাজ ইংরেজ-শাসিত বৃটিশ ভারতের একটি অংশ হ'লেও সেখানে বাঙ্গালীর সমাগম ছিল না বললেই হয়। তাই জাহাজ থেকে মধুসূদন যখন মাদ্রাজে অবতরণ করলেন, তখন তিনি আত্মীয়-স্বজন-বর্জিত এক সম্পুর্ণ অপরিচিত স্থানেই এসে উপস্থিত হলেন। এই আত্মনির্বাসন তিনি অভিমানে ও ক্ষোভেই বরণ করেছিলেন। তাঁর পিতা তাঁর পড়াশুনোর খরচ বন্ধ ক'রে দেওয়ার পর তিনি নিতান্ত আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন। মাঝে মাঝে গোপনে তাঁর মা তাঁকে কিছু অর্থ সাহায্য করলেও তা যথেষ্ট ছিল না। তিনি অতি কষ্টেই মাদ্রাজ গমনের জন্যে যৎসামান্য অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। তাই তিনি মাদ্রাজে এসে যখন পৌঁছলেন, তখন তাঁর রিক্ত নিঃস্ব অবস্থা।

মধুসূদনের সঙ্গে নিশ্চয় তাঁর সহপাঠী দক্ষিণ ভারতীয় কোনও দেশীয় খ্রীষ্টান বন্ধু এসেছিলেন। তাঁর বা তাঁদের সাহায্যেই তিনি মাদ্রাজের উপকণ্ঠে এক দেশীয় খ্রীষ্টান ও ফিরিঙ্গিদের পল্লীতে এসে আশ্রয় নিলেন। তখনও বাঙ্গালীদের কাছে মাদ্রাজ ছিল 'benighted Madras.' কোথায় ইংলণ্ড গমনের স্বপ্ন, আর কোথায় এই মাদ্রাজের এক অজ্ঞাত পল্লীতে অপরিচিত জনসমাজে আত্মনির্বাসন! মধুসূদনের 'vexation and anxiety' এতোই প্রবল হয়েছিল যে, তিনি যে কোনও কিছুর বিনিময়ে কলকাতা থেকে, পিতা-মাতা, আত্মীয়-বন্ধু, পরিচিত জনসমাজ থেকে দূরে কোথাও পালিয়ে গিয়ে মনের শান্তি ফিরে পেতে চেয়েছিলেন। তিনি খ্রীষ্টান, তাই মাদ্রাজের হিন্দুদের কাছে তিনি কোন সহানুভূতি ও সাহায্য প্রত্যাশা করেননি, নিতেও চান নি। এক

ধনীর দুলাল, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের জন্যই স্বেচ্ছায় এই দারুণ দুঃখ-দারিদ্র্য বরণ করেছে, এটাই সম্ভবত মাদ্রাজের খ্রীষ্টীয় সমাজকে তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ক'রে তুলেছিল। তাঁরা তাই মধুসূদনকে সহজেই আশ্রয় দিলেন এবং যথাসাধ্য সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন।

মধুসূদন কেবল অর্থহীনই ছিলেন না, তিনি মাদ্রাজে উপস্থিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেন। কিন্তু সহায়-সম্বলহীন মধুসূদনকে খ্রীষ্টানরা ত্যাগ করলেন না, চিকিৎসায় ও সেবা-যত্নে সারিয়ে তুললেন। মধুসূদন ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। তাই মাদ্রাজে খ্রীষ্টানদের সহায়তায় ছোটখাটো একটি চাকরি সংগ্রহ করতে তাঁর বিশেষ বিলম্ব হ'লো না।

মধুসূদন আবাল্য প্রাচুর্যের মধ্যেই লালিত হয়েছিলেন। কয়েক মাস তিনি পিতার অকৃপণ দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে অর্থাভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন মাত্র। এখন মাদ্রাজে এসেই তিনি বুঝলেন, জীবনসংগ্রাম, ভদ্রভাবে জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থোপার্জন, কতো কঠিন।

মাদ্রাজ শহরের উপকণ্ঠে ব্ল্যাক টাউনে (পরবর্তীকালের জর্জ টাউনে) ঐ সময়ে খ্রীষ্টান অনাথা বালক-বালিকাদের জন্যে একটি বিদ্যালয় বা বিদ্যাশ্রম ছিল। এতে বালকদের জন্যে একটি বিভাগ এবং বালিকাদের জন্য একটি বিভাগ ছিল। বালকদের জন্যে বিভাগটিতেই (Madras Male Orphan Asylum) মধুসূদন ইংরেজী ভাষার অধস্তন শিক্ষকের কাজ পেলেন।

কিন্তু মধুসূদনের মতো অমিতব্যয়িতায় চিরাভ্যস্ত মানুষের পক্ষে এই চাকরি থেকে পাওয়া সামান্য অর্থে প্রয়োজন মিটতো না। মধুসূদন অর্থোপার্জনের অন্য পথের সন্ধান করতে লাগলেন। হিন্দু কলেজে তিনি আপন খেয়াল-খুশিতে কবিতা লিখতেন। এখন জীবিকার্জনের জন্যেই তিনি লেখনী ধারণ করতে চাইলেন। ঐ সময়ে মাদ্রাজে কতকগুলি পত্রপত্রিকা ছিল। মধুসূদনের মতো ইংরেজী সেযুগে অল্প

ভারতীয়ই লিখতে পারতেন। তাই মধুসূদনের রচনা প্রকাশের অসুবিধা হ'লো না। তাঁর লেখা যেসব কাগজে প্রকাশিত হ'তো, সেগুলির মধ্যে Madras Circular and General Chronicle, Madras Spectator ও Athaenium কাগজের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধিদীপ্ত তেজস্বী রচনাগুলি অল্পদিনের মধ্যেই সম্পাদক ও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তিনি একজন কৃতবিদ্য তেজস্বী তরুণরূপে মাদ্রাজের শিক্ষিত মহলে সহজেই সমাদর পেলেন।

মধুসূদন সংবাদপত্রে কেবল নানা সাময়িক বিষয়ে নিবন্ধই লিখতেন না। তিনি Madras Circular কলেজের জন্যে ধারাবাহিকভাবে 'A Vision' ও এর অব্যবহিত পরেই Captive Ladie নামে কাব্য এবং আরো অনেক কবিতা লেখেন। ঐসব কবিতা তিনি Timothy Penpoem, Esqr. এই ছদ্মনামে লিখতেন। Captive Ladie কাব্যটি পৃথ্বীরাজ-জয়চন্দ্র-সংযুক্তার সুপ্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। মধুসূদন ঐ কাব্যের ভূমিকায় একস্থলে বলেছেন: "I have slightly deviated from the above story in representing my heroine as sent to confinement before the celebration of the Feast of Victory."

১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে Madras Circular-এ Captive Ladie প্রকাশিত হয়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কাগজ থেকে Captive Ladie এবং Visions of the Past নামে অসম্পূর্ণ একটি কবিতা একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এটিই মধুসূদনের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।

Captive Ladie-র ভূমিকায় মধুসূদন এই কাব্যের ত্রুটি সম্পর্কে মার্জনা চেয়ে ঐসব ত্রুটির জন্যে যেসব কারণ দেখান, সেগুলির মধ্যে একটি ছিল, দুঃখ-দৈন্য-ক্লিষ্ট জীবন সংগ্রামে তাঁর ব্যস্ততা, কাব্যের সৃজনে তাঁর পরিপূর্ণ মনঃসংযোগের অভাব: "I have, I am afraid, many reasons to apologise to the public for the imperfections which have crept into the following

poem. It was originally composed in great haste for the columns of a local journal,—"The Madras Circular and General Chronicle"—in the midst of scenes where it required a more than ordinary effort to abstract one's thoughts from the ugly realities of life, want and poverty with 'the battalions of 'sorrows' which they bring, leave but little inspiration for their victim."

কিন্তু মধুসূদন এই দারুণ আর্থিক দুশ্চিন্তা ও মানসিক অশান্তির মধ্যেও যেসব কবিতা রচনা করলেন, সেগুলি পাঠকসমাজে দ্রুত স্বীকৃতি ও সমাদর পেলো। তাঁর 'A Vision' কবিতা প্রকাশের পরে একজন রসজ্ঞ পাঠক Madras Circular-এর সম্পাদকের কাছে যে পত্রখানি লিখেছিলেন, তা থেকে তৎকালীন পাঠকদের অভিমত কতকটা অনুমান করা যায়। ঐ পাঠক 'An admirer', এই বেনামিতে লেখেন :

To Timothy Penpoem, Esq. Sir,—your appearance in the Poet's corner of the Circulator ought to be welcomed by every reader of taste. The classical elegence of your composition, the admirable command which you evidently possess over the resources of English language, and your tlorough knowledge of the mysteries of the "Divine Art" are well calculated to attract attention of no ordinary kind. When I read the first two portions of your "Vision", it struck me that you were none of the Benighted ; you have since confirmed this by lines of exquisite pathos and melodies :—

The home of youth, 'tis far, oh ! far away,
The hopes of youth, they've fled and taught to weep,
The friends of youth, e'en they, Oh ! where are they ?
Ask memory and the dreams which haunt the sleep.
Wing'd messengers and sweet from past ! thy donjon keep !

পত্রলেখক ঠিকই লিখেছিলেন, এই কবিতা কলিগুলির করুণরস ও মাধুর্য অতুলনীয়! কারণ, কবি মধুসূদন তাঁর নিজের অতীতের কথাই মর্মস্পর্শীভাবে এই কবিতা কলিগুলির মধ্যে প্রকাশ করেছেন। পত্রলেখক লিখেছেন " .....There are pasaages in your poem which 'come over the ear' like the music of lyres already consecrated to immortality.... ." এই উক্তিও অসত্য ছিল না।

মধুসূদনের নবপ্রকাশিত ইংরেজী কবিতাগুলির রসজ্ঞ পাঠকের যেমন অভাব ছিল না, তেমনি ঈর্ষাপরায়ণ সমালোচক ও নিন্দুকেরও অভাব ছিল না। সেকথাও ঐ পত্রলেখকের উক্তি থেকে জানা যায়। পত্রলেখক মধুসূদনকে ঐসব ঈর্ষাপরায়ণ ক্ষিপ্ত কুকুরদের কলরবের প্রতি কর্ণপাত না ক'রে আরও কবিতা রচনা ক'রে তাঁর পাঠকদের আনন্দ দিতে অনুরোধ করছেন : "In conclusion, I trust you will not cease to delight us with your poetry. Though you have already excited jealousy, listen to all curs with the contempt they desire...."

মধুসূদনের সহাধ্যায়ী এবং Travels of a Hindu গ্রন্থের প্রণেতা বাবু ভোলানাথ চন্দ্র Captive Ladie সম্পর্কে লিখেছিলেন :

"It arose as an aurora-borealis from amidst the cold of want and poverty. We have had in our day Anglo-Bengali poets, such as Kasi Prasad Ghose, Raj Narayan Dutt, Guru Charan Dutt, O. C. Dutt and others ; Modhu distances them all."

"অ্যাথিনিয়াম" পত্রিকায় একজন পত্রলেখক লেখেন : এতে এমন অনেক অংশ আছে, যাকে বায়রন বা স্কট নিজের রচনা বলতে লজ্জিত হবেন না ("what I believe neither Scott nor Byron would have been ashamed to own") ।

মধুসূদনের এটি প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। তাই এর সম্বন্ধে এই চব্বিশ-পঁচিশ বছরের তরুণ লেখকের অত্যধিক উৎসাহ থাকাই ছিল স্বাভাবিক। মাদ্রাজের সুধীসমাজ তাঁর সেই উৎসাহকে প্রশংসা ও অভিনন্দনের দ্বারা বর্ধিতই করেছিলেন। মধুসূদন বাংলাদেশ ত্যাগ ক'রে গেলেও মাদ্রাজ তাঁর কাছে ছিল benighted' বা তমসাচ্ছন্ন এবং কলকাতা enlightened বা আলোকপ্রাপ্ত। কলকাতার কাগজগুলিতে তাঁর রচনার উচ্চ প্রশংসা হবে, তা তিনি আশা করেছিলেন এবং Hindu Intelligencer, Bengal Hurkaru প্রভৃতি কাগজে তাঁর নব-প্রকাশিত গ্রন্থ মতামতের জন্য পাঠিয়েছিলেন। ঐসব কাগজে কিন্তু বিরুদ্ধ মতামতই প্রকাশিত হয়েছিল। বেঙ্গল হরকরা লিখেছিল : "These verses of M. M. S. Dutt are very fair amateur poetry ; . " মধুসূদন ক্যাপ্‌টিভ লেডির ভূমিকায় তাঁর দৈন্য-দারিদ্র্য এবং সংবাদপত্রের রচনার জন্য ত্বরা সম্পর্কে যে উল্লেখ করেছিলেন, হরকরা সে সম্পর্কেও শ্লেষোক্তি করতে দ্বিধা করেনি। হরকরা ঐ সময় ভারতীয় কাগজগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল। তার এই অভিমত মধুসূদনকে অত্যন্ত পীড়িত করেছিল। হিন্দু ইন্‌টেলিজেন্সার' কাগজের সম্পাদক ছিলেন হিন্দু কলেজের 'প্রাক্তন ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষ। কাশীপ্রসাদ নিজেও ইংরেজী ভাষায় কবিতা

লিখতেন। এমন কি তিনিও তরুণ ও অনুজপ্রতিম কবিকে উৎসাহিত না ক'রে তাঁর কাব্যের বিরুদ্ধ আলোচনাই করেছিলেন।

বাংলাদেশের কবি ও সমালোচকদের কাছ থেকে ঐ ধরনের বিরূপতা মধুসূদন আশা করেননি, তাই তা তাঁকে অত্যন্ত পীড়া দিয়েছিল।

এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে মধুসূদন মাদ্রাজের সুধীসমাজে খুবই প্রশংসা ও মর্যাদা পেলেও উপযুক্তরূপ ক্রেতা পাননি। দারুণ অর্থাভাব সত্ত্বেও মধুসূদন নিজব্যয়েই এই কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। তাই পুস্তক মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করাও তাঁর কাছে এক সমস্যা হয়ে উঠেছিল। তার ওপর তিনি তখন একাকী ছিলেন না। তিনি মাদ্রাজের আত্মীয়-স্বজনহীন অবস্থায় একটি সুখের সংসার বাঁধতে চেয়েছিলেন—তিনি এক ইংরেজ মহিলাকে বিবাহও করেছিলেন। তাই তাঁর ব্যয়ভার ও অর্থচিন্তাও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এই মহিলার নাম রেবেকা ম্যাক্‌টাভিস্‌। রেবেকার পিতা ছিলেন একজন নীলকর এবং তাঁর পিতামহ ডুগাল্‌ড্‌ ম্যাক্‌টাভিস্‌ ছিলেন কডাপ্পা জেলার নীল ব্যবসায়ী আরবুথনট কোম্পানির একজন এজেণ্ট। মধুসূদন যে অনাথ বিদ্যাশ্রমের বালক বিভাগে শিক্ষকতা করতেন, সেই বিদ্যাশ্রমের বালিকা বিভাগে পড়তেন রেবেকা। মধুসূদন ও রেবেকার মধ্যে পরিচয় এবং পরিচয় থেকে প্রেম ঘটে। মধুসূদন রেবেকার মধ্যে তাঁর কৈশোরের স্বপ্নচারিণী সেই blue-eyed maid-এর সাক্ষাৎ পান এবং রেবেকাও সম্ভবত Othello's visage দেখতে পান মধুসূদনের মুখে। মধুসূদন রেবেকার পাণিপ্রার্থী হ'লে এই অজ্ঞাতকুলশীল, বিশেষত বিত্তহীন, যুবকের হস্তে রেবেকাকে তুলে দিতে তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা অসম্মত হলেন। মধুসূদনের অত্যুৎসাহ শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। এ বিষয়ে মাদ্রাজের তৎকালীন অ্যাডভোকেট-জেনারেল জর্জ নর্টন এই অত্যুজ্জ্বল সম্ভাবনায় পূর্ণ তরুণকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন।

কেবল বিবাহের বিষয়েই যে মধুসূদনকে জর্জ নর্টন সাহায্য করেছিলেন, তা নয়। এই বৃদ্ধ বান্ধবহীন মাদ্রাজে মধুসূদনের অন্যতম প্রধান হিতকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি মধুসূদনের মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রতিভার লক্ষণ দেখেছিলেন। তিনি মধুসূদনকে বন্ধুর মতো উপদেশ দিতেন, উৎসাহ দিতেন, সাহায্য করতেন। তিনি নিজেও সাহিত্যরসিক ছিলেন। তাঁর নিজের সংগ্রহ থেকে তিনি অনেক উৎকৃষ্ট সাহিত্যগ্রন্থ মধুসূদনকে উপহারও দিয়েছিলেন। মধুসূদন তাঁর 'ক্যাপ্‌টিভ লেডি' প্রকাশিত হ'লে ঐ কাব্যগ্রন্থ জর্জ নর্টনের নামেই উৎসর্গ করেন।

এ-হেন জর্জ নর্টন ছিলেন রেবেকার ধর্মপিতা বা God-father. রেবেকাকে বিবাহ করলে মধুসূদন সুখী হবেন মনে ক'রে তিনি এই বিবাহে উদ্‌যোগী হন। নর্টনের মধ্যস্থতায় মধুসূদনের সঙ্গে রেবেকার বিবাহ হয়।

এই বিবাহ সম্ভবত ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি হয়েছিল। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি মধুসূদন এক পত্রে গৌরদাসকে লেখেন :

Since my arrival here, have had much to do in the way of procuring a standing place for myself, —no easy matter, I assure you,—especially for a friendless stranger. However, thank God, my trials are, in a certain measure, at an end, and I now begin to look about me very much like a commander of a barque, just having his anchors in a comparatively safe place, after a fearful gale !···

Your informrtion with regard to my matrimonial doings is quite correct. Mrs. D. is of English parentage. Her father is an indigo-planter of this Presidency. I had great trouble in getting her. Her friends, as you may imagine, were very much against the match. However, "all is well, that ends well !"

সব ভালো যার শেষ ভালো। কিন্তু এই বিবাহের শেষ ভালো হয়নি। যাই হোক, বিবাহের পরবর্তী কয়েক বছর যে তাঁরা সুখেই ছিলেন তা অনুমান করা যায়। মধুসূদন তাঁর Captive Ladie-র প্রস্তাবনায় কবিতার এগারোটি স্তবকে কবি-প্রিয়ার উদ্দেশে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অকৃপণভাবে প্রকাশ করেছেন।

মধুসূদন এই পত্র যখন (১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৯) গৌরদাসকে লেখেন, তখন Captive Ladie গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার জন্যে ছাপাখানায় গিয়েছে। তিনি গৌরদাসকে জানান, "It (Captive Ladie) contains about twelve hundred lines of good, bad and indifferent octo-syllabic verse and (truth, 'pon my honour !) was written in less than three weeks." সেই সঙ্গে তিনি এ-ও জানান যে, তিনি গ্রাহকদের কাছ থেকে অগ্রিম মূল্য সংগ্রহ ক'রে বইখানির মুদ্রণব্যয় নির্বাহ করতে চান, এবং এ থেকে এক পয়সাও লাভ রাখতে চান না। বইখানির প্রতি কপির মূল্য করা হয়েছে দু টাকা। কিন্তু মাদ্রাজে ঐ ধরনের গ্রাহক বা ক্রেতা খুব বেশী পাওয়া সম্ভব নয়, মুদ্রণব্যয়ও অত্যধিক। তাই গৌরদাস যদি কলকাতায় তাঁকে কিছু গ্রাহক সংগ্রহ ক'রে দেন, তবে তিনি খুবই উপকৃত হবেন। ঐ পত্রে তিনি বঙ্কুবিহারী, ভূদেব, হরিমোহন, স্বরূপ প্রভৃতি তাঁর প্রিয় বন্ধুদের কথাও উল্লেখ করেন এবং তাঁরাও কিছু গ্রাহক সংগ্রহ ক'রে দিতে পারবেন, এমন আশাও প্রকাশ করেন।

ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে আকণ্ঠ মগ্ন মধুসূদনের পক্ষে তৎকালীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে উন্নাসিকতা থাকাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলা ভাষার প্রতি যে তাঁর অনুরাগ একেবারেই ছিল না, এমন কথাও বলা যায় না। বিদেশতুল্য মাদ্রাজে এবং নিজের পরিবারে (ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করায়) ইংরেজী তাঁর সর্বক্ষণের ব্যবহার্য ভাষা হয়ে উঠেছিল। তাই বাংলা-ভাষার ব্যবহার তিনি ভুলতে বসেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন। তাই তাঁর বিস্মৃতপ্রায়-মাতৃভাষাকে ঝালিয়ে

নেওয়ার জন্যে তিনি ঐ পত্রে গৌরদাসকে কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন : "I say, old Gourdas Bysack ! can't you send me a copy of the Bengali translation of the Mahabharat by Cassidoss as well as a ditto of the Ramayana,—Serampore edition ? I am losing my Bengali faster than I can mention···"

তিনি বিশপ্‌স্‌ কলেজে তাঁর যেসব বই ফেলে গিয়েছিলেন, সেগুলিকে তাঁর কাছে জাহাজযোগে মাদ্রাজে পাঠাবার জন্যে তিনি গৌরদাসকে অনুরোধ করেন। তাঁর জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু যে বলেছেন, তিনি তাঁর নিজের বইগুলি বিক্রয় ক'রে মাদ্রাজ গমনের পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন, তা ঠিক নয়।

একজন বিখ্যাত কবি হওয়াই ছিল মধুসূদনের জীবনের আকাঙ্ক্ষা। এইজন্যই তিনি চেয়েছিলেন ইংলণ্ড যেতে, ইংলণ্ড যাওয়ার সুযোগের আশায় গ্রহণ করেছিলেন খ্রীষ্টধর্ম, পারিবারিক অশান্তি, দুঃখ-দৈন্য। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে দূর প্রবাসে এসে সামান্য বেতনে শিক্ষকতা ক'রে ও সাংবাদিকতা ক'রে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে কোনদিন মিটবে না, তা-ও তিনি মধ্যে মধ্যে অনুভব করছিলেন। তাই ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ এক পত্রে তিনি গৌরদাসকে লিখেছিলেন :

As for me, I am a poor usher in a poor school—viz. "the Madras Male Asylum for the children of Europeans and their descendants";—all my pupils are Europeans and East Indians. I dress like them, both on account of my good lady and situation I hold. Did you ever see me in any European clothes ? I make a passable Tash Feringee.······All that I want to make me a regular man of letters, is a decent situation, with a few hundreds a month. Who will

give it me? Is there none in India? Time will show.

মধুসূদনের এই কথাগুলি শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের সেই বিখ্যাত উক্তি —a kingdom for a horse-এর মতোই শোনায়। আমি মহাকবি হতে পারি—যদি একটি ভালো চাকরি পাই।

ক্যাপ্‌টিভ লেডী প্রকাশের সূচনা থেকেই তাঁর কলকাতার পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ঐ সময়ে মধুসূদনকে তাঁর কাব্যজগতে গ্রন্থকাররূপে প্রবেশ ও ইংরেজ মহিলাকে পত্নীরূপে প্রাপ্তি কিছুটা হৃষ্ট করলেও তাঁকে অর্থাভাবে যথেষ্টই উদ্বিগ্ন দেখি। ৬ই জুলাই (১৮৪৯) তিনি গৌর বসাককে এক পত্রে লেখেন:

Pray let me have the money as early as you can. Get old Sham to get an order from Bagshaw & Co. to Bainbridge & Co. of this city, for such a sum to be paid at sight to the high and mighty M. Dutt, Esqr. & Co. or order. So much for business. Printing, my friends, is as dear, here, as possible. What could I do? My printer is impatient. I am sure you can ask some friends to get you a few purchasers. I make you my plenipotentiary to sell the books at any rate you like; only let me have money to pay my printer.

প্রিয় বন্ধুকে তিনি তাঁর দারুণ অর্থকষ্টের কথা জানালেও সেই সঙ্গে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ আশার কথাও জানান ঐ পত্রে:

You will, I am sure, be surprised—agreeably surprised—to hear that, a short time ago, I was sent for by the Advocate-General Mr. Gordon. The old man received me as kindly as I could

expect, and after making enquiries about my prospects and so forth, told me that he was going to procure for me Govt. employ of an infinitely more respectable and lucrative kind than my present place. It seems, they are going to establish a Provincial College, like our Dacca, Benares, Hooghly affairs etc. I have the promise of a Head-mastership or an inspectorship. ···He has moreover introduced me to E. B. Powell, Esqr.—the headmaster of the university here.···

মধুসূদন গোপনে মাদ্রাজ চলে যাওয়ার পর জাহ্নবী দেবী পুত্রশোকে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন। পুত্র খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় তিনি যে আঘাত পেয়েছিলেন, পুত্র মাদ্রাজে চলে যাওয়ায় আঘাত পেয়েছিলেন তার শতগুণ বেশী। এখানে যখন মধুসূদন ছিলেন, তখন মা তাঁকে মাঝে মাঝে দেখতে পেতেন, আদর-যত্ন করবার সুযোগ পেতেন, পুত্রের হাতে তাঁর সঞ্চিত যৎসামান্য মাঝে মাঝে দিয়ে তাঁর স্নেহের ক্ষুধা কিছুটা মেটাতেন। কিন্তু পুত্র এখন সুদূর প্রবাসে থাকায় সে সমস্ত সুখ থেকেই তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। মার এই দুঃখ-দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গৌরদাস মধুসূদনকে একটি পত্র লিখেছিলেন; মা তাঁর জন্যে কিছু স্নেহোপহার পাঠাতে চান, তাও জানিয়েছিলেন। মধুসূদন তার উত্তরে লেখেন:

And now, my good Gour, I must tell you, that you are wrong, very wrong, in talking of my mother and myself in the tone you have adopted. I tell you that in this world we have all to cut out paths for ourselves. How can you then expect

a fellow to be in his mother's apron? …*Do* send me the parcel sent by my mother. There are ships coming to Madras daily. Address it to me, and let me have the bill of lading. I do not think it will cost me much.

মাদ্রাজে 'ক্যাপ্‌টিভ লেডী' রচনার জন্যে যথেষ্ট প্রশংসা পেলেও কলকাতার কাগজগুলি তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করায় তিনি ব্যথিত এবং রুষ্ট হয়েছিলেন, আগেই বলা হয়েছে। তিনি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন এক পত্রে গৌরদাসকে লিখেছিলেন :

I find that your "Hurkura" has been somewhat severe with me. Curse the rascal, his article reached me like a shaft which has spent its force in its progress. Know, O thou noble youth, that I have girt may loins to do battle manfully, even as a gallant knight, who seeks the loftiest guerdon on this earth the Poet's crown of laurel-leaf. Methinks, that after the praise, I have received from some whose claims to bestow them indubitable, I can afford to stand a little abuse.

কিন্তু কলকাতার বন্ধুরাও যখন তাঁর কাব্য সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হলেন না দেখা গেল, তখন মধুসূদনের উৎসাহ অনেকটা স্তিমিত হয়ে এলো। এখন তাঁর কাছে এই কাব্যগ্রন্থ উৎকৃষ্ট কাব্য রইলো না, হয়ে উঠলো ভালো একটি চাকরি লাভের পথ সুগম করার হাতিয়ার। তিনি ৬ই জুলাই (১৮৪৯) তারিখে গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, তাতে একথা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেন : "You seem to consider the "Captive" a failure, but I don't. For, look you, it has opened the most splendid prospects for me, and has

procured me the friendship of some whom it is an honour." এই the most splendid prospects যদি একটি কলেজের অধ্যাপক পদ বা ইন্‌স্‌পেক্টরের পদ হয়, তবে কাব্যের মূল্য সম্পর্কে কবি যে ব্যর্থতা স্বীকার ক'রেই নিচ্ছেন, তাতে সন্দেহ কি। ঐ পত্রে তিনি আরো স্বীকার করেন: 'Remember, my friend, that I published it for the sake of attracting some notice, in order to better my prospects, and not exactly for Fame". এক মাস পূর্বেও যে কাব্য সম্পর্কে কবির এতো উল্লাস ছিল, এতো উৎসাহ ছিল, সেই কাব্য সম্পর্কে এখন এই ধরনের উক্তি নিজের ব্যর্থতাকেই স্বীকার করা।

'ক্যাপ্‌টিভ লেডী' প্রকাশের সময়ে ও পরে মধুসূদন অন্য একটি কাব্য রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু কাব্যটি তিনি সমাপ্ত ও প্রকাশ করেননি। Captive Ladie সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক ধারণা পরিবর্তিত হওয়ায় এবং কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ আর্থিক দিক থেকে লাভজনক না হওয়ায়, সম্ভবত তিনি ঐ কাব্য সমাপ্ত ও প্রকাশ করেন নি। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ তিনি তাঁর নূতন কাব্য সম্পর্কে লিখেছিলেন: "You must wait till the appearance of the poem itself. If I meet with a favourable reception from the public for my "Captive", I shall come out again before the pot cools." এর দু মাস বাদে ২৭শে মে তিনি গৌরদাসকে পুনরায় লেখেন: "When I received your thrice welcome letter, I was too busy to reply. The conception, birth and growth of a new poem have hitherto deprived me of that pleasure,—for pleasure it is, I swear to you.

This same new poem is not entirely finished. I have just got upwards of 12 hundred good, bad

and indifferent verses, yclept the heroics. More of this anon."

মাদ্রাজে মধুসূদন কিছু বিদগ্ধ জনের উৎসাহবর্ধক প্রশংসা পেলেও "a favourable reception of the public" আদৌ পান নি। কলকাতাতেও তাঁর বন্ধুরা তাঁর বইখানি বিক্রির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও সফল হন নি। মধুসূদন কাব্যমুদ্রণের ব্যয় নির্বাহ করতেও অপারগ হয়ে উঠেছিলেন। অন্য পক্ষে, এই সময় তাঁকে ইংরেজী কাব্য রচনা ক'রে যশের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করবার দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে একটি ঘটনা বিশেষভাবে প্রণোদিত করেছিল। এইসব কারণে সম্ভবত তাঁর বহুবিলম্বিত নূতন কাব্য তিনি সম্পূর্ণ ও প্রকাশ করেন নি।

২৭শে মে (১৮৪৯) তারিখে মধুসূদন হিন্দু কলেজের সহাধ্যায়ী বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে তিনি তাঁর Captive Ladie-র এক কপি হিন্দু কলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র এবং গভর্নর-জেনারেলের শিক্ষা-পরিষদের (Education Council) সভাপতি ও আইন-সচিব বীটন (Bethune) সাহেবকে দেওয়ার জন্যে গৌরদাসকে বলতে অনুরোধ করেছিলেন। ৬ই জুলাই (১৮৪৯) গৌরদাসকে তিনি নিজে যে পত্র লেখেন, তাতেও গৌরদাসকে মিঃ বীটনকে Captive Ladie দেওয়ার জন্যে বলেন এবং দেওয়ার বয়ানটি কি রকম হবে, তা-ও লিখে পাঠান:

"Sir, I have the honour to send for your kind acceptance the accompanying little volume, as a humble token of the author's gratitude for your philanthropic endeavours in the service of this country. I cannot omit this opportunity of saying how much my own feelings towards you resemble those of my friend, and how cheerfully and seriously,

I subscribe myself, Dear Sir, your most obedient and grateful servant etc."

মধুসূদনের নির্দেশমতো গৌরদাস মিঃ বীটনকে 'ক্যাপ্‌টিভ লেডী' এক কপি উপহার দেন। বীটন সাহেব মেকলের বিপরীত শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। তিনি এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে উৎসাহী থাকলেও কেবল ইংরেজী ভাষার চর্চাকেই এদেশীয়দের মানসিক বিকাশের পথ মনে করতেন না। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে মাতৃভাষার উন্নতির দিকেও সকলকে উৎসাহ দিতেন। তাই মধুসূদনের মতো প্রতিভা বিপথে চালিত হচ্ছে দেখে তিনি দুঃখ বোধ করলেন এবং মধুসূদনকে সস্নেহ উপদেশে মাতৃভাষার উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগের জন্যে অনুরোধ জানালেন। তিনি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই একপত্রে গৌরদাসকে লিখলেন :

Sir,

I beg that you will convey my thanks to your friend for the gift of his poem. It seems an ungracious return for his offering that I should take this opportunity, through you, of endeavouring to impress on him the same advice which I have already given to several of his countrymen, which is, that he might employ his time to better advantage than writing English poetry. As an occasional exercise and proof of his proficiency in the language, such specimens may be allowed. But he could render far greater service to his country and have a better chance of having a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by

the study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry at all events he must write.

By all that I can learn of your vernacular literature, its best specimens are defiled by grossness and indecency. An ambitious young poet could not desire, a finer field for exertion than in taking the lead in giving his countrymen in their own language a taste for something higher and better. He even will do good service by translation. This is the way by which the literature of most European nations has been formed.

গৌরদাস নিজেও হিন্দু কলেজে পড়ার সময় থেকেই, মধুসূদনকে বাংলা ভাষায় কবিতা লেখার জন্যে উৎসাহিত করতেন। পরবর্তী কালেও সেই পরামর্শদানে তাঁর বিরাম ছিল না। এখন মিঃ বীটনের মতো এক ব্যক্তি তাঁরই পরামর্শের প্রতিধ্বনি করায় তিনি মধুসূদনকে লিখলেন: "His advice is the best you can adopt. It is an advice that I have always given you and will din into ears all my life." ঐ সময়ে ইংরেজীতে কাব্য রচনা ও প্রকাশ সম্পর্কে মধুসূদনের উৎসাহ অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল, তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বীটনের এই পরামর্শকে এখন তিনি দৈববাণীর মতোই গ্রহণ করলেন। এখন বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা এবং বাংলা ভাষাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সম্পদে পূর্ণ করবার জন্যে তিনি প্রস্তুত হ'তে লাগলেন।

গৌরদাসকে মিঃ বীটন পত্র লেখার এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে মধুসূদন গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, তাতে তাঁর এই সংকল্পের কথা তিনি দৃঢ়তার সঙ্গেই ঘোষণা করেন। তিনি লেখেন:

My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine, 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 school, 12—2 Greek, 3—5 Telegu and Sanskrit, 5—7 Latin, 7—10 English. Am I not preparing for the greater object of embellishing the tongue of my fathers?

ঐ পত্রে (১৮ই আগস্ট, ১৮৪৯) তিনি গৌরদাসকে জানান যে, তাঁর একটি কন্যা হয়েছে—'you will be glad to hear that my wife has just given me a little daughter. So I am a father." কেন জানি না এই সংবাদ তিনি তাঁর পিতাকেও জানাতে লেখেন।

ঐ পত্রে তাঁর আর্থিক অনটনের কথা তিনি আবার ব্যক্ত করেন:

I am badly off and have hardly anything to jingle in my pocket. Beg I must not. My wants, at present, are of such a nature as philosophy cannot justify.

কবিযশঃপ্রার্থী মধুসূদন যখন দূর প্রবাসে মাদ্রাজে তাঁর ইংরেজ পত্নী ও শিশু-কন্যাকে নিয়ে আর্থিক অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন, তখন বাংলাদেশে তাঁর জননী ছিলেন মৃত্যুশয্যায়। পুত্র খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় তিনি মৃতকল্প হয়েছিলেন। তাঁর মনের যখন এই অবস্থা, তখন তাঁর স্বামীও তাঁকে বারে বারে আঘাত দিতে ক্রটি করেননি। একমাত্র পুত্র খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় রাজনারায়ণ দত্ত পুনরায় সন্তানলাভের আশায় সাগরদাঁড়ি গ্রামের অনতিদূরবর্তী সাতবেড়ে গ্রামের শিবসুন্দরী নামে এক কন্যাকে বিবাহ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই শিবসুন্দরীর মৃত্যু ঘটে। শিবসুন্দরীর মৃত্যুর পর রাজনারায়ণ পুনরায় বিবাহ করেন—বাকসি পরগনার বারাসত গ্রামের প্রসন্নময়ী নামে এক কন্যাকে।

প্রসন্নময়ী জাহ্নবী দেবীর খুবই অনুগতা ছিলেন। তিনি জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে খিদিরপুরের বাড়িতেই থাকতেন। মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পরে যখন মাঝে মাঝে মায়ের কাছে আসতেন, তখন প্রসন্নময়ী মধুসূদনকে খুবই আদরযত্ন করতেন। প্রসন্নময়ীও নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর সন্তান না হওয়ায় রাজনারায়ণ দত্ত চতুর্থ বার বিবাহ করেন— যশোহর জেলার শক্রজিৎপুরের হরকামিনী নামে এক কন্যাকে। রাজনারায়ণ যখন হরকামিনীকে বিবাহ করেন, তখন মধুসূদন ছিলেন প্রবাসে এবং জাহ্নবী দেবীও জীবন্মৃতা অবস্থায় খিদিরপুরে। সাগর-দাঁড়িতেই এই বিবাহ হয়। আঘাতের পর আঘাত পেয়ে জাহ্নবী দেবী ক্রমেই মৃত্যুর কোলে আত্মসমর্পণ করেন। মাতার এই মৃত্যুসংবাদ মধুসূদন মাদ্রাজে কোনও সূত্রে পেয়েছিলেন। তিনি মায়ের মৃত্যুর কিছুদিন পরে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে কোনও কাজে গোপনে কলকাতা আসেন এবং কয়েকদিন কলকাতায় থাকেন। তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ-ও করেন। এই সাক্ষাৎ তিনি কেন করেছিলেন ও তার ফল কি ঘটেছিল, তা জানা যায়নি।

আমরা সাধারণত অভ্যাসবশতঃ জীবনী-রচনাকালে মাতাপুত্রের স্নেহ-সম্পর্কের আলেখ্যটির উপরেই জোর দিই। পিতা-পুত্রের স্নেহের সম্পর্ককে অতটা আমল দিই না। বিদ্যাসাগরকে আমরা যতোখানি মাতৃভক্ত ক'রে প্রচার করি, তাঁর পিতৃভক্তির দিকটা ততোখানি উপেক্ষা ক'রেই যাই। তাই এক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, রাজনারায়ণ ও মধুসূদনের মধ্যে দুই ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ যতোই তীব্র ও বিষাদময় হোক, পরস্পর পরস্পরকে যতোই আঘাত করুন, হৃদয়ের গভীরে তাঁদের মমতার সম্পর্ক সুদৃঢ়ই ছিল। তাই সম্ভবতঃ মধুসূদন তাঁর প্রথম কন্যা লাভের সংবাদ মাকে দিতে না ব'লে পিতাকেই দিতে বলেছিলেন: As soon as you get this letter write off to father to say that I have got a daughter. I do not know how to do the thing in Bengali. জাহ্নবী দেবী তখন জীবিত

ছিলেন। গৌরদাসেরও তাঁকে সংবাদ দেওয়ার অসুবিধা থাকার কথা নয়, কারণ জাহ্নবী দেবী গৌরদাসকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। তবু এই আনন্দ-সংবাদ মধুসূদন তাঁর হতভাগিনী মাকে না দিয়ে পিতাকেই দিতে বলেছিলেন। কিন্তু কেন?

যাই হ'ক, জাহ্নবী দেবীর মৃত্যুর পর মধুসূদন সেই মাতৃহীন শূন্য গৃহে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রেই মাদ্রাজে ফিরে গিয়েছিলেন। তিনি গোপনেই এসেছিলেন, গোপনেই গিয়েছিলেন। তিনি কলকাতায় কয়েকদিন ছিলেন। তবু তিনি আত্মীয়স্বজন দূরের কথা, তাঁর প্রিয়তম সুহৃদ্ গৌরদাসের সঙ্গেও দেখা করেননি। অথচ গৌরদাসের সাম্প্রতিক পত্নীবিয়োগের সংবাদও গৌরদাস মধুসূদনকে দিয়েছিলেন। মধুসূদনের চরিত্রের এই একটি দিক সত্যই পীড়াদায়ক। দানের প্রতিদানে যার যা প্রাপ্য, মধুসূদন তা প্রায়ই দিতে পারেননি। পরে বিদ্যাসাগরের প্রতি আচরণেও আমরা এই বিষয়টি লক্ষ্য করবো। তাই মধুসূদন মহাকবি হলেও তাঁর চরিত্র সুমহৎ হতে পারেনি। তাতে আগ্নেয়-গিরির সুতীব্র জ্বালা ও প্রচণ্ড দীপ্ত ছিল সত্য, কিন্তু তাতে হিমালয়ের সমুন্নত মহিমা ছিল না। তাই তাঁর জীবন ও প্রতিভার মধ্যে ছিল এতোই বৈষম্য, এমন বৈপরীত্য।

কাব্য-রচনা অর্থকরী নয় দেখে মধুসূদন এই সময় সাংবাদিকতার প্রতি বেশী জোর দিয়েছিলেন। পাত্র ঠাণ্ডা হওয়ার আগে (before the pot cools) তিনি যে নূতন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের কথা ঘোষণা করেছিলেন, তা আর সম্ভবতঃ প্রকাশিত হয় নি। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সম্পাদন ও প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির নাম Hindu Chronicle. খ্রীষ্টান মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর নিজের প্রকাশিত কাগজের নাম কেন যে Hindu Chronicle দিয়েছিলেন, তা বোধগম্য নয়। এই পত্রিকা তাঁর আর্থিক অনটনের কোনও সুরাহা করতে পারে নি নিশ্চয়, তাঁর আর্থিক উদ্বেগ ও

দুশ্চিন্তাকে অনেক পরিমাণে হয়তো বৃদ্ধিই করেছিল। তবে তিনি ঐ সময় গোপনে কলকাতা এসে পিতার কাছ থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন, মনে হয়। নইলে তাঁর শোচনীয় আর্থিক অনটনের মধ্যে তিনি যে সংবাদপত্র প্রকাশের মতো একটি ব্যয়সাধ্য কাজে রিক্তহস্তে নেমেছিলেন. মনে হয় না। যে পিতার সঙ্গে কলহ ক'রে তিনি মাদ্রাজে চলে গিয়েছিলেন এবং নিজের পথ নিজে তৈরি ক'রে নেওয়ার সংকল্প করেছিলেন, সেই পিতার দ্বারস্থ হয়ে অর্থভিক্ষা করতে তাঁর দুর্জয় অহঙ্কারে নিশ্চয় লেগেছিল। কিন্তু নিরুপায় মধুসূদনকে তাই করতে হয়েছিল। নিজের এই পরাজয়ের কথা তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব, কাউকেই জানাতে চাননি ব'লেই সম্ভবত তিনি তাঁর পিতা ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ না ক'রে যেমন গোপনে কলকাতা এসেছিলেন, তেমনি গোপনে কয়েকদিন কলকাতায় থেকে গোপনেই মাদ্রাজে ফিরেছিলেন।

'হিন্দু ক্রনিক্‌ল্' পত্রিকা মধুসূদনের তেজস্বী লেখনীস্পর্শে অচিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। নইলে যে "বেঙ্গল হরকরা" কাগজ তখন শীর্ষস্থানীয় ব'লে গণ্য ছিল এবং মধুসূদনের কাব্যগ্রন্থ ক্যাপ্‌টিভ লেডীর এতোই বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিল, সেই "বেঙ্গল হরকরা" কখনই সুদূর মাদ্রাজের "হিন্দু ক্রনিক্‌লে" প্রকাশিত নিবন্ধাদি পুনর্মুদ্রণ করতো না। অন্যান্য অনেক পত্র-পত্রিকাতেও 'হিন্দু ক্রনিক্‌ল্' থেকে বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত হ'তো। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই গৌরদাস বসাক মধুসূদনকে একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি প্রথমে মধুসূদনের অবন্ধুজনোচিত আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন :

> I understand from Rev. Jaddunath that sometime ago you paid a flying visit to Calcutta, and that after having finished your business returned to your favourite town. I was extremely sorry to hear so, for I thought I had every reason

to expect that you would give me an opportunity to see you ; and your having neglected to do so, savoured something that I did not like much, for it exhibited total want of feeling towards me. I spoke to Soroop about it and he confirmed the report tho' he did not much approve of your conduct.

বন্ধুর এই ধরনের আচরণে যে কোনও লোকই ক্ষুব্ধ হয়ে বন্ধুর প্রতি উদাসীন হ'তে চেষ্টা করতো। কিন্তু গৌরদাস ছিলেন স্বতন্ত্র শ্রেণীর মানুষ। তাঁর নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব মধুসূদনের প্রতি সর্বদা স্নেহে ও সহানুভূতিতে পূর্ণ থাকতো। তাই মধুসূদন 'হিন্দু ক্রনিক্‌ল্' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করছেন এবং তা কলকাতার সংবাদপত্র-মহলে যথেষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছে দেখে তিনি আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি সকল ক্ষোভ ও অভিমান ত্যাগ ক'রে বন্ধুকে লিখলেন :

My attention was drawn by the 'Hurkaru' to an extract made from a paper named 'Hindu Chronicle', which, it is said, is edited by you. I was delighted to see that you have betaken yourself to the resources of the 'Fourth Estate' by a very fair way to make yourself rich and respected. I hope you are doing well, and tho' I have not the good fortune to see your paper, I eagerly take up any periodical here that makes mention or extracts of your journal. It was only last Friday that I read in the 'Hurkaru' with profound interest and admiration of your extract in the leader on the 'Dacoits of Bengal'.

এই পত্রে গৌরদাস মধুসূদনকে 'হিন্দু ক্রনিক্‌ল্' পাঠাতে অনুরোধ করেন। মধুসূদন গৌরদাসের পত্র পেয়ে গৌরদাসের কাছে নিয়মিত 'হিন্দু ক্রনিক্‌ল্' পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু গৌরদাসের পত্রের তিনি কোনও উত্তর দিলেন না।

গৌরদাসের প্রতি এই ধরনের হৃদয়হীন, এমন কি অসৌজন্যপূর্ণ, ব্যবহারের কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। তবু নিরভিমান গৌরদাস মধুসূদনের সংবাদ জানতে ব্যাকুল হয়ে থাকেন। 'হিন্দু ক্রনিক্‌ল্'-এর সুনাম হ'লেও, কেবল সুনামের জোরেই কখনও কোনও সংবাদপত্র চলতে পারে না। একটি সংবাদপত্র পরিচালনার জন্যে যে সাংগঠনিক শক্তি ও বৈষয়িক বুদ্ধির প্রয়োজন, মধুসূদনের তা-ও ছিল না। ফলে মধুসূদনকে সম্ভবতঃ আর্থিক লাভের পরিবর্তে আর্থিক ক্ষতিই বরণ করতে হয়েছিল। শীঘ্রই তিনি 'হিন্দু ক্রনিক্‌ল্' পত্রিকার প্রকাশনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব ত্যাগ করেছিলেন। এই ঘটনা ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের পূর্বেই ঘটেছিল। কারণ, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল মাসে গৌরদাস 'হিন্দু ক্রনিক্‌ল্' কাগজে মধুসূদনের নাম সম্পাদকরূপে না থাকায় উদ্বিগ্ন হয়ে মধুসূদনকে লেখেন :

> Altho' nine months have elapsed since I wrote you last, yet up to this moment I have received not a single line from you in acknowledgement of my letter dated the 29th July last. I doubt much but that it had reached you ; since immediately from the next month I began to receive your paper the 'Hindu Chronicle' which you must have ordered to be transmitted to me after the receipt of my letter. I should be very happy to hear your history from you, which it has been my lot to remain in ignorance since

your departure from Calcutta. I read your paper with intense interest and watch your movements through its columns. It is with great sorrow I learnt from a newspaper that you have retired from the Editor's chair, but am ignorant as to the circumstances which led you to this change of a paper remarkably conducted.

মধুসূদন গৌরদাসের এই পত্রেরও সম্ভবত কোনও জবাব দেন নি। কয়েক বছর, যে কোনও কারণেই হ'ক, তিনি কলকাতার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রেখেছিলেন। সম্ভবত চির-অহংকারী ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী মধুসূদনের মনে একটা সুতীব্র ব্যর্থতাবোধ এসেছিল। তাঁর পারিবারিক জীবনেও সম্ভবত শান্তি ছিল না। তাই তিনি নিজেকে যেন সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিয়েছিলেন।

দু বছর আগে মধুসূদনকে জর্জ নর্টন যে সম্মানজনক একটি চাকরি সংগ্রহ ক'রে দেওয়ার আশা দিয়েছিলেন, তা আংশিকরূপে পূর্ণ হ'লো ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে, মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র, তখন তদানীন্তন অ্যাডভোকেট-জেনারেল জর্জ নর্টনের সভাপতিত্বে মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি বোর্ড গঠিত হয়েছিল। স্থির হয়েছিল, এই বোর্ডের পরিচালনাধীনে মাদ্রাজে একটি কেন্দ্রীয় কলেজিয়েট সংস্থা গঠিত হবে—নাম হবে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়। ঐ সংস্থায় দুটি বিভাগ থাকবে—একটি হাইস্কুল বিভাগ, তাতে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য এবং মাতৃভাষাসমূহ শিক্ষা দেওয়া হবে; অন্যটি, কলেজ বিভাগ, তাতে সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হবে। সেই ব্যবস্থা অনুসারে মাদ্রাজ শহরে, প্যান্থিয়ন রোডে, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে হাই স্কুল বিভাগটি খোলা হয়। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন

র‍্যাংলার, ই. বি. পাওয়েল ঐ বিভাগের হেড মাস্টার নিযুক্ত হন। হেড মাস্টার ও সেকেণ্ড মাস্টার ছাড়াও বিদ্যালয়ে চারজন 'টিউটর' বা অধস্তন শিক্ষক ছিলেন। দ্বিতীয় 'টিউটর' ছিলেন এচ. বাউয়ার্স। মিঃ বাউয়ার্স ছুটি নিলে জর্জ নর্টনের সুপারিশে মধুসূদন বাউয়ার্সের স্থলে ঐ হাই স্কুল বিভাগে দ্বিতীয় টিউটরের পদে নিযুক্ত হলেন। পর বৎসর কলেজ বিভাগ খোলা হলে মিঃ বাউয়ার্স তাতে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। ফলে মধুসূদন ঐ দ্বিতীয় টিউটরের পদেই স্থায়িভাবে থেকে যান। পরবর্তী প্রায় যে তিন বছর তিনি মাদ্রাজে ছিলেন, তার কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঐ পদেই নিযুক্ত ছিলেন। এই পদ মাদ্রাজ মেল অরফ্যান অ্যাসাইলামের 'Usher' বা অধস্তন শিক্ষকের পদের তুলনায় যথেষ্ট সম্মানজনক হ'লেও মধুসূদনের মতো মানুষের পক্ষে মোটেই আশানুরূপ ছিল না। 'ক্যাপ্‌টিভ লেডী' রচনার ফলে তাঁর যে সৌভাগ্যের তোরণ উন্মুক্ত ও অবারিত হবে ব'লে তিনি আশা করেছিলেন—নব-প্রতিষ্ঠিত কলেজে হেডমাস্টারশিপ বা ইন্‌স্‌পেক্‌টরশিপ লাভ—তা কিছুই তার ভাগ্যে ঘটে নি। তিনি কলেজ বিভাগে উন্নীত হয়ে একটি অধ্যাপকের পদ-ও পান নি। তবে হাই স্কুল বিভাগও সরকারী সংস্থা ছিল, তাই মাইকেল সরকারী চাকরিতেই নিযুক্ত ছিলেন।

সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত থাকলেও সংবাদপত্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে লেখা একটি পত্র থেকে আমরা জানতে পারি, তিনি ঐ সময়ে মাদ্রাজের একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র 'স্পেক্টেটর্'-এ সহ-সম্পাদকের কাজ করছেন: "I am at present Sub-editor of the 'Spectator', the only daily in this town". কিন্তু তিনি তাঁর শিক্ষকতার কথা ঐ সঙ্গে উল্লেখ করেন নি। বরং তাঁর তৎকালীন শোচনীয় দারিদ্র্যের কথাই উল্লেখ করেছিলেন। তা থেকে মনে হয়, ঐ সময়ে, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে, তিনি শিক্ষকতার কাজটি, যে কারণেই হ'ক,

হারিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষকতা হারাবার জন্যে তাঁর চারিত্রিক ত্রুটি—স্ত্রী বর্তমানে অন্য মহিলার সঙ্গে প্রণয়ই—দায়ী ছিল, মনে হয়।

যাই হ'ক, তারুণ্যের যে স্বপ্ন নিয়ে মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, পিতামাতাকে অশেষ দুঃখ দিয়েছিলেন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ-সংসার ত্যাগ ক'রে মাদ্রাজে প্রবাসী হয়েছিলেন, তা সফল হয় নি। ইংরেজী ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হওয়ার স্বপ্ন আকাশকুসুমে পরিণত হয়েছিল। তাঁর "ক্যাপ্‌টিভ লেডী"-র ব্যর্থতা তাঁকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে হয়েছিল। তিনি নূতন যে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাও নিরুৎসাহ হয়ে ত্যাগ করেছিলেন। তিনি ঐ সময় নাট্যকাব্য রচনাতে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু তাও তিনি অনুৎসাহবশত শেষ করেন নি। এই নাট্যকাব্যটির নাম RIZIA EMPRESS OF INDE. মধুসূদনের উচ্চাশার দিগ্‌বলয় ব্যর্থতা-বোধ, হতাশা ও অনুৎসাহের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁর উচ্চাশা ও দম্ভের যে রঙ্গভূমি ছিল কলকাতা, এবং লীলাসহচর ছিল কলকাতার সহাধ্যায়ী যে বন্ধুরা, সেই কলকাতা ও কলকাতার বন্ধুদের থেকে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলেছিলেন। এই কঠোর বাস্তবতা ও দুঃসহ বর্তমানের মধ্যে এখন সেই গগনচারী স্বপ্ন ও উদ্দাম অতীতকে তিনি সম্পূর্ণরূপে ভুলতে চেয়েছিলেন। কলকাতা ও মাদ্রাজের মধ্যে ব্যবধান এখন আরও দুস্তর ও অনতিক্রম্য হয়ে উঠেছিল।

মধুসূদনের সংসার ও সংসারনির্বাহের দায়িত্ব এখন আরও বেড়েছিল। ইতিমধ্যেই তিনি আরো এক কন্যা ও দুই পুত্রের জনক হয়েছিলেন। 'ক্যাপ্‌টিভ লেডী' প্রকাশের পরে এবং প্রথমা কন্যার জন্মের অব্যবহিত পূর্বে তিনি গৌরদাসকে লিখেছিলেন—"Heigh ho! my stars are brightening!" কিন্তু ধীরে ধীরে সেই সৌভাগ্যের তারাগুলি ম্লান হয়ে গেল। ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ ক'রে ইংরেজ সমাজে বাস করায় পত্নী ও সন্তানগুলিকে নিয়ে মধুসূদন নিশ্চয় বিব্রত হয়ে

পড়েছিলেন। শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা ক'রে তিনি যা উপার্জন করতেন, তা পাশ্চাত্য রীতিতে ভদ্রভাবে জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। এই নিত্য অভাব-অনটনের ফলে ধনী নীলকরের কন্যা, পত্নী রেবেকার সঙ্গে তাঁর কলহ-বিবাদও অবশ্যম্ভাবী ছিল। সুতরাং গৃহ, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে তিনি যে শান্তির নীড় বাঁধবেন আশা করেছিলেন, তা-ও এখন মরু-মরীচিকায় পরিণত হয়েছিল।

অনুমান করা যায়, রেবেকার সঙ্গে মধুসূদনের সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হয়ে উঠেছিল। রেবেকা ছিলেন সামান্য শিক্ষিতা ও ধনীর কন্যা। সুতরাং মধুসূদন যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার পেছনে ধাবিত হচ্ছিলেন, তা উপলব্ধি করবার বা সেজন্য স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণ সহিষ্ণুতা ও সমবেদনার সঙ্গে তাঁকে সাহস ও শক্তি যোগাবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সেজন্য রেবেকাকে দোষ দেওয়া যায় না। গৃহের প্রদীপ হাউইয়ের পেছনে ছুটে আকাশে উঠতে পারছে না ব'লে তাকে দোষী বলবে কে? যাই হ'ক, এখন মধুসূদনের পারিবারিক জীবনেও শান্তি ছিল না, সুখ ছিল না। এই অবস্থায় প্রচলিত সামাজিক আদর্শে চির-অবিশ্বাসী মধুসূদন যে দু দণ্ডের জন্যে হ'লেও অন্যত্র কোথাও স্নেহ ও সহানুভূতির সন্ধান করবেন, স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন, তাতে আশ্চর্য কি? কে জানে, রেবেকাও হয়তো নিজ আত্মীয়-স্বজন, সমাজকে উপেক্ষা ক'রে প্রথম প্রেমের মোহে যা করেছিলেন, সেজন্যে অনুতাপ বোধ করেছিলেন এবং স্ব-সমাজে কোথাও সুখ ও শান্তির সন্ধানে ছিলেন।

তবে মধুসূদন যে এ সময় তাঁর বিবাহিতা পত্নী, তাঁর চারটি সন্তানের জননী, রেবেকার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তিনি তাঁদের কলেজের এক ফরাসী অধ্যাপকের কন্যা এমিলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়াকে গোপনে প্রণয়িণীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। যিনি এক ভ্রান্ত উচ্চাশার মোহে পিতামাতার অগাধ স্নেহ-মমতাকে

উপেক্ষা ক'রে একদিন সমাজ, সংসার, আত্মীয়-স্বজন, সুহৃদ্, সকলের প্রতি মর্মান্তিক শেল নিক্ষেপ করেছিলেন, তিনি যে তাঁর পত্নী ও চারটি শিশু সন্তানের প্রতি নিষ্করুণ আঘাত হানবেন, তাতে বিস্ময়ের কী আছে? মনে রাখা দরকার, মধুসূদনের এই বিবেকহীনতাই তাঁকে অসীম দুঃখ-দুর্দশা এবং তাঁর জীবনের শোচনীয় পরিণতির দিকে দ্রুত ঠেলে দিয়েছিল।

যাই হ'ক, এই সময় নিয়তিই যেন মধুসূদনকে তাঁর পত্নী ও শিশু সন্তানদের অজানা জীবন-সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেকে তীরে তোলার একটি সুবর্ণ সুযোগ জুটিয়ে দিলো।

জাহ্নবী দেবীর মৃত্যুর তিন বছর পরে মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি পরলোক গমন করলেন। মধুসূদন সুদীর্ঘ কয়েক বছর কলকাতার সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন দূরের কথা, তাঁর প্রিয়তম সুহৃদ্ গৌরদাসের সঙ্গেও তিনি কোনো যোগাযোগ রাখেন নি। বার বার পত্র দিয়েও গৌরদাস কোনও জবাব পান নি। মধুসূদন কোথাও ঠিকানা বদল করেছেন, তাই তাঁর চিঠিগুলি মধুসূদনের হাতে পৌঁছচ্ছে না, এই ধরনের একটি ধারণাও গৌরদাসের হয়েছিল। তাই পিতার মৃত্যুসংবাদ মধুসূদনকে কেউ দিতে পারলেন না।

কিন্তু রাজনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো। রাজনারায়ণ অন্য একটি সন্তানের আশায় পর পর তিনবার বিবাহ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি তাঁর দুর্জয় অভিমানী পুত্র মধুকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি। তাই তিনি একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হয়েও তাঁর বিষয়সম্পত্তি কারো নামে উইল ক'রে দিয়ে যান নি—তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, যার সম্পত্তি সে এসে নেবে।

মধুসূদনের অনুপস্থিতিতে রাজনারায়ণের জীবিতা পত্নীরা—

প্রসন্নময়ী ও হরকামিনী—সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী ছিলেন। কিন্তু রাজনারায়ণ দত্তের আত্মীয়রা তাঁদের আশ্রয় দিলেন না, তাঁদের অধিকারও স্বীকার করলেন না। দীর্ঘদিন মধুসূদনের কোনও সংবাদ না থাকায় মধুসূদনের আত্মীয়রা সকলেই ধরে নিলেন মধুসূদন মৃত এবং তাঁরা রাজনারায়ণ দত্তের সম্পত্তি গ্রাস করবার জন্য নিজেদের মধ্যেই বিবাদ-কলহ, মামলা-মোকদ্দমা করতে লাগলেন। এই অবস্থায় গৌরদাস অস্থির হয়ে উঠলেন। মধুসূদন যে জীবিত আছেন, সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু দীর্ঘকাল পত্রালাপ না থাকায় তিনি মধুসূদনকে কোন্ ঠিকানায় পত্র দেবেন, সে পত্র মধুসূদন পাবেন কি না, বুঝতে না পেরে কাল হরণ করতে লাগলেন। এই সময়ে একটি সুযোগ এলো। ঐ বৎসর (১৮৫৫) ডিসেম্বর মাসে রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মাদ্রাজ গেলেন। রেঃ বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টান সমাজে সুপরিচিত ব্যক্তি। সুতরাং মাদ্রাজে মধুসূদন যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন, তাঁকে খুঁজে বার করা তাঁর পক্ষে অসাধ্য হবে না। এই আশায় গৌরদাস ১লা ডিসেম্বর (১৮৫৫) কৃষ্ণমোহনের হাতে মধুসূদনকে একটি চিঠি দিলেন। তিনি ঐ চিঠিতে তাঁর পিতৃবিয়োগের কথা, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর আত্মীয়দের তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি গ্রাসের চেষ্টার কথা, অবিলম্বে মধুসূদনের কলকাতা আসার প্রয়োজনীয়তার কথা—সব লিখলেন।

Calcutta, Kidderpore

My dear Modoo, 1st December, 1855.

It is after the lapse of several years that I write you this letter. I consider it a very serious and culpable dereliction both on your and my part to have allowed such a long, nay long long silence to pass between us. God alone knows how often I thought of you. If my thoughts

were only buried in silence, and found no vent, it was because I knew not where to address you and heard not the slightest tidings of your health and welfare !·········

I am at this moment writing as you will perceive from the date of my letter from a place in which you passed your infancy and boyhood, nay I should say the best part of your youth.······

I regret I have little good news to give you of your rather of your father's family. You must have heard ere long that both your parents are dead, and that your cousins are fighting over the property left intestate by them. Two widows survive your father, but they are very near being deprived of their late husband's effects by your greedy and selfish relations. If you come in time you will yet save it from a ruinous litigation and receive unreserved possession of your own Estate to the utter dismay and disappointment of all illegal claimants. Will you come ?··· ··

Ever yours—Gourdas Bysack.

মধুসূদন কৃষ্ণমোহনের কাছ থেকে গৌরদাসের পত্র পেয়ে অবিলম্বে ২০শে ডিসেম্বর (১৮৫৫) তারিখে লিখলেন :

Your welcome, though unexpected, letter was put into my hands by Mr. Banerjee, yester-

day. It absolutely started me. I knew that my poor mother was no more, but I never thought that I was an orphan in every sense of the word! My dearest Gour, what am I to do? You talk of my property—what has he left behind? Can you give me an idea of the estate? You know how expensive it is to go to Bengal—at least—for a poor devil like myself. But if you encourage me to hope that my father has left sufficient property to warrant my launching out a little cash for the recovery thereof, of course, I am ready to weigh anchor, at once for a voyage to old Calcutta.

Ah! these relatives of mine! Great God! But for you, my noble-hearted friend, I would not have heard a word about my father's death, for months, perhaps for years. O dearest Gour! when and where did he die? I feel distracted. Give me all the particulars.

If I can so manage, I shall leave this by the next steamer (27th), but I am very poor just now, my brother. I have not thrive a so well in the world as I had expected.

Of course, I am aware that my late father had a landed property in Jessore. That I am sure of getting out of the clutches of those biped vultures—what a stupid fellow I am! all vul-

tures are biped!—Well, but you know what I mean. ইত্যাদি

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে চিঠি পাঠাবার পরেই গৌরদাস বেঙ্গল হরকরা পত্রিকায় মাদ্রাজের ‘স্পেক্টেটর’ কাগজ থেকে উদ্ধৃত তুটি প্রবন্ধ দেখলেন। ঐ প্রবন্ধ তুটিতে মধুসূদনের নাম না থাকলেও, গৌরদাসের বুঝতে বিলম্ব হ'লো না যে, প্রবন্ধ তুটি মধুসূদনের লেখা। গৌরদাস তাঁর খিদিরপুরের বন্ধু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রবন্ধ তুটি দেখালে তাঁরাও ঐরকম মত প্রকাশ করলেন। দীর্ঘকাল গৌরদাস মধুসূদনের কোনও পত্র বা সংবাদ না পাওয়ায় তাঁদের মনে মাঝে মাঝে এমনও আশঙ্কা উঁকি দিতো হয়তো মধুসূদন ইহলোকে নেই। কিন্তু ‘হরকরার’ ঐ প্রবন্ধ তুটি দেখে তাঁরা সকলেই মধুসূদন যে জীবিত আছেন, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হলেন।

১লা জানুয়ারি (১৮৫৬) মধুসূদনের পত্র এসে পৌছলো। ৫ই জানুয়ারি গৌরদাস মধুসূদনকে সেই পত্রের দীর্ঘ জবাব দিলেন। তিনি জানালেন, যশোহরে রাজনারায়ণ দত্তের যে ভূসম্পত্তি আছে, তার মূল্য বা পরিমাণ তিনি না জানলেও খিদিরপুরের বসতবাটির মূল্য চার হাজার টাকার কম নয়। সুতরাং মধুসূদনের অর্থব্যয় ক'রে কলকাতা আগমন মোটেই ক্ষতিকর হবে না। উপরন্তু, তিনি জটিল মামলা-মোকদ্দমার হাত থেকে তাঁর সম্পত্তি ও আত্মীয়দের রক্ষা করতে পারবেন এবং তাঁর বিধবা হতভাগিনী বিমাতারাও রক্ষা পাবেন।

মধুসূদন গৌরদাসের পত্র পেয়ে অবিলম্বে কলকাতা আসতে মনঃস্থ করলেন এবং জানুয়ারির শেষভাগে ‘বেন্টিঙ্ক্’ নামে জাহাজে একাকী কলকাতায় এসে পৌছলেন—২রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬।

মাদ্রাজ নগরীর কাছে এই তাঁর শেষ বিদায়। কিন্তু তাঁর ইংরেজ পত্নী রেবেকা ও চারটি শিশু সন্তান? মধুসূদন কঠিন হস্তেই তাঁদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর ফরাসী প্রণয়িনী এমিলিয়া হেন্‌রিয়েটা সোফিয়াকে বিবাহও

করেছিলেন। এবং সম্ভবত শুধু তাঁর কাছে বিদায় নিয়েই মধুসূদন কলকাতা রওনা হয়েছিলেন।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর মধুসূদন গৌরদাসকে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন: "Yes, dearest Gour, I have a fine English wife and four children." পর বৎসর জানুয়ারির শেষ ভাগেই—অর্থাৎ মাস খানেকের মধ্যেই—তিনি কলকাতা রওনা হয়েছিলেন। এই একমাস কালের মধ্যে কিভাবে তাঁর fine English wife-এর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলো এবং ফরাসী প্রণয়িনী হেন্‌রিয়েটার সঙ্গে বিবাহ হ'লো, তা আমাদের বোধগম্য হয় না। কিংবা আমরা কি ধরে নেবো যে, রেবেকার সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য জীবনের অবসান আগেই ঘটেছিল, তিনি নিজের মুখ রক্ষার জন্য বন্ধুকে মিছে কথা—have a fine English wife—লিখেছিলেন। যাই হ'ক, আমরা মধুসূদনের পরবর্তী জীবনে অতি-পতিপ্রাণা পত্নীরূপে এই হেন্‌রিয়েটাকেই দেখি। রেবেকা ও তাঁর গর্ভজাত সন্তানদের কোনও স্মৃতি, কোনও উল্লেখ, কোনও চিহ্নই মধুসূদনের জীবনে আর দেখতে পাই না। পরবর্তী জীবনে হেন্‌রিয়েটার গর্ভজাত পুত্রকন্যাদের জন্য মধুসূদনের স্নেহের আকুলতা দেখেছি। কিন্তু সেই স্নেহের কণামাত্র কি রেবেকার গর্ভজাত সন্তানদের প্রাপ্য ছিল না? মধুসূদনের জীবনে আমরা একাধিক হৃদয়হীনতা ও বিবেকহীনতার কাজ দেখেছি। এই ঘটনাটি সেগুলির অন্যতম।

রেবেকার পিতামহ ও পিতা ধনী ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং রেবেকা ও তাঁর গর্ভজাত সন্তানদের খাদ্য বস্ত্র আশ্রয়ের অভাব হবে না, এই ভেবেই সম্ভবত মধুসূদন কঠোর হ'তে পেরেছিলেন। সেক্ষেত্রেও তিনি যে পিতার কর্তব্য পালন করেন নি, তা নিঃসন্দেহ।

মান্দ্রাজে মধুসূদনের পুত্রকন্যারা জীবিত থাকলেও, এবং রেবেকার মৃত্যু মধুসূদনের মৃত্যুর অনেক পরে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ঘটলেও, তাঁরা মধুসূদনের জীবন-নাট্য থেকে চিরকালের জন্য প্রস্থান করেছিলেন।

৭

কলকাতা প্রত্যাবর্তন

আট বৎসর আগে মধুসূদন যেমন একদিন সকলের অজ্ঞাতে কলকাতা ত্যাগ করেছিলেন, তেমনি সকলের অজ্ঞাতে তিনি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি সকালে কলকাতায় ফিরে এলেন। আট বছর আগে তিনি যেমন কলকাতার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন, এবার কলকাতায় এলেন তিনি মাদ্রাজের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে। মাদ্রাজে ছিন্ন গ্রন্থির মধ্যে অবশিষ্ট রইলেন কেবল তাঁর নববিবাহিতা পত্নী এমিলিয়া হেন্‌রিয়েটা সোফিয়া। তিনিও অবশ্য কিছুদিন বাদে কলকাতায় স্বামীর কাছে চলে এসেছিলেন।

মধুসূদন কলকাতায় এসে প্রথমেই বিশপ্‌স্‌ কলেজে গেলেন এবং রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে উঠলেন। ঐদিনই তিনি বন্ধু গৌরদাসকে ওখানে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে লিখলেন, এবং তিনি যে মাদ্রাজ থেকে কলকাতা এসেছেন, সে কথা অন্য কাউকে এখনই জানাতে নিষেধ করলেন।

বন্ধুর আগমনবার্তা পেয়েই গৌরদাস ছুটলেন বিশপ্‌স্‌ কলেজে; তারপর তাঁকে সাদরে নিয়ে এলেন স্বগৃহে। তার আগেই মধুসূদন খিদিরপুরে নিজের পৈতৃক ভবনে একবার গেলেন। সেই গৃহে তিনি বিষাদভরা শূন্যতাই দেখলেন। জননী জাহ্নবী দেবী নেই, নেই পিতা রাজনারায়ণ। তাঁর দুই বিধবা বিমাতা প্রসন্নময়ী ও হরকামিনী, শূন্যতার প্রতিমূর্তি হয়েই যেন সেখানে বিরাজ করছেন। গৃহও শূন্য-প্রায়। গৃহের তথাকথিত দাবীদাররা ইতিপূর্বেই গৃহের মূল্যবান সাজসজ্জা, আসবাবপত্র, সব সরিয়ে ফেলেছিল। মধুসূদনের মার অলঙ্কারগুলিও পরহস্তগত হয়েছিল। ৫ই জানুয়ারির (১৮৫৬) পত্রে

গৌরদাস মধুসূদনকে জানিয়েছিলেন: মধুসূদনের গৃহের মালিকানা নিয়ে তাঁর দুই আত্মীয় পরস্পর বিবাদ করছে। তাদের দাবীর সত্যতা তদন্ত ক'রে দেখার জন্য আদালত থেকে তাঁর ওপর ভার পড়েছে। দাবীদার আত্মীয়রা তাদের দাবী সম্পর্কে একটি উইলের কথা বলছে, কিন্তু কেউ তাঁকে উইলখানা দেখাতে সাহস করছে না। অর্থাৎ উইলের কথা মিথ্যা। তা ছাড়া, তিনি তো প্রকৃত ব্যাপার জানেন। তাই তিনি আদালতে রিপোর্ট দিয়েছেন, এই গৃহের প্রকৃত উত্তরাধিকারী রাজনারায়ণ বাবুর পুত্র, তিনি মাদ্রাজে আছেন এবং এখানকার ঘটনাবলীর সংবাদ তিনি পাননি। যাই হ'ক, এখন এইসব 'দ্বিপদ শকুনদের' হাত থেকে নিজ উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য মধুসূদনকে কৃতসংকল্প হয়ে লড়াই করতে হবে।

মধুসূদন কলকাতায় ফিরে আসায় গৌরদাস অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। মধুসূদনকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনার আগ্রহ যে তাঁর কতোখানি ছিল, তা বোঝা যায়, ৫ই জানুয়ারি (১৮৫৬) মধুসূদনকে লেখা তাঁর পত্র থেকে। মধুসূদন মাদ্রাজে শিক্ষকতা করছেন জেনে তিনি বন্ধুকে লিখেছিলেন, বাংলাদেশেও শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার হচ্ছে।' ফলে মধুসূদন কলকাতায় এলে তাঁর পক্ষে কলকাতায় শিক্ষকতা লাভ কঠিন হবে না। মধুসূদন Spectator কাগজে সহসম্পাদকের কাজ করছেন জেনে তিনি লিখেছিলেন, মধুসূদন যদি সাংবাদিকতাই করতে চান, তবে গৌরদাস নিজের টাকা দিয়ে সংবাদপত্র প্রকাশ করবেন, এবং মধুসূদন হবেন তার সম্পাদক। সুতরাং মধুসূদন যখন সত্যই কলকাতায় এলেন, তখন গৌরদাসের যে আনন্দের সীমা ছিল না, একথা বলাই বাহুল্য। তিনি মধুসূদনের আপ্যায়নের জন্য নিজ গৃহে একদিন সান্ধ্য ভোজের আয়োজন করলেন। এই ভোজে তিনি অনেক বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধবকে আমন্ত্রণ ক'রে আনলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হিন্দু কলেজের বিশিষ্ট দুই প্রাক্তন ছাত্র—দিগম্বর মিত্র (পরে রাজা) ও তাঁর ভাই কিশোরীচাঁদ মিত্র।

মধুসূদন কয়েকদিন কলকাতায় থেকেই জানতে পারলেন, তাঁর পিতার খিদিরপুরের বাসভবন এবং যশোহরের ভূ-সম্পত্তির মূল্য যথেষ্ট। এগুলির তিনিই একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু মধুসূদনের আগমনেই এসব সম্পত্তির দাবীদাররা সহজে পশ্চাদ্‌পদ হওয়ার পাত্র ছিলেন না। মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় হিন্দু পিতার সম্পত্তিতে তাঁর অধিকার আছে কিনা এইসব জটিল প্রশ্ন তাঁরা উত্থাপন ক'রে তাঁরা সম্পত্তি গ্রাসের চেষ্টা করতে লাগলেন। সুতরাং পৈতৃক সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে হস্তগত হওয়া সময়সাপেক্ষ ছিল। মধুসূদন তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার কতকগুলি পরধনলোলুপ আত্মীয়ের হাতে ছেড়ে দেওয়ারও পাত্র ছিলেন না। এখন কলকাতায় তাঁর দীর্ঘদিন থাকা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তি হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত এখানে তাঁর জীবিকার কি ব্যবস্থা হবে? গৌরদাস ও মধুসূদনের বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা সকলেই এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তাঁরা অবিলম্বে মধুসূদনের জন্য একটি চাকরির সন্ধান করতে লাগলেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

> কিছুদিন পরে মধু আবার দেশে ফিরিয়া আইসে। ঐ সময়ে নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হওয়ায়, ঐ পদে উপযুক্ত লোক বাছিয়া লইবার জন্য, একটি প্রতিযোগী পরীক্ষা গৃহীত হয়। মধু ও আমি উভয়েই ঐ পরীক্ষা দিই এবং উক্ত পদ আমারই হয়। কিন্তু এখানে একটি কথা বলি, পরীক্ষায় ভাল হইলেই যে প্রকৃত গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নহে।

ভূদেববাবুর এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, মধুসূদন ঐ সময় এখানে শিক্ষকতা করবার জন্যেও ইচ্ছুক ছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি মাদ্রাজে শিক্ষকতা করেছিলেন, তাই শিক্ষকতা-বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা-ও ছিল। শিক্ষকতায় তিনি অভ্যস্তও ছিলেন। কিন্তু মধুসূদন এখানে শিক্ষকতার সুযোগ পেলেন না। তিনি দীর্ঘকাল বাংলাদেশের বাইরে

থাকায় বাংলা ভাষায় কথা বলা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। কথাবার্তা ও লেখালেখি সবই ইংরেজীতে করতেন। বাংলা ভাষায় ভালোভাবে কথা বলতে না পারলে বাঙ্গালী ছাত্রদের পড়াতে অসুবিধা হওয়ার কথা। তাই বাংলাদেশে শিক্ষকতা পাওয়া তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না।

ভূদেববাবু আরও লিখেছেন :

> নর্ম্যাল স্কুলের উক্ত পরীক্ষা দিবার সময় মধুর বাঙ্গালাভাষায় তাদৃশ দখল হয় নাই। তখনও সে 'পৃথিবী' লিখিতে 'প্রথিবী' লিখিত ; কিন্তু সেই মধু কিছু কাল পরেই, আমার নর্ম্যাল স্কুলে থাকার সময়েই, মেঘনাদবধ কাব্য প্রণয়ন করে এবং মধুর প্রণীত সেই মেঘনাদবধ কাব্য অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়া আমিই নর্ম্যাল স্কুলে আমার ছাত্রদিগকে পড়াইয়াছি।

কিন্তু মধুসূদন বাংলাভাষা :একেবারে জানতেন না, একথা ঠিক নয়। তিনি মাদ্রাজে থাকার সময়েও কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের রচনা পড়তেন। ঐ দুই কবির রচনা তৎকালীন বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ছিল। সুতরাং 'পৃথিবী' বানান মধুসূদনের না জানার কথা নয়। তাছাড়া, তিনি বিশপ্‌স্ কলেজে ও মাদ্রাজে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করতেন। তা-ও 'পৃথিবী' বানান জানার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। নর্ম্যাল স্কুলে তিনি যে 'পৃথিবী'-র স্থলে 'প্রথিবী' লিখেছিলেন, তার কারণ ছিল তাঁর বাংলা ভাষায় লিপিকুশলতার অভাব। তিনি সুদীর্ঘকাল বাংলা ভাষায় এক অক্ষরও লেখেন নি, সুতরাং বাংলা লিখতে গিয়ে তাঁর লেখায় ভুল হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। মধুসূদন যখন বাংলা সাহিত্যের মহাকবি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ব'লে পরিচিত হয়েছিলেন, তখনও তিনি অপরকে দিয়ে লেখাতেন ও কপি প্রস্তুত করাতেন।

যাই হ'ক, শিক্ষকতা যখন জুটলো না, তখন মধুসূদনকে অন্য চাকরির জন্য উমেদার হ'তে হ'লো। কারণ, চাকরি তাঁর চাই-ই, এবং অবিলম্বে চাই।

কিশোরীচাঁদ মিত্র ঐ সময়ে কলিকাতার অধস্তন পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কিশোরীচাঁদ ও তাঁর দাদা দিগম্বর মিত্র দুজনেই ছিলেন হিন্দু কলেজের খ্যাতনামা ছাত্র। তাঁরা হিন্দু কলেজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্ররূপে মধুসূদনকে পূর্ব থেকেই জানতেন এবং তাঁর কর্মক্ষমতা সম্পর্কে তাঁদের কারো সংশয় ছিল না। কিশোরীচাঁদ ও দিগম্বর, দুজনেই মধুসূদনকে অনুজপ্রতিম মনে করতেন। তাছাড়া, কিশোরীচাঁদের জ্যেঠশ্বশুর রামধন ঘোষ (কলকাতার তৎকালীন ক্যালেক্টর) খিদিরপুরে মধুসূদনের প্রতিবেশী ছিলেন এবং দত্ত ও ঘোষ পরিবারের মধ্যে খুবই হৃদ্যতা ছিল। কিশোরীচাঁদের পত্নী শৈশব থেকেই মধুসূদনকে দাদা বলতেন। সেজন্যে কিশোরীচাঁদ মধুসূদনকে বিশেষ স্নেহের চক্ষেই দেখতেন। তাই তিনি মধুসূদনকে তাঁর বৈষয়িক মামলা-মোকদ্দমায় সাহায্য ক'রেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি তাঁর আদালতে মধুসূদনকে হেড ক্লার্কের চাকরি ক'রে দিলেন। চাকরিটি পাওয়ার সুযোগও উপস্থিত হয়েছিল। দ্বারকানাথ মিত্র ঐ পদে চাকরি করতেন। তিনি ঐ পদ ত্যাগ করায় মধুসূদন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। ঐ পদের মাসিক বেতন ছিল ১২০ টাকা। ঐ পদ সম্মানজনকও ছিল এবং ঐ পদ থেকে উপযুক্ততা থাকলে আশানুরূপ উন্নতির আশাও ছিল। যে দ্বারকানাথ মিত্র ঐ পদ ত্যাগ করায় মধুসূদন চাকরি পেয়েছিলেন, সেই দ্বারকানাথ হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন।

ঐ সময়ে মধুসূদন কলকাতায় একাকাই ছিলেন। তাই পৃথক বাসা ক'রে ঝামেলা পোহাবার হাত থেকে কিশোরীচাঁদই তাঁকে মুক্তি দিলেন। তিনি মধুসূদনকে তাঁর এক নম্বর দমদম রোডের বাগানবাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং নিজের কাছেই কিছুদিন রাখলেন। কিশোরীচাঁদ নিজেও ছিলেন সাহিত্যানুরাগী। তাঁর বাগানবাড়িতে যে সুন্দর দীঘিটি ছিল, তাঁর বাঁধাঘাটের সুরম্য মণ্ডপে তৎকালীন বাংলাদেশের বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীর আগমন হ'তো।

সেদিক থেকেও কিশোরীচাঁদের বাড়িতে আতিথ্যটি মধুসূদনের মনের মতোই হয়েছিল। তিনি গম্ভীর আলাপ-আলোচনায় যেমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তেমনি হাস্য-পরিহাস ও রসালাপেও ছিলেন সুনিপুণ। তাই এই বাগানবাড়িতে মধুসূদনের আগমন ও অবস্থান নিঃসন্দেহে সাহিত্যামোদী বন্ধুদের আড্ডাকে নূতন প্রাণে ও রসে সিঞ্চিত ও সঞ্জীবিত ক'রে তুললো।

এই বাগানবাড়িতে যাঁরা সান্ধ্য মজলিসে ও নৈশ ভোজে সমবেত হতেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন কৃতবিদ্য, আধুনিক চিন্তার সঙ্গে পরিচিত এবং প্রগতিশীল। ধর্ম ও বর্ণের বাছবিচার তাঁদের ছিল না। তাঁরা সকলেই এক টেবিলে পানাহার, হাস্য-পরিহাস করতেন। মধুসূদন খ্রীষ্টান ছিলেন, তাই সাধারণত হিন্দুপরিবারে তাঁর স্পর্শকাতর মন যতোটা সঙ্কুচিত থাকার কথা, তা এখানে ছিল না। মাদ্রাজে তাঁকে এদেশীয় ও বিদেশীয় খ্রীষ্টান সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আটক থাকতে হয়েছিল। মধুসূদন ইউরোপীয় ভাষায়, পোশাক-পরিচ্ছদে, চালচলনে আদব-কায়দায় যতোই রপ্ত থাকুন না কেন, আশৈশব যে সমাজ-সংস্কারের মধ্যে তিনি লালিত হয়েছিলেন, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনো সহজ ও সাবলীল হ'তে পারেননি। সব কিছুর মধ্যেই একটা কৃত্রিমতা ছিল। তাই কলকাতায় এখন স্ববন্ধুসমাজে সাদরে বৃত হয়ে তিনি এক নূতন প্রাণের প্রফুল্লতা অনুভব করছিলেন। নূতন উদ্দীপনায়, নূতন প্রাণশক্তিতে, নূতন আশায় তিনি যেন হয়ে উঠেছিলেন চঞ্চল। তাঁর মন এখন মুক্ত বিহঙ্গের মতো পক্ষ বিস্তার করেছিল। মাদ্রাজ থেকে গৌরদাসকে লেখা শেষের চিঠিগুলিতে মধুসূদনের যে হতাশা, বিড়ম্বনা, ব্যর্থতাবোধ ও পরাজয়ের স্বীকৃতি ফুটে উঠেছিল, তার বিন্দুমাত্র আর অবশিষ্ট ছিল না।

মধুসূদন কয়েকমাস কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাগানবাড়িতে ছিলেন। ঐ সময়ে তাঁর মনের অবস্থা কেমন প্রফুল্ল ছিল, কিশোরীচাঁদের দিন-পঞ্জীতে উদ্ধৃত মধুসূদনের রচিত একটি ইংরেজী গান থেকে তার আভাস পাওয়া যায়। কিশোরীচাঁদ দিনপঞ্জীতে লিখেছেন :

20th July, 1856—Mr. M. S. Dutta gave me the following song :—

When I was a young and gay recruit
Just landed at Madras :
I thought to lead a sober life
With a superfine black-shining lass.
I roved about from place to place
Until I found my Mathonia.
Oh ! What a charming girl she was
With her Thana-na-nia.

এই গানটি খুবই হালকা সুরে রচিত। মাদ্রাজের দিনগুলিকে মধুসূদন এখন পরিহাসের সঙ্গে উপেক্ষা করবার মতো শক্তি ফিরে পেয়েছিলেন। মধুসূদনের এই নবজীবন ও নবশক্তি লাভ বাংলা সাহিত্যের জন্যে একান্ত প্রয়োজন ছিল।

মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজে ও বিশপ্‌স্‌ কলেজে পড়তেন, তখন বাংলা সাহিত্যের যে অবস্থা ছিল, তিনি যখন মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন, তখন কিন্তু সে অবস্থা ছিল না। বাংলা সাহিত্যকে তার মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে চারিদিকে জাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। মধুসূদন যখন বিশপ্‌স্‌ কলেজে পড়তেন, তখন তিনি বাংলা ভাষাকে কি চক্ষে দেখতেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একটি চিঠিতে তা লিখেছেন : "But he (Madhu Soodan) never wrote anything at that time in Bengali which he affected to hold in utter contempt as a 'patois'."

বাংলা ভাষার উচ্চ ও জটিল ভাবসমূহ প্রকাশের শক্তি যে বাংলা ভাষার আছে, তা মধুসূদনের জন্মের আগেই রামমোহন বাংলাভাষায় বেদান্ত অনুবাদ ক'রে এবং ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ক নানা চিন্তাগর্ভ

ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা ক'রে প্রমাণ ক'রে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ঘৃণার চক্ষেই দেখতেন। বিশেষ ক'রে মেকলে সাহেব যখন ভারতীয় ভাষা-গুলিকে একেবারে নস্যাৎ ক'রে দিলেন, তখন আর কথাই রইলো না। কিন্তু ইংরেজদের মধ্যে সকলেই মেকলে ছিলেন না। বীটন (বেথুন) সাহেবের মতো ইংরেজরাও এসেছিলেন এদেশে। মেকলে গভর্নর-জেনারেলের আইন সচিব এবং শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি ছিলেন। বীটনও ছিলেন পরে ঐ পদে অধিষ্ঠিত। তিনি কিন্তু বাংলা ভাষার স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মনে বাংলা ভাষা সম্পর্কে ঘৃণার সঞ্চার করতেন না মেকলের মতো। বরং তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বলতেন, বাঙ্গালী জাতির প্রকৃত শিক্ষা এবং মানসিক বিকাশ বাংলা ভাষার উন্নতির দ্বারাই সম্ভব হ'তে পারে। বাঙ্গালী-জাতিকে এ বিষয়ে পদে পদে তিনি সচেতন ক'রে দিলেন। তিনি সভা-সমিতিতে যেখানেই যেতেন, যেখানেই শিক্ষিত বাঙ্গালীদের সমাগম হ'তো, সেখানেই তিনি বাংলা ভাষার প্রতি সকলকে অনুরাগী এবং বাংলা ভাষার উন্নতির জন্যে সচেষ্ট হ'তে বলতেন।

কৃষ্ণনগর কলেজের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষা পরিষদের সভাপতিরূপে বীটন সাহেব যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন, তা এখানে উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে :

> It is impossible that the English language can ever become familiar to the millions of inhabitants of Bengal; but, if you do your duty, the English language will become to Bengal, what, long ago, Greek and Latin were to England; and the ideas which you gain through English learning will, by your help, gradually

be diffused by a vernacular literature through the masses of your countrymen. The language of Bengal is now as rude and uncultivated as that of England was five hundred years ago. It is your taste and your learning by which it is to be cultivated and adorned. This is the language which I have constantly held to those young men in Calcutta who have brought for my opinion, with intelligible pride, their English compositions in prose and verse. I have told them, while awarding the praise that I have thought due to many of these productions, that if they would follow my advice, they would not seek for distinction by such channels: but, if their talents and disposition led them to authorship, they would attain a more lasting reputation, either by original compositions in their own language, or by transfusing into it the masterpieces of English literature. There is great glory in store for those who will be the first to achieve success in this path.

বীটন সাহেব মধুসূদনকেও এই উপদেশ দিয়েছিলেন। উপরে উদ্ধৃত অংশের শেষ লাইনটি মধুসূদনের ক্ষেত্রে দৈববাণীর মতো কার্যকর হয়েছিল, তা আমরা মধুসূদনের পরবর্তী সাহিত্যজীবন থেকে বুঝতে পারবো। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে বাঙ্গালীর মনে যে স্বাজাত্য-বোধের সূচনা হয়েছিল, তা-ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পাশ্চাত্য আদর্শে সঞ্জীবিত করবার

প্রেরণা ও উৎসাহের সঞ্চারক করেছিল। এ বিষয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পরোক্ষভাবে সহায় হয়েছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এদেশে সমাগত ইংরেজ রাজকর্মচারীদের এদেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু এদেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে উপযুক্ত পুস্তকের অভাব ছিল। তাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উৎসাহ ও আনুকূল্য ছিল বাংলা ভাষায় নূতন নূতন পুস্তক রচনা ও প্রকাশের বিষয়ে। বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই ভাবেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি তাঁর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশ ক'রে বাঙ্গালী পাঠক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। রামমোহন বাংলা ভাষাকে তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে সারা জীবন সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ ক'রে সেই প্রচেষ্টাকে অনেকদূর অগ্রসর ক'রে দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনী প্রমাণ ক'রে দিয়েছিল, কি সরস কাহিনীর বর্ণনায়, কি বৈজ্ঞানিক আলোচনায় বাংলা ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অসীম। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বিবিধার্থ-সংগ্রহ"-ও এবিষয়ে অগ্রণী ছিল। মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। তাঁরা বাংলা ভাষায় ভালোভাবে কথা বলতে পারেন না, বাংলা ভাষা লিখতে পারেন না—একথা জানাতে পারলেই যেন গৌরববোধ করতেন। কিন্তু এখন তাঁদের সে মনোভাবে সম্পূর্ণ পরিবর্তন এসেছিল। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বহু মনীষীই, যেমন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সকলেই বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন।

ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সংস্থায় বা সভা-সমিতিতে ইংরেজী ভাষার ব্যবহারকে অবশ্যকর্তব্য এবং না করাকে

অমর্যাদাকর মনে করতেন। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরাই ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিসভার আয়োজন করেছিলেন। এই সভাতেও ইংরেজীতে কার্যনির্বাহ হ'তো, বক্তৃতাদি ইংরেজীতেই দেওয়া হ'তো। এই সভার তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠানে কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রচলিত প্রথার মূলে কুঠরাঘাত করলেন—তিনি বাংলা ভাষাতেই বক্তৃতা দিলেন। তাঁর এই বক্তৃতা এতোই মনোজ্ঞ হয়েছিল যে, তখনকার 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' কাগজের সম্পাদক ও ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষিত কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেছিলেন :

The discourse we have just heard is very clever and interesting, and it is not less so, because of its being in Bengali. I knew···there is a large number of our educated friends who can relish nothing that is Bengali, their taste being diametrically opposed to all that is written in their own tongue. The most elevated thoughts and the most sublime sentiments, when embodied in it, become flat, stale and unprofitable. But this prejudice is, I am disposed to think, fast wearing out, and the necessity and importance of cultivating the Bengali Language—the language of our country, the language of our infancy, the language in which our earliest ideas and associations are entwined—will ere long be recognised by all.

কিশোরীচাঁদের এই উক্তি তৎকালীন প্রগতিশীল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদেরই মনের কথা ছিল। এখন থেকে ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিসভায় আলোচনা ও বক্তৃতা ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই হ'তো। স্মৃতিসভার বার্ষিক অনুষ্ঠানগুলিতে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,

মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি অনেকেই বাংলা ভাষাতেই বক্তৃতা দিতে থাকেন। কেবল বাংলা ভাষাতেই তাঁরা বক্তৃতা দেননি, কিভাবে বাংলা ভাষায় উন্নতি সাধন করা যায়, তা-ও ছিল তাঁদের অনেকের বক্তৃতার মূল বিষয়। একটি বক্তৃতায় রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "কি উপায়ে বাংলা ভাষার উন্নতি হ'তে পারে" সে বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। অন্য একটি বক্তৃতায় মহাভারতের বিখ্যাত বাংলা অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ "বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন" বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন।

বাংলা ভাষা যে অনাদরে উপেক্ষিত ছিল, সেই অনাদর ও উপেক্ষা আর ছিল না। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু তখনও বাংলা পদ্য অত্যন্ত সংস্কৃতানুযায়ী ছিল। বাংলা ভাষার নিজস্ব রূপ ও রীতি কেমন হওয়া উচিত, সে নিয়ে আলোচনা, তর্কবিতর্ক, এমন কি বিবাদ-বিসংবাদেরও অন্ত ছিল না। তখন প্যারীচাঁদ মিত্র "মাসিকপত্র" নামে একখানি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি "টেকচাঁদ ঠাকুর" ছদ্মনামে চলতি কথ্য ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল" নামে একটি কাহিনী ধারাবাহিকভাবে লিখছিলেন। বাংলা ভাষার উন্নতি সাধন ও বাংলা গদ্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত ছিল না।

বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনটা কিন্তু বাংলা পদ্যের ক্ষেত্রে হয় নি। কারণ, গদ্য সাহিত্য বলতে বাংলা ভাষায় কিছুই ছিল না এবং সেই শূন্যস্থানকে দ্রুত পূর্ণ ক'রে তুলবার অত্যন্ত প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বাংলা ভাষা পদ্যে গদ্যের মতো দীন-হীন ছিল না। তার ভাণ্ডারে ছিল বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, বহু মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, বাউল গান ও লোকগীতির অতুলনীয় সম্পদ্। অবশ্য, বাংলা কাব্যের সেই সুবর্ণ যুগ আর ছিল না। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের যুগ থেকে তাতে ক্ষয়ের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মধুসূদনকে লেখা পত্রে

বীটন সাহেব যে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে লিখেছিলেন, "its best specimens are defiled by grossness and indecency," তা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও তাঁর পরবর্তী ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতির রচনা সম্পর্কেই প্রযোজ্য ছিল। ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" তখন অতিজনপ্রিয় কাব্য ছিল। অথচ এতে অলঙ্কার যমক-অনুপ্রাস যথেষ্ট থাকলেও কুরুচি ও অশ্লীলতার অন্ত ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাও প্রধানত ব্যঙ্গ-রসাত্মক হ'লেও অশ্লীলতা ও কুরুচি দোষে দুষ্ট ছিল। ঐ যুগে ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেম বাংলা কাব্য জগতের সার্বভৌম সম্রাট। ঐ যুগের ইংরেজী শিক্ষিত যেসব তরুণ বাংলা সাহিত্যের সেবায় কবিযশঃপ্রার্থী হয়েছিলেন,—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, দ্বারকানাথ অধিকারী, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়,—সকলেই ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যশিষ্য। দ্বারকানাথের অকালমৃত্যু হওয়ায় তিনি ঈশ্বর গুপ্তের ধারাকে বহন করবার সুযোগ পান নি। বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যের দেশে নিজ সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত থাকায় ঈশ্বর গুপ্তকে অনুসরণের সুযোগ পান নি। দীনবন্ধু নাটক রচনায় আপন প্রতিভার প্রকাশ করেছিলেন, তবে তিনি যে সামান্য কিছু কবিতা রাজকার্য বা নাট্য-রচনার অবকাশে লিখেছিলেন, সেগুলিতে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবই পরিস্ফুট ছিল। রঙ্গলালের রচনায় যথেষ্ট আধুনিকতা থাকলেও তাতে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। অর্থাৎ মাইকেল মধুসূদনের কালবৈশাখীর দুরন্ত ঝড়ের মতো হঠাৎ আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা কাব্য-সাহিত্যে আধুনিক ধারা প্রবর্তনের জন্য বাংলা গদ্যের মতো কোনও প্রচেষ্টা দেখা যায় নি। কারণ, ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের রচনা আধুনিক শিক্ষিত রুচি ও মানসিকতার উপযোগী না হ'লেও বাংলা কবিতা সম্বন্ধে খুব একটা দৈন্যবোধ বাঙ্গালীর ছিল না। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা বাংলা সাহিত্যে স্কট, বায়রন, মূর, মিল্‌টনের দেখা না পেলেও কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাসের রচনাকে defiled by grossness and indecency

বলতে পারতেন না। তাই মাইকেল ইংরেজী ও ইউরোপীয় সাহিত্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকলেও কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের শরণাপন্ন হ'তে দ্বিধাবোধ করেন নি।

এই সময়ে আমরা বাংলা গদ্য সৃষ্টির জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে যে আলোড়ন, উত্তেজনা, উদ্দীপনা দেখি, বাংলা কবিতায় নবযুগ সৃষ্টির জন্য ততখানি দেখি না। ঐ সময়ে বাংলা গদ্যের ভাণ্ডার যেমন শূন্য ছিল, তার চেয়েও শূন্য ছিল বাংলা নাটকের ভাণ্ডার। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী মনীষীরা বাংলা নাট্য সাহিত্যকে গড়ে তোলার জন্যে উদ্যোগী হয়েছিলেন বাংলা গদ্যের মতোই। ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীরা কলেজে শেক্‌স্‌পীয়র প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ নাটকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। হিন্দু কলেজের বিখ্যাত অধ্যক্ষ ক্যাপ্‌টেন রিচার্ডসন তো তাঁর ছাত্রদের অভিনয় দেখার জন্যে কেবল উৎসাহই দিতেন না, থিয়েটারের টিকিট পর্যন্ত সংগ্রহ ক'রে দিতেন। ঐ সময়কার এদেশীয়দের ইংরেজী শিক্ষার অন্যতম প্রধান বিদ্যালয় ওরিয়েন্টাল সেমিনারির অধ্যাপক অবসরপ্রাপ্ত ব্যারিস্টার হার্ম্যান জেফ্‌রয়-ও অত্যন্ত নাট্যানুরাগী ছিলেন। তাঁরা দুজনেই তাঁদের ছাত্রদের মধ্যে নাট্যানুরাগ জাগাতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তখনও শিক্ষিত বাঙ্গালী দর্শকদের জন্যে বাংলা নাটক বা বাংলা রঙ্গমঞ্চ ছিল না। বাংলা রঙ্গমঞ্চ স্থাপনায় যাঁরা পরে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু কলেজ বা ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ছাত্র।

ঐ সময়ে ইংরেজ দর্শকদের জন্যে কলকাতায় একাধিক ইংরেজী রঙ্গালয় ছিল। ঐগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল সাঁ সোচি (Sans Soci) থিয়েটার। ঐ নাট্যশালায় তখনকার দিনের অনেক বিখ্যাত ইংরেজ, যেমন সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস হেম্যান উইলসন, 'ইংলিশম্যান' কাগজের সম্পাদক স্টক্‌লার, বোর্ডের জুনিয়র সেক্রেটারি পার্কার, বোর্ডের সদস্য টেরেন্স, ব্যারিস্টার হিউম প্রভৃতি অভিনয় করতেন। ঐসব নাট্যশালায় তখনকার দিনের ইংরেজ দর্শকদের পাশে কিছু কিছু

বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী দর্শক অভিনয় দেখার সুযোগ পেতেন। ঐসব রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখে সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীরাও নিজ নিজ গৃহে বিপুল অর্থব্যয়ে নাট্যাভিনয়ের চেষ্টা করতেন। কিন্তু অভিনয় করবেন কি? বাংলা নাটক তো ছিল না। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু বহু অর্থব্যয়ে নিজ গৃহে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর নাট্যরূপ অভিনয় করিয়েছিলেন। কিন্তু সে নাট্যশালা ছিল বিচিত্র, আধুনিক নাট্যশালার সঙ্গে তার সাদৃশ্য অতি অল্পই ছিল। তাতে নাটকে দৃশ্যান্তরের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের স্থান পরিবর্তন করতে হ'তো। বিভিন্ন দৃশ্য দেখবার জন্য দর্শকদের বিভিন্ন স্থানে যেতে হ'তো— একই স্থানে দৃশ্যপট পরিবর্তনের দ্বারা বিভিন্ন দৃশ্য দেখানো হ'তো না। প্রত্যেক দৃশ্যের আগে একজন অভিনেতা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য থেকে আবৃত্তি ক'রে কাহিনীর অংশটি ব'লে দিতেন। নবীনবাবুর বাড়ির এই বিদ্যাসুন্দর অভিনয় দু-তিন বছর চলেছিল এবং এই অভিনয়োদ্যমকেই বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যম বলা চলে।

কিন্তু বিদ্যাসুন্দর আধুনিক রুচির দর্শকদের পরিতৃপ্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাই বাংলা নাটকের আশা ত্যাগ ক'রে অনেকে ইংরেজী নাটকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের শুঁড়োর বাগান-বাড়িতে হোরেস হেম্যান উইলসনকৃত "উত্তররামচরিতের" ইংরেজী অনুবাদ এবং ডেভিড হেয়ার অ্যাকাডেমিতে শেকস্‌পীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' ও 'জুলিয়াস সীজর' নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। ওরিয়েন্টাল সেমিনারির প্রাক্তন ছাত্ররা ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ওরিয়েন্টাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা ক'রে শেকস্‌পীয়রের 'ওথেলো', 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' ও 'চতুর্থ হেনরি' নাটক অভিনয় করেন। কিন্তু ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিরাই এইসব নাট্যাভিনয় উপভোগ করতেন এবং এতে এদেশে নাট্যাভিনয় প্রবর্তিত হ'লেও তখনও নাটক বলতে যা বোঝায় তা বাংলা ভাষায় ছিলই না।

মধুসূদন কলকাতায় ফিরে আসার এক বছর পরে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের

মার্চ মাসে ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের দুজন অভিনেতার উদ্যোগে চড়ক-ডাঙার জয়রাম বসাকের বাড়িতে একটি বাংলা নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা হ'লো। নাটকখানির নাম 'কুলীনকুলসর্বস্ব' এবং নাট্যকারের নাম পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন। বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের পর সম্ভবত এটিই ছিল প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয়। এর অল্পকালের মধ্যে কলকাতার প্রসিদ্ধ ধনী আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) বাড়িতে 'শকুন্তলা' এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়িতে 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয় হ'লো। তখনও উপযুক্ত বাংলা নাটক না পাওয়ায় বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদকে অবলম্বন ক'রেই বাংলা নাট্যাভিনয়গুলি চলছিল। বাংলা নাটকের যখন এইরকম হীন অবস্থা, তখনই মধুসূদন কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন এবং তাঁর উপরই আধুনিক কাব্যের মতোই আধুনিক নাট্যসাহিত্যেরও দ্বারোদ্‌ঘাটনের গুরু দায়িত্ব পড়েছিল। যাই হ'ক, মধুসূদন যখন কলকাতায় ফিরেছিলেন, তখন বাংলা নাটকের শূন্যস্থান পূরণের উদ্যোগ-পর্ব চলছিল।

মধুসূদন কয়েক মাস পুলিস কোর্টে হেড ক্লার্কের কাজ করবার পর ঐ আদালতের দোভাষীর (Interpreter) পদে উন্নীত হন। আদালতে উপস্থিত সাক্ষী, বাদী, বিবাদী প্রভৃতির উক্তি এবং বিবাদীয় বিষয়গুলি ইংরেজ বিচারককে ঠিকমতো বুঝিয়ে দেওয়াই ছিল দোভাষীর প্রধান কাজ। বহু ভাষায় সুপণ্ডিত মধুসূদনের পক্ষে দ্রুত তর্জমা ক'রে বিচারককে বিষয়গুলি নির্ভুলভাবে বোঝানো খুবই সহজসাধ্য ছিল। এই পদের বেতনও পূর্বপদের চেয়ে ছিল বেশি। এই পদে উন্নীত হয়ে মধুসূদন কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাগান বাড়ি ছেড়ে ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড়ে একটি দোতলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে পৃথক বাসা ক'রে চলে এলেন। ঐ বাড়িটি লালবাজার পুলিস কোর্টের কাছে হওয়ায় মধুসূদনের খুবই সুবিধা হয়েছিল। মধুসূদন অল্পসময়ের মধ্যেই আদালতে যাতায়াত করতে পারতেন। এই বাড়িটি রাস্তার পূর্বদিকে

অবস্থিত ছিল। এটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় স্থান হয়ে আছে। কারণ, মধুসূদনের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ রচনাই এই বাড়িতে রচিত হয়েছিল। ঐ বাড়ি সম্পর্কে গৌরদাস লিখেছেন :

> Modhu was then living in a two-storied house close to the Police Court on the eastern side of the Chitpore Road. It was in this memorable house that he wrote his principal works, Sarmistha, Tilottama and Meghnada. Had Bengal been England the house would have been purchased and maintained by the public for being visited by the admirers of his genius.

প্রকৃতপক্ষে মধুসূদন তাঁর "বীরাঙ্গনা কাব্য" ও "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" ছাড়া অন্য সমস্ত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থই এই বাড়িতেই রচনা করেছিলেন।

এই বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাজ থেকে তাঁর নবপরিণীতা ফরাসী বধূ হেন্‌রিয়েটা-ও এসে পৌঁছান। মধুসূদনের জীবন এখন নব প্রবাহে তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে।

মধুসূদন তাঁর সরকারী কাজে অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দেন। মধুসূদনের পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্ব তাঁর মনিবদের কাছেও যথোচিত সম্মান-শ্রদ্ধা আদায় করে। পুলিস ম্যাজিস্ট্রেটরা সকলেই তাঁর সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন। তাঁরা সাধারণত অধস্তন কর্মচারীদের শুধু পদবী ধরেই ডাকতেন। কিন্তু মধুসূদনের পদবীর আগে সর্বদাই তাঁরা সম্মানজনক Mr. ব্যবহার করতেন। ম্যাজিস্ট্রেট রে (Wray) সাহেব বলতেন, "Data থাকলে আমি ঘণ্টায় শতাধিক মামলা চুকোতে পারি। তিনি যেদিন না থাকেন, সেদিন আমার পক্ষে ছুটো মামলাও নিষ্পত্তি করা কঠিন হয়ে ওঠে।" কিন্তু রে সম্পর্কে মধুসূদন মোটেই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে রে সম্পর্কে

লিখেছিলেন : "The present Magistrate Mr. W.—is such a d—d slow coach that cases which a smart fellow would get through in an hour and half, occupy four or five hours of his time. However, this chap is going away to Small Causes Court, and we are to have Mr. Briefless F."

এই ব্রিফ্‌লেস এফ.—অর্থাৎ মক্কেলহীন ব্যারিস্টার জি. এস. ফেগান সাহেবও মধুসূদনকে খুবই সম্মান-শ্রদ্ধা করতেন। মধুসূদন কেবল দোভাষীর কাজই করতেন না, তিনি ঐ সময়ে ফৌজদারী আইনগুলিও পড়াশুনো ক'রে অধিগত ক'রে নিয়েছিলেন। ফলে ফেগান সাহেব অনেক সময় মধুসূদনকে তাঁর আদালতে সাক্ষীকে জেরা করবার সুযোগও দিতেন। মধুসূদন অনেক সময় বেশ দেরিতেই আদালতে আসতেন। সেজন্য ফেগান সাহেব কখনও বিরক্ত হতেন না, দরকার হ'লে তাঁকে বাড়ি থেকে ডেকে আনতেন।

দোভাষীর কাজে মধুসূদনের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। ইংরেজী ভাষার উপর ছিল তাঁর অসাধারণ অধিকার। এদেশীয় প্রধান প্রধান প্রচলিত ভাষা—বাংলা, ফারসী, হিন্দী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি তিনি ভালোভাবেই জানতেন। দোভাষীর কাজে দক্ষতা সম্পর্কে তাঁর অন্যতম জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ সোম লিখেছেন :

> নরেন্দ্রনাথ সেন, মধুসূদনের এক বার্ষিক স্মৃতিসভায় বলিয়াছিলেন যে, "একবার রবার্টস্ সাহেবের এজলাজে মোকদ্দমা উপলক্ষে এজাহার দিতে দিতে একজন মাড়োয়ারী নিজ মাতৃভাষায় একটি কবিতা আবৃত্তি করিল। মধুসূদনও সঙ্গে সঙ্গে সেই কবিতাটি ইংরাজি কবিতায় অনুবাদ করিয়া সাহেবকে শুনাইয়া দিলেন।
>
> মধুসূদনের সম্বন্ধে আর একটি এইরূপ বিবরণ শুনা যায়। তিনি দ্বিভাষিকের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার সময়ে 'জৈন মানহানির মামলা' উপস্থিত হয়। জনৈক ব্যক্তি জৈন সমাজের নিন্দাবাদপূর্ণ

সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে। তাহাতেই জৈন ধর্মাবলম্বী মাড়োয়ারীমণ্ডলী লেখকের বিরুদ্ধে কলিকাতা পুলিস কোর্টে মানহানির দাবিতে নালিশ করেন। এই উপলক্ষে উভয়পক্ষেই সে সময়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ও ব্যারিস্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিচারকালে মধুসূদন মোকদ্দমার মূলীভূত কবিতাটি মুখে মুখে ইংরাজি কবিতায় অনুবাদ করিয়া বলিতে থাকেন। তাহা দেখিয়া প্রতিপক্ষীয় কৌন্সিলি বলেন যে, 'দ্বিভাষিক যে ইংরাজি কবিতায় আবৃত্তি করিলেন, তাহা কদাচ মূলানুগত হইতে পারে না'। ইহা শুনিয়া মধুসূদন উত্তর দেন যে, 'মোকদ্দমার মূলীভূত পদগুলি সংস্কৃত কবিতাকারে আছে বলিয়াই আমি তাহা ইংরাজি কবিতাকারেই অনূদিত করিয়াছি। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ইহা যথাযথ ও মূলানুগত অনুবাদ। প্রতিপক্ষের ব্যারিস্টারের ক্ষমতা থাকে, তিনি ভ্রম দেখাইয়া দিন।' পরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পর্যবেক্ষণে মধুসূদনের উক্তিই যথার্থ বলিয়া প্রতিপাদিত হইল।

দোভাষীরূপে মধুসূদনের সুনাম এতোই ছিল যে, অনেক সময় তাঁকে সুপ্রীম কোর্টেও ডেকে পাঠানো হ'তো। পুলিস কোর্টে কাজ করবার সময়েই তাঁকে সাহিত্যের মতো আইনও আকর্ষণ করেছিল। এই সময় থেকেই তাঁর মনে বিখ্যাত আইনজীবী হওয়ার স্বপ্ন বাসা বাঁধে, যা একদিন তাঁর জীবনে শোচনীয় পরিণতির কারণ হয়।

পুলিস কোর্টে কাজ করবার সময়ে তিনি সংবাদপত্রেও লিখতেন। তবে সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত থাকায় একাজ তিনি বেনামীতেই করতেন। সাংবাদিকতায় তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। সাংবাদিকতা থেকেও তাঁর কিছু আয় হ'তো। কিন্তু সাংবাদিকতার পথ সব সময় নিরাপদ ছিল না। একবার Citizen নামে একটি কাগজে একটি প্রবন্ধ লেখায় তাঁকে মানহানির দায়ে পড়তে হয়। পত্রিকার সম্পাদক মধুসূদনের নাম প্রকাশ না ক'রে গা-ঢাকা দেন। ফলে মধুসূদন

সে যাত্রা নিষ্কৃতি পান। সেই থেকে সাংবাদিকতার প্রতি তাঁর বিরক্তি ও বিরাগ জন্মে।

এখন তিনি আদালতের কাজ, আইন পড়া এবং জ্ঞাতিদের সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মামলায় প্রধানত ব্যস্ত থাকেন। সেই সঙ্গে নিভৃত নেপথ্যে আর একটি বিষয়েও তিনি ব্যস্ত থাকেন—সেটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন। এই অনুশীলন তাঁর মাদ্রাজ থেকেই শুরু হয়েছিল। কারণ, মাদ্রাজ থেকে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে গৌরদাসকে লেখা তাঁর পত্রে তিনি কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। ঐ সময় থেকেই যে তিনি বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের পুনরনুশীলন শুরু করেছিলেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এর কিছুদিন পরেই, ঐ বৎসর জুলাই মাসে, বীটন সাহেব তাঁকে ইংরেজী ছেড়ে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করতে উপদেশ দেন। এই উপদেশ এবং গৌরদাসের সস্নেহ পরামর্শ মধুসূদন নিশ্চয়ই উপেক্ষা করেন নি। তিনি যখন কয়েক বছর পরে কলকাতা ফিরে এলেন, তখন দেখলেন, ইংরেজী-শিক্ষিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত ও নবরূপে সজ্জিত করবার জন্যে মেতে উঠেছেন। মধুসূদনও সহজেই সেই মাতামাতিতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বহুদিন বাংলাদেশ থেকে দূরে থাকায় তৎকালীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর যে অজ্ঞতা ছিল, তা যে তিনি দূর করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, এবং বন্ধু-বান্ধবদের অজ্ঞাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। এখন তিনি ইংরেজী ভাষায় মহাকবি হওয়ার উচ্চাশা যে ত্যাগ করেছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মহাকবি হওয়ার উচ্চাশা তিনি ত্যাগ করেন নি। এখন বাংলা ভাষায় বায়রন, স্কট, মিল্টন হয়ে দেখা দেওয়ার স্বপ্নই তিনি দেখছিলেন। এর প্রমাণ আমরা পাই, কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাগানবাড়িতে একটি ঘটনা থেকে। নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর "মধু-স্মৃতিতে" ঘটনাটির সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন:

কিশোরীচাঁদের এই উদ্যান-বাটিকা সাহিত্যচর্চার এবং সুহৃৎ-সম্মিলনের প্রীতি-নিকুঞ্জস্বরূপ একটি কেন্দ্র ছিল। এই বিবিধ তরুলতারাজি-সুশোভিত উদ্যান বাটিকায় বাঁধাঘাট-সুশোভিত একটি সরোবর ছিল। এই সুশীতল বাপী-তীরবর্তী রমণীয় মণ্ডপে সায়াহ্নে সুহৃৎমণ্ডলী সমবেত হইয়া, সাহিত্যচর্চা, রহস্যালাপ ও ভাব বিনিময় করিতেন। একদিন এইরূপ এক বৈঠকে স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র, ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের সহিত বাঙ্গালা ভাষা-গঠন সম্বন্ধে মধুসূদনের মহাতর্ক উপস্থিত হয়। প্যারীচাঁদ তখন 'মাসিক পত্র' নামক একখানি সাময়িক পত্রের সম্পাদকরূপে অধিষ্ঠিত; তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল' সেই পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল। সে সময়ে সংস্কৃত রীত্যনুসারে বাংলা ভাষা-লিখনের যুগ প্রচলিত; প্যারীচাঁদ সেই পণ্ডিতী-রীতির পরিবর্তন এবং চলিত ভাষায় পুস্তক-লিখন-প্রণালী প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে, সহজ ভাষাতেই উক্ত পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিতে-ছিলেন। মধুসূদন প্যারীচাঁদকে উক্ত গ্রন্থ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি এ আবার কি লিখিতে বসিয়াছেন?—লোকে ঘরে আটপৌরে যাহা হয় পরিয়া আত্মীয়জন সকাশে বিচরণ করিতে পারে; কিন্তু বাহিরে যাইতে হইলে, সে বেশে যাওয়া চলে না। 'পোশাকী' পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তাই এইখানে। আপনি, দেখিতেছি, 'পোশাকী'র পাট তুলিয়া দিয়া, ঘরে বাহিরে সভা-সমাজে সর্বত্রই এই আটপৌরে চালাইতে চাহেন। ইহাও কি কখন সম্ভব!" ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত এবং অন্যান্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইলেও, মধুসূদন যে বাঙ্গালা ভাষার কোনও ধার ধারেন, এরূপ ধারণা কাহারও ছিল না। তাঁহার মুখে এই শ্লেষোক্তি সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চা মনে করিয়া, উত্তেজিতভাবে প্যারীচাঁদ বলিলেন, "তুমি বাঙ্গালা ভাষার কি বুঝিবে? তবে, জানিয়া রাখ, আমার প্রবর্তিত এই রচনা-পদ্ধতিই বাংলা ভাষায় নির্বিবাদে

প্রচলিত এবং চিরস্থায়ী হইবে।' মধুসূদন তাঁহার স্বভাব-সুলভ হাস্য সহকারে তদুত্তরে বলিলেন, "It is the language of Fishermen, unless you import largely from the Sanskrit. উহা কি আবার একটা ভাষা! দেখিবেন, আমি যে ভাষার সৃষ্টি করিব, তাহাই চিরস্থায়ী হইবে।" এই কথা শুনিয়া এবং উহাকে সম্পূর্ণ রহস্য-বাক্য মনে করিয়া, সমবেত সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন; কেহ কেহ বিদ্রূপচ্ছলে বলিলেন, 'তুমি বাঙ্গালা লিখিবে? আর তাহা চিরস্থায়ী হইবে! সে ত আর একালে নহে, (till the Greek Calends!)'

মধুসূদনের ঐ দম্ভোক্তি নিছক বাক্যাড়ম্বর ছিল না। তিনি নিশ্চয় ঐ সময় বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন এবং তাঁর নিজের ধারণা অনুসারে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ক'রে—তাঁর নবসৃষ্ট বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্যে সংস্কৃত শব্দ-চয়নে ও সংকলনে ব্রতী ছিলেন। তবে বাংলা গদ্যের নূতন সরণি সৃষ্টির কাজ তাঁকে করতে হয় নি; সে কাজের দায়িত্ব পরে পড়েছিল হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র মধুসূদনের উপর নয়—পড়েছিল হুগলী কলেজের কৃতী ছাত্র বঙ্কিমের উপর। অচিরে মধুসূদনের উপর যে কাজের ভার পড়লো, তা ছিল বাংলা সাহিত্যে নাটক ও কাব্যের নব-রূপায়ণ।

৮

নব সাহিত্যের সূচনা

মধুসূদন যখন কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন, তখন কলকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা পাশ্চাত্য ঢঙে নাট্যাভিনয় করবার জন্যে কতখানি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন, তা আগেই বলেছি। আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) বাড়িতে 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় দেখতে কলকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, তাঁর ছোট ভাই রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (পরে স্যার ও মহারাজা)। অভিনয়-শেষে যতীন্দ্রমোহন প্রসঙ্গক্রমে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রকে বললেন, "দেখুন, দু-একদিনের আমোদে এতো টাকা খরচ না ক'রে, একটি স্থায়ী রঙ্গালয় স্থাপন করতে পারলে অনেক বেশী উপকার হতো।" উপস্থিত সকলেই যতীন্দ্রমোহনকে সমর্থন করলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত নাট্যামোদী ছিলেন। তিনি এবং তাঁর অগ্রজ রাজা প্রতাপচন্দ্র দুজনেই স্থায়ী রঙ্গালয় স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। এর কিছুদিন আগে তারা দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগেছিয়াস্থ বাগানটি কিনেছিলেন। সেখানেই তাঁরা এই নাট্যশালা স্থাপনের ব্যবস্থা করলেন। বহু অর্থব্যয়ে রঙ্গশালা নির্মিত হ'লো, প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক সকল কিছু সংগৃহীত হ'লো। এখন সন্ধান হ'তে লাগলো একটি উপযুক্ত বাংলা নাটকের।

কিন্তু আধুনিক দর্শকদের রুচিকর হ'তে পারে, এমন বাংলা নাটক কিছুই ছিল না তখন। তাই তাঁরা সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদের উপরই নির্ভর করলেন। স্থির হ'লো শ্রীহর্ষদেবরচিত

"রত্নাবলী" নাটকের অনুবাদ তাঁরা অভিনয় করবেন। অনুবাদ করবার ভার পড়লো রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর। রামনারায়ণ তখন "কুলীনকুলসর্বস্ব" নামে একখানি বাংলা নাটক লিখে সুনাম করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। তাই "রত্নাবলী" নাটকের বাংলা অনুবাদ তাঁকে দিয়েই করানো হ'লো।

বিপুল অর্থব্যয়ে বেলগেছিয়া রঙ্গমঞ্চে "রত্নাবলী" অভিনয়ের প্রস্তুতি চলতে লাগলো। এই বিঘোষিত অভিনয় দেখবার জন্যে কেবল সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট বাঙ্গালীরাই নয়, অনেক ইংরেজ, পার্শী, ইহুদী, আর্মানী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন। বাংলা নাটক দেখে তাঁদের রস-গ্রহণের যাতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য "রত্নাবলী" নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করিয়ে তার এক এক কপি অবাঙ্গালী দর্শকদের দেওয়ার প্রস্তাব করা হ'লো। কিন্তু এতো অল্প সময়ের মধ্যে এই নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ করবে কে?

গৌরদাস বসাকের সঙ্গে রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের হৃদ্যতা ছিল। তিনি নিজেও এই নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি মধুসূদনের নাম করলেন। মধুসূদনের ইংরেজীতে অসামান্য অধিকারের কথা কারো অজানা ছিল না। তাঁরা সকলেই গৌরদাসের কথামতো মধুসূদনের উপরই "রত্নাবলী" নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করার ভার দিলেন। স্থির হ'লো রত্নাবলীর বাংলা অনুবাদ থেকেই মধুসূদন তাঁর ইংরেজী অনুবাদ করবেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই মধুসূদন রত্নাবলীর কিছু অংশ অনুবাদ ক'রে দেখাবার জন্যে পাঠালেন। সেই সঙ্গে তিনি গৌরদাসকে একটি পত্রে এই অনুবাদ সম্পর্কে লিখলেন:

I do not know the extent of your acquaintance with the Dramatic portion of English Literature; but I flatter myself you will at once see how I have

tried to write in pure Saxon English, the language of the best dramatists, and how I have tried to impart an air of originality to the affair, careless where the ideas are inextricably damnably Bengali.

রত্নাবলীর ইংরেজী অনুবাদের কিছু অংশ দেখে সকলেই সন্তুষ্ট হ'লেন। গৌরদাস মধুসূদনকে লিখে জানালেন:

> I am glad to inform you that the Rajas are very much pleased with your translation. They told me that they did not anticipate such a fine thing. Be quick, you have raised yourself in the estimation of my noble friends.

সত্যই, এই "রত্নাবলী" নাটকের ইংরেজী অনুবাদ-সূত্রেই মধুসূদন রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের মতো সাহিত্যামোদী ও হিতৈষী বন্ধুদের পেলেন—যা মধুসূদনের বাংলা সাহিত্যালোকে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত ও অবারিত ক'রে দিল। মধুসূদনের ইংরেজী অনুবাদ সম্পূর্ণ হ'লে তা রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র নিজ ব্যয়ে ছাপালেন এবং মধুসূদনকে পারিশ্রমিকরূপে পাঁচ শ টাকা দিলেন।

১৮৫৮ সালের ৩১শে জুলাই 'রত্নাবলী' বেলগেছিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হ'লো। প্রথম ও দ্বিতীয় বারের অভিনয়ে কেবল বাঙ্গালী দর্শকরাই উপস্থিত ছিলেন। তৃতীয় ও চতুর্থবারের অভিনয়ে বহু ইংরেজ ও অন্যান্য অবাঙ্গালী দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজ দর্শকদের মধ্যে তখনকার বাংলার ছোট লাট স্যার ফ্রেডরিক হ্যালিডে, তাঁর স্ত্রী, হাইকোর্টের বিচারপতিরা ও বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। 'রত্নাবলী'র অভিনয় ও অনুবাদ সম্পর্কে মধুসূদনের সহাধ্যায়ী বন্ধু এবং বিখ্যাত পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাম চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন:

একে নাট্যশালা সর্বাঙ্গসুন্দর, তাহার উপরে অর্কেস্ট্রা যতোদূর মনোরম হইতে পারে তাহা হইয়াছিল। ইহাতে রঙ্গ-ভূমির সৌন্দর্য ইন্দ্রালয়ের ন্যায় হইয়াছিল, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইতে পারে না। শ্রোতা মাত্রই মোহিত হইয়াছিলেন; এবং আমি স্বাভাবিক অনেক বিষয়ে সিনিক্যাল, আমিও ক্ষণকাল মোহিত হইয়াছিলাম। ঐ সময়ে মধুসূদনের ইংরাজি অনুবাদের এক এক খণ্ড ইংরাজ, আর্মানী ও পার্শী শ্রোতাদিগের হস্তে দেখিয়াছিলাম।

মধুসূদনের রত্নাবলীর ইংরাজি অনুবাদ দেখিয়া ছোট লাট ও তাঁহার সহধর্মিণী অতিশয় প্রশংসা করেন। নাটক অভিনয়ের দুই চারি দিবস পরে রাজার নিকট আমি একথা শুনিয়াছিলাম। কেবল লাটসাহেব নহেন, ইংরাজি সংবাদপত্রসমূহের তাবৎ সম্পাদকেরা রত্নাবলীর অভিনয় সম্বন্ধে যে সকল দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে অনুবাদের বিস্তর প্রশংসা করেন। 'হরকরা' কাগজের সম্পাদক বলেন, 'এতদূর বিশুদ্ধ ইংরাজি রচনা আমরা আর কখনও দেখি নাই। বাঙ্গালীর লেখনী হইতে এরূপ লেখা কখনও যে হয়, আমরা জানিতাম না। কেবল বাঙ্গালী নহে, কলিকাতার মধ্যে অনেক ইংরাজও এরূপ লিখিতে পারিয়াছি বলিয়া, আপনা-আপনি শ্লাঘা প্রকাশ করিলে অহঙ্কৃত বলিয়া দূষিত হইবে না।'

'রত্নাবলী'র অভিনয়ের যখন প্রস্তুতি চলছিল এবং রাজারা এই অভিনয়কে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করছিলেন, তখন মধুসূদন এই ধরনের একটি 'অকিঞ্চিৎকর' নাটকের অভিনয়ের পেছনে এতো অর্থব্যয় করা হচ্ছে ব'লে বন্ধু গৌরদাসের কাছে মন্তব্য করেন। তাতে গৌরদাস বললেন, "ভালো নাটক বাংলা ভাষায় থাকলে আমরা রত্নাবলীর অভিনয় করতাম না।" গৌরদাসের কথা শুনে মধুসূদন বললেন, "বাংলা ভাষায় ভালো নাটক? বেশ, আমিই তা লিখব।"

মধুসূদনের ক্ষমতা সম্পর্কে গৌরদাসের অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি বললেন, "ভালোই তো, চেষ্টা করেই দেখ না।"

এই ঘটনা সম্পর্কে গৌরদাস পরবর্তীকালে তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন:

After his admission to the first rehearsal, and before he had entered upon his task of the English translation of the Ratnavali, Madhu with his partiality for English taste exclaimed to me (aside), "What a pity the Rajas should have spent such a lot of money on such a miserable play. I wish I had known of it before, as I could have given you a piece worthy of your Theatre." I laughed at the idea of his offering to write a Bengali play, and chaffingly asked if it was his wish to see us introduce a wretched Vidya Sundar on our stage. Conscious of the dearth of really good plays in our language, he could not but feel the sting of my remark as home-thrust and simply muttered, "we shall see, we shall see."

The next morning he called on me at the rooms of the Asiatic Society for the loan of a few Vernacular and Sanskrit books, dramas specially, and in the course of a week or two read to me the first few scenes of Sarmishtha which struck me as having the ring of a true metal.…

নগেন্দ্রনাথ সোম লিখেছেন: "এই কথোপকথনের পরেই তিনি

(মধুসূদন) এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে তৎকালে প্রচলিত বাঙ্গালা পুস্তক ও সংস্কৃত নাটক আনাইয়া পাঠ করেন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই শর্মিষ্ঠা নাটকের কিয়দংশ রচনা করিয়া গৌরদাসকে দেখাইলে তিনি বিস্মিত হইলেন।" মধুসূদন ঐ সময়ে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে বাংলা ও সংস্কৃত বই এনে পড়েছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি যে বাংলা নাটক লেখার জন্মেই কেবল ঐ সময় বাংলা ভাষার অনুশীলন সুরু করেন, তা ঠিক নয়। অন্যান্য বহু ভাষার মতোই বাংলা ভাষার অনুশীলন তিনি বহু পূর্ব থেকেই করেছিলেন ; নইলে তিনি দমদম রোডে কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাগান বাড়িতে প্যারীচাঁদ মিত্রের সম্মুখে কখনো দম্ভোক্তি করতেন না। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিক থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত রত্নাবলীর অভিনয়ের প্রস্তুতি চলছিল। ঐ বছর অক্টোবরের মধ্যেই মধুসূদন তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের রচনা শেষ করেছিলেন। মধুসূদন পূর্ব থেকে বাংলা ভাষার অনুশীলন না করলে এত অল্প সময়ের মধ্যে (গৌরদাসের কথামতো, দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই) একটি ভাষাকে আয়ত্ত ক'রে একটি সুন্দর নাটক রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'তো না। নগেন্দ্রনাথ সোম যে লিখেছেন : "১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক বিরচিত, গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তা-ও ঠিক নয়। 'শর্মিষ্ঠা' ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধেই রচিত হয়েছিল, অবশ্য মুদ্রিত ও প্রকাশলাভ করেছিল পর বৎসর। "'শর্মিষ্ঠা' ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়"—যোগীন্দ্রনাথ বসুর এই উক্তিও ঠিক নয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের গোড়াতেই 'শর্মিষ্ঠা' নাটক লেখা হয়ে গিয়েছিল। কারণ, বাংলা ভাষায় তাঁর নূতন নাটক রচনার কথা গৌরদাসকে জানালে রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন, সকলেই ঐ বাংলা নাটকের পাণ্ডুলিপি দেখবার জন্মে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই এক পত্রে যতীন্দ্রমোহন গৌরদাসকে লেখেন :

I am very anxious to have a perusal of your

friend's manuscript drama, for I am pretty sure that he who wields his pen with such elegance and facility in a foreign language, may contribute something to the meagre literature of our country, which cannot but be prized by all.

যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনের এই বাংলা নাটক প'ড়ে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন। তিনি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর তারিখের পত্রে মধুসূদনকে লিখলেন :

I am of opinion that Sarmistha is the best drama we have in our language······it is at once classical, chaste and full of genuine poetry.

'শর্মিষ্ঠা' ছিল ইউরোপীয় নাটকের আঙ্গিকে রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাটক। এই নাটকের অভিনবত্ব স্বীকার করলেও রাজারা তাঁদের সভা-পণ্ডিত ও আলঙ্কারিক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশকে নাটকটি দেখতে দিলেন, বললেন, যে যে জায়গায় নাটকটির দোষ আছে, সেই সেই জায়গায় তিনি যেন দাগ দিয়ে দেন। 'শর্মিষ্ঠা' কিছুটা আধুনিক ইউরোপীয় নাটকের আদর্শে লিখিত ছিল। সংস্কৃত নাটকের বিধান অনুযায়ী লেখা হয়নি। সুতরাং সংস্কৃত আলঙ্কারিক প্রেমচাঁদ তর্ক-বাগীশের কাছে নাটকটি আগাগোড়া ত্রুটিপূর্ণ ছিল। তিনি রাজাদের বললেন, "সংস্কৃত রীতি অনুসারে এই নাটকটি হয়নি। কাটকুট করলে গোটা রচনাটির কিছুই থাকবে না। সুতরাং এর সংশোধন করবার ইচ্ছা আমার নেই। নাটকটি সম্ভবত কোনও ইংরেজী শিক্ষিত নব্য বাবুর রচনা।"

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের এই বিরুদ্ধ সমালোচনাতেও রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন নিরস্ত হলেন না। তাঁরা ইংরেজী নাটকের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। সুতরাং সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী লেখা নয় ব'লেই যে নাটকখানি নাট্যাভিনয়ের অনুপযুক্ত, তা

তাঁরা স্বীকার করলেন না। তবে বাংলা ভাষায় মধুসূদনের পূর্ণ অধিকার থাকা সম্পর্কে তাঁদের কিছুটা সংশয় ছিল। তাই তাঁরা নাটকখানির সংলাপে বাক্যগঠনে যদি ব্যাকরণগত বা বাগ্‌বিধিগত দোষ থাকে, তা সংশোধন করিয়ে নেওয়ার জন্যে মধুসূদনকে নাটকখানি রামনারায়ণ তর্করত্নকে দেখাতে অনুরোধ করলেন। মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা' নাটকখানি রামনারায়ণকে দেখতে দিলে রামনারায়ণ তাতে ভাষার ওপর কেবল খবরদারিই করলেন না, নাটকখানিকে সংস্কৃত রীতি অনুসারে পরিবর্তিত করতে বললেন। মধুসূদন তাতে সম্মত হলেন না। তিনি এই প্রসঙ্গে গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, তাতে বলেন :

I shall either stand or fall by myself. I do not wish Ram Narayan to recast my sentences —most assuredly not. I only requested him to correct grammatical blunders, if any. You know that a man's style is the reflection of his mind, and I am afraid there is but little congeniality between our friend (Ramnarayan) and my poor-self. However, I shall adopt some of his corrections······

I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about the Drama ; but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well-maintained, what care you if there be a foreign air about the thing ? ··· Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose

minds have been more or less imbued with western ideas and modes of thinking ; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit······

In matters literary, old Boy, I am too proud to stand before the world, in borrowed clothes! I may borrow a neck-tie, or even a waist-coat, but not the whole suit······. Don't let thy soul be perturbed, old Cock, for I promise you a play that will astonish the old rascals in the shape of Pandits.

'শর্মিষ্ঠা' রচনার কাজ শেষ হ'লে রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র মধুসূদনকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে 'শর্মিষ্ঠা' নিজেদের ব্যয়ে মুদ্রিত করলেন। তারপর রত্নাবলীর মতোই বিপুল অর্থব্যয় ক'রে মহাসমারোহে শর্মিষ্ঠাকে বেলগেছিয়া নাট্যশালায় মঞ্চস্থ করবার জন্যে প্রস্তুতি সুরু হ'লো। এবারও ইংরেজ ও অন্যান্য অবাঙ্গালী দর্শকদের জন্য তাঁরা 'শর্মিষ্ঠা' নাটককে ইংরেজিতে অনুবাদ করবার কথা ভাবলেন এবং সেই কাজের ভার দিলেন নাট্যকার মধুসূদনকেই। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন নিজে 'শর্মিষ্ঠা'র জন্য কয়েকটি গান লিখে দিলেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'শর্মিষ্ঠা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ব'লে মধুসূদনের জীবনীকাররা বলেছেন। কিন্তু ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি মধুসূদন গৌরদাস বসাককে লিখছেন: "I hope to send you copies, English and Bengali, when ready ··।" অর্থাৎ ঐ সময়ও 'শর্মিষ্ঠা' ও তার ইংরেজী অনুবাদ কোনটিই প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু এর দশদিন বাদেই, ১৯শে জানুয়ারি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের এক কপি উপহার

পেয়ে সানন্দে প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন, দেখা যায়। সুতরাং 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি যে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ইংরেজী অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল আরও কিছুদিন পরে।

'শর্মিষ্ঠা' নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে, মধুসূদন যাঁদের মতামতকে গ্রহণীয় মনে করতেন, তাঁরা সকলেই একবাক্যে সায় দিলেন। রাজনারায়ণ বসু তখন মেদিনীপুর শহরে শিক্ষকতা করতেন। তিনি 'শর্মিষ্ঠা' পড়ে মধুসূদনকে লিখে পাঠালেন :

> None of your works has been unread by me. "Sermistha" is exactly after the pure classical model, is in many places full of sterling poetry, and displays considerable knowledge of human nature ! I shall never forget the sweet resigning spirit of the gentle Sermistha, the tender interview between her and the king, the pathetic meeting between Devajani and her father and the mean tiresome jokes of the clown.

'বিবিধার্থ সংগ্রহের' বিখ্যাত সম্পাদক ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখলেন : "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যে সকল বাঙ্গালা নাটক এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাধারণ জনগণ শর্মিষ্ঠাকে শ্রেষ্ঠ বলিবেন সন্দেহ নাই।"

নাটকের মহড়া পুরোদমে চলতে লাগলো। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর একটি পত্রে মধুসূদনকে লিখলেন :

> However, every care will be taken to keep the sentiments of the author in all its refulgent brightness. I need scarcely tell you that the drama is a complete success, abounding as it does

with ideas and similes that are scarcely to be found in any Bengalee book I have come across.

ঐ সময়ে গৌরদাস বসাক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়ে বালেশ্বরে চলে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধুর এই নাটকের মঞ্চ-সাফল্য এবং সেজন্যে উপযুক্ত প্রস্তুতি সম্পর্কে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে ঐ নাটকের জন্যে নির্বাচিত অভিনেতাদের যে তালিকা দেন, তাতে ঐ সময়কার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও নাট্যামোদী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অনেকেই ছিলেন। যেমন, প্রিয়নাথ দত্ত ও কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলীর মতো শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা তো ছিলেনই, সেই সঙ্গে ছিলেন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রসিকলাল লাহা, ব্রজদুলাল দত্ত, দ্বারকানাথ মল্লিক, রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের শ্যালক যদুনাথ ঘোষ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও। স্ত্রীভূমিকাগুলি পুরুষরাই করতেন। 'রত্নাবলী' নাটকে যিনি সাগরিকার ভূমিকা করেছিলেন, সেই হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় করছিলেন দেবযানীর ভূমিকা এবং শর্মিষ্ঠার ভূমিকার জন্য সম্পূর্ণ একজন নূতন অভিনেতা নেওয়া হয়েছিল। তাঁর নাম কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সম্বন্ধে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছিলেন: He or she, as you might choose to call, is a real acquisition. To a melodious female voice he combines one of the sweetest tones that it has ever been my lot to hear, and to crown all, he is daily showing a capacity for the stage that has not only satisfied the most sceptic but surprised every one of us by his powers, though not yet fully developed, for histrionic representations.

নাটকখানিকে সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে সকলেই প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকেন। আটখানি নতুন দৃশ্যপট অঙ্কিত করানো

হয়। রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষায়—beautiful and magnificent they are without doubt.

এই নাটকের আধুনিকত্ব, অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কারো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু নাটক শ্রেষ্ঠ হ'লেই যে জনপ্রিয় হবে এমন কোনও কথা নেই। তাই 'শর্মিষ্ঠা' কতখানি মঞ্চসফল ও জনপ্রিয় হবে, সে বিষয়ে সকলেরই কৌতূহল ও ঔৎসুক্যের সীমা ছিল না। রাজা ঈশ্বরচন্দ্রও এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি ঐ পত্রে গৌরদাসকে লেখেন :

> No one knows what effect such a thing as the 'Sharmistha' will have on the stage. It is still a matter of doubt whether it will be as popular as Ratnavali. I will give no opinion concerning it unless it has passed the ordeal of public criticism.

ওদিকে বেলগাছিয়া ভিলায় যখন শর্মিষ্ঠার মহড়া পূর্ণোদ্যমে চলছিল, তখন ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডে মধুসূদনের চলছিল শর্মিষ্ঠা নাটকের ইংরেজী অনুবাদ। মধুসূদন শর্মিষ্ঠার প্রথমাংশ ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রে মহারাজ যতীন্দ্রমোহনকে দেখতে দেন। ঐ অনুবাদ সম্পর্কে যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনকে লেখেন :

> I showed the first portion of your English version of Sermistha to my friend, the Chota Raja and he liked it exceedingly ; for my own part I verily believe, that if it is finished in the style in which it is begun, (and I doubt not but it will be so), your present translation will even surpass that of Ratnavali.

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি তারিখে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক উপহার পেয়ে যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনকে লেখেন :

Accept my best thanks for your kind present; it is a gem truly worthy of the talented donor. I will preserve it carefully as an invaluable contribution to the rising literature of our country, and I doubt not but Sermistha will take the first place among the dramas in the vernaculars.

I am glad to know that an English version of "Sermistha" is in the press. From what I have seen of the "Ratnavali" and considering that in the present instance the author is himself the translator, I am sanguine in my expectation.

The actors are doing marvellously well; they have already got by heart the greater portion of the Book, and I fully believe, they will be able to do justice to the conceptions of the Poet.

রাজারা শর্মিষ্ঠার ইংরেজী অনুবাদের জন্যেও মধুসূদনকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেন। মধুসূদন রত্নাবলীর ইংরেজী অনুবাদ, শর্মিষ্ঠা নাটক ও শর্মিষ্ঠা নাটকের ইংরেজী অনুবাদ কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে উপহার দেন। উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও মুদ্রণের ব্যয় ছাড়াও রাজারা মধুসূদনকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছিলেন। শেক্স্‌পীয়র তাঁর নাটকের জন্যে প্রধানতঃ groundling বা মেঠো দর্শকদের অর্থাৎ জনসাধারণের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করলেও ডিউক অব সাদাম্পটন বা ডিউক অব এসেক্সের মতো অভিজাত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন অনুভব করতেন। ডিউক অব সাদাম্পটনের পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে তাঁর কাব্য ও

সনেটগুলি রচিত হ'তো কিনা সন্দেহ। মধুসূদনের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল। শেক্স্‌পীয়রের সময়ে পেশাদারী সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ছিল। কিন্তু মধুসূদনের সময়ে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ব'লে কিছুই ছিল না—যা ছিল তা ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের শখের নাট্যশালা। তাই মধুসূদনের নাট্য রচনা, এমন কি কাব্য রচনা, রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের মতো ব্যক্তিদের বন্ধুত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে কখনই সম্ভব হ'তো না।

মধুসূদন তাঁর শর্মিষ্ঠা নাটকের কাহিনী তাঁর আশৈশব প্রিয় কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকে নিয়েছিলেন। ঐ সময়ে কালীপ্রসন্ন সিংহের সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা অনুবাদের কিয়দংশও প্রকাশিত হয়েছিল। মধুসূদন তারও সাহায্য নিয়ে থাকবেন। মধুসূদন 'রত্নাবলী' ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন এবং তার জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তাঁর শর্মিষ্ঠায় রত্নাবলীর প্রভাবকে তিনি এড়াতে চেষ্টা করেন নি, বরং কাহিনীর গঠনে রত্নাবলীর সাহায্যই নিয়েছিলেন। মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু ঠিকই বলেছেন :

> ...নিজের গ্রন্থের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে, কিয়ৎপরিমাণে, রত্নাবলীকেই আদর্শ নির্বাচন করিতে হইয়াছিল। উভয় গ্রন্থে, সেইজন্য, ভাবগত, এবং কোন কোন স্থলে ভাষাগত সাদৃশ্যও লক্ষিত হইবে। উভয় গ্রন্থেই দুইজন নায়িকা। জ্যেষ্ঠা অভিমানিনী ও কোপনা, কনিষ্ঠা অভিমানশূন্যা ও মুগ্ধস্বভাবা; রূপ-গুণে জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার নিকট পরাভূতা। উভয় গ্রন্থেই কনিষ্ঠা কিছুদিনের জন্য জ্যেষ্ঠার দাসী; কিন্তু পরিণামে কনিষ্ঠারই জয়। উভয় গ্রন্থেই জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে স্বামীর দৃষ্টিপথ হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। রাজার রূপে উভয় গ্রন্থের নায়িকাই সমান মুগ্ধা। যতদিন কনিষ্ঠাকে না দেখিয়াছিলেন, ততদিন উভয় গ্রন্থের নায়কই জ্যেষ্ঠার প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্ত; কিন্তু কনিষ্ঠাকে দেখিবামাত্র উভয়েরই প্রেন শরতের

মেঘের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। উভয় গ্রন্থে এইরূপ আরও অনেক সাদৃশ্য আছে। উভয়ের উপসংহারও একরূপ। কিছুদিন যন্ত্রণা ভোগের পর উভয় গ্রন্থেরই নায়ক-নায়িকাগণ সমভাবে সুখী হইয়াছেন।...

শর্মিষ্ঠা নাটকে রত্নাবলীর ভাবগত ও কাহিনীগত সাদৃশ্য থাকলেও আঙ্গিকের দিক থেকে শর্মিষ্ঠা রত্নাবলী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল এবং বাংলা নাট্য সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করেছিল।

শর্মিষ্ঠার প্রচ্ছদপত্রে মধুসূদন কালিদাসের রঘুবংশ থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে দিয়েছিলেনঃ মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যামুপ-হাস্যতাম্। প্রাচীনপন্থীরা মধুসূদনকে কিছু উপহাস করবার চেষ্টা করলেও প্রশংসার কলরোলে তা কারো শ্রুতিগোচর হয় নি। মধুসূদন তাঁর নাটকের প্রস্তাবনায় যা লিখেছিলেন, তা বাংলা নাট্য সাহিত্যে নবযুগেরই প্রস্তাবনা ছিলঃ

মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়,
যে সময় দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।
শুন গো ভারতভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুমঘোর, হইল, হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কু-নাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু মনঃ ক্ষয়।
মধু বলে, জাগো মাগো, বিভু স্থানে এই মাগো
সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয়-নিচয়।

'শর্মিষ্ঠার' রচনা থেকে মঞ্চস্থ হওয়া পর্যন্ত কালের বিস্তার প্রায় এক বছর ছিল। 'শর্মিষ্ঠা' রচনার পর থেকে মধুসূদন যেন এক নব উন্মাদনায় মেতে উঠেছিলেন, সৃষ্টির জন্যে তাঁর যে প্রতিভা এতোদিন উন্মুখ হয়ে ছিল, তা যেন অকস্মাৎ এক দুর্বার শৈলনির্ঝরিণীর মতো উৎসারিত হয়ে শত ধারায় প্রবাহিত হ'তে সুরু করেছিল। কোনও বাধা তার কাছে বাধা ছিল না, কঠিন প্রস্তর ভেদ ক'রেও সে স্বচ্ছন্দে আপন পথ প্রস্তুত ক'রে নিচ্ছিল।

রত্নাবলীর ইংরেজী অনুবাদের প্রায় সমসময়ে তিনি তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' রচনা করেছিলেন। 'শর্মিষ্ঠা' রচনা শেষ ক'রেই তিনি শর্মিষ্ঠার ইংরেজী অনুবাদ সমাপ্ত করেছিলেন। শর্মিষ্ঠার অনুবাদ শেষ না হ'তেই তিনি সুরু করেছিলেন তাঁর দ্বিতীয় নাটক "পদ্মাবতী"। তিনি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ তারিখে গৌরদাসকে লিখেছিলেন: Now that I have the taste of blood, I am at it again. I am now writing another play. Sometimes ago, I sent a synopsis of the plot to the Rajas, and they appear to be quite taken up with it. The first act is finished. J. M. Tagore has written to me to say that it is "indeed very good". ঐ সময়ে তাঁর সরকারী চাকরিতেও কাজের চাপ ছিল অনেক বেশি। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে তিনি বালেশ্বরে গৌরদাস বসাককে লেখেন:

I owe you an apology for not having replied to your two letters earlier. But you do not know how harassed I am for want of time. Mr. Hume has been absenting himself from office for the last 8 or 9 weeks and Fagan has had to do his work, and so I have been obliged to be in office from 10 till 5 or 5½ o'clock.

I am glad you like Sermistha. I dare say you will also like the English···

You must wait for sometime for the New Play. All that I can tell you is that there are few prettier plot in any Drama that you have read! I invented it one blessed Sunday. Tagore and the Rajas exclaimed "Beautiful". I only hope I have done justice to it. This morning I am going to send Act No. IV to Tagore···

অর্থাৎ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখের আগেই মধুসূদন তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী'র রচনার কাজ প্রায় শেষ ক'রে ফেলেছিলেন। কিন্তু 'পদ্মাবতী' নাটক রচনার কাজ শেষ হওয়ার আগেই, ৮ই মে (১৮৫৯) তারিখে, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র মধুসূদনকে লেখেন :

> I have a world of talk with you. Could you conveniently call one of these days at Pykepara?··· I am thinking of some domestic farces to follow immediately after the first representation of the Sharmistha and before it is repeated, just to show the public that we can act the sublime and ridiculous both at the same time and with the same actors.

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রথম রজনীর অভিনয় এবং পরবর্তী অভিনয়ের মাঝে কিছু হাস্যরসাত্মক নাটক বা প্রহসন মঞ্চস্থ করতে চান। এ সময় কিছু কিছু ব্যঙ্গাত্মক কবিতা ও কাহিনী বাংলা সাহিত্যে রচিত হ'লেও যাকে ইংরেজীতে farce বলে, তেমন কিছু বাংলা সাহিত্যে ছিল না। বাংলা সাহিত্যের এই শূন্যস্থান পূরণের জন্যেও মধুসূদনের ডাক পড়লো, যে মধুসূদনের লেখনী ভাবগম্ভীর রচনার

জন্যেই সুপ্রসিদ্ধ। তিনি স্বল্পকালের মধ্যে "একেই কি বলে সভ্যতা ?" এবং "বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ" নামে দুখানি প্রহসন রচনা ক'রে সকলকে বিস্মিত ক'রে দিলেন।

মধুসূদন কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে যে সমাজে চলাফেরা করতেন, তারই একটি নগ্ন চিত্র ছিল "একেই কি বলে সভ্যতা ?" প্রহসনে। ঐ সময়ে কলকাতার শিক্ষিত সমাজে এমন এক শ্রেণীর তরুণের আবির্ভাব হয়েছিল, যারা আধুনিক সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা ও চরিত্রহীনতার শেষ সোপানে পৌঁছেছিল। তারা দলবদ্ধ হয়ে মদ খেতো, হিন্দুধর্মের নিষিদ্ধ খাদ্য খেতো, এ দেশীয় আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা, সব কিছুর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতো। লোকে এদের "ইয়ং বেঙ্গল" বলতো। এই ইয়ং বেঙ্গলের ভয়ে কলকাতার ভদ্র হিন্দু পল্লীগুলি এক সময় তটস্থ থাকতো। কিছুকাল মধুসূদন নিজে ও তাঁর বহু অন্তরঙ্গ বন্ধুরা এই ইয়ং বেঙ্গলের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। সুতরাং এই শ্রেণী সম্পর্কে, এদের সভ্যতার শূন্যগর্ভ আস্ফালন এবং কদাচার সম্পর্কে, মধুসূদনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। কাহিনীটি এইরূপ :

কলকাতায় কোনও এক ধনী ব্যক্তি ছিলেন ; তিনি ছিলেন ইংরেজীতে অশিক্ষিত এবং পরম বৈষ্ণব ; তাঁর ছেলে নবকুমার ইংরেজী-শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গলের সদস্য। নবকুমার বন্ধুদের সঙ্গে মিলে "জ্ঞান-তরঙ্গিণী" নামে একটি সভা স্থাপন করেছে। সেখানে তারা প্রতি শনিবার মিলিত হয়ে সমাজ-সংস্কার, স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি সম্পর্কে বক্তৃতা দেয়। নবকুমার একদিন বক্তৃতা দিল :

Gentlemen, এই সভার নাম জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভা ; আমরা সকলে এর member. আমরা এখানে meet করে যাতে জ্ঞান জন্মে, তাই করে থাকি, and we are jolly good fellows. Gentlemen, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে superstition-এর শিকল কেটে free হয়েছি। আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করিনে ; জ্ঞানের

বাতির দ্বারা আমাদের অন্ধকার দূর হয়েছে। এখন আমরা প্রার্থনা করি এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে এদেশের social reformation যাতে হয়, তার চেষ্টা কর।

Gentlemen, তোমাদের মেয়েদের educate কর তাদের স্বাধীনতা দাও—জাতিভেদ তফাৎ কর—হয় বিধবাদের বিবাহ দাও—তা' হলে এবং তা হলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি, ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যদেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিবে—নচেৎ নহে। কিন্তু gentlemen, এখন এদেশ আমাদের পক্ষে মস্ত জেলখানা; এই গৃহ কেবল আমাদের liberty hall অর্থাৎ স্বাধীনতা দালান; এখানে যার যে খুশী কর। Gentlemen, in the name of freedom, let us enjoy ourselves.

বক্তৃতাশেষে জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভার সভ্যরা 'Hip Hip Hurrah', 'Be free,' 'Let us enjoy ourselves,' 'জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভা for ever' ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে সভাগৃহ বিদীর্ণ করলেন। তারপর নিজেদের enjoy করবার জন্য হোটেলে গিয়ে গণিকাদের নৃত্য-গীতে এবং নানাবিধ চর্ব্যচূষ্য-লেহ্য-পেয়ে নিজেদের ঠাণ্ডা করলেন। নবকুমার রাত্রিতে মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে বিলিতী কায়দায় ভগিনীকে চুম্বন করলেন, পত্নীকে বারাঙ্গনার মতো সম্বোধন করলেন এবং বাবাকে 'মদ লেয়াও' ইত্যাদি আদেশ ক'রে অচেতন হয়ে পড়লেন। পুত্র অচেতন হয়ে পড়লে মা ভয় পেয়ে স্বামীকে ডেকে আনলেন। বাবা ছেলের প্রকৃত অবস্থা বুঝে বললেন:

কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করবো। এ লক্ষ্মীছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই। চল এখন আমরা যাই। এ বানরটা একটু ঘুমুক।

নবকুমার।—"হিয়র, হিয়র, আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন।"

বলাই বাহুল্য, মধুসূদন ইয়ং বেঙ্গলের আতিশয্য ও অনাচারের কদর্য দিকটিকেই দেখাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা দেখাতে গিয়ে তিনি লোকচক্ষে ইয়ং বেঙ্গলের প্রগতিশীল দিকটাকেও কিছুটা খাটো ক'রে ফেলেছিলেন সন্দেহ নেই। যাই হ'ক, এই প্রহসনে তিনি হাস্যরসাত্মক

রচনা শক্তির যে অসামান্য নিদর্শন দেখিয়েছিলেন, তা অনস্বীকার্য। মধুসূদনকে আমরা আড়ম্বর ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ গুরুগম্ভীর ভাষাতেই লিখতে নিপুণ বলে জানি, কিন্তু এই প্রহসনগুলির ভাষা দেখলে বিষয়োপযোগী সকলপ্রকার ভাষাতেই যে তাঁর পূর্ণ অধিকার ছিল, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। বাংলা সাহিত্যে পরে 'একেই কি বলে সভ্যতার' অনুকরণে অনেক প্রহসন রচিত হয়েছিল। কিন্তু কোনটিই মধুসূদনের রচনার সমকক্ষ হয় নি। পরে দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'সধবার একাদশী' রচনার প্রেরণা এই ক্ষুদ্র প্রহসনখানি থেকেই পেয়েছিলেন।

ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এককালে ইয়ং বেঙ্গলদেরই একজন ছিলেন। এমন কি তিনিও 'একেই কি বলে সভ্যতা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

> ইয়ং বেঙ্গল অভিধেয়—নববাবুদিগের দোষোদ্‌ঘোষণই বর্ত্তমান প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্য ; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে, ইহার প্রমাণার্থে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, ইহাতে যে সকল কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে প্রায় তৎসমুদায়ই আমাদের জানিত কোন কোন বাবুর দ্বারা আচরিত হইয়াছে।

চরিত্র-চিত্রণ ও সংলাপ-রচনায় মধুসূদন কী অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তা নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের একটি বিতর্ক থেকে বেশ বোঝা যায়। মত্ত ও অর্ধ-অচেতন নবকুমারের 'হিয়র, হিয়র, আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন'—এই সংলাপটি সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন, "এ কথাগুলো কি নবকুমারের বাবার সামনে বলা ঠিক হয়েছে ?" প্রতিবাদে দীনবন্ধু বলেছিলেন, "ঐ অবস্থায় ঠিকই প্রযুক্ত হয়েছে। নবর নেশাটা প্রায় কেটে এসেছে, অথচ একেবারে কাটেনি ; কিছু আগে তাদের সভাতে রেজোলুসন, সেকেণ্ড ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল এবং সেগুলি তার চেতনার মধ্যে ছিল। তাই বাবার মুখে বৃন্দাবন যাওয়ার প্রস্তাব শোনামাত্র তার মুখ দিয়ে ঐ

উক্তি বার হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। মাইকেল ব'লেই ও রকম লিখতে পেরেছিলেন।" গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুর ব্যাখ্যা শুনে ভেবে-চিন্তে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি পরে ঐ সংলাপটি সম্পর্কে নাকি প্রায়ই বলতেন, "মাইকেল কি খেয়েই ও কথাটা লিখতে পেরেছিল—Hear ! Hear ! I second the resolution."

'একেই কি বলে সভ্যতা ?' রচনা করেই মধুসূদন তাঁর দ্বিতীয় প্রহসন "বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসনটি লিখেছিলেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে তিনি যেমন শহুরে নবশিক্ষিত তরুণদের কদাচারের চিত্র অঙ্কিত করেছিলেন, তেমনি 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে তিনি অঙ্কিত করলেন গ্রাম্য ভক্ত-বিটেল বৃদ্ধদের কদাচারের কাহিনী। 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' প্রহসনে যেমন তিনি নিজের কৈশোর ও যৌবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন, তেমনি 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনেও তিনি বাল্যকালের সাগরদাঁড়ির গ্রামীণ স্মৃতিকে রূপ দিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত একটি প্রবচন অনুসারেই তিনি তাঁর প্রহসনের নামকরণ করেছিলেন। প্রথমে তিনি এই প্রহসনের নাম দিয়েছিলেন "ভগ্ন শিবমন্দির।" অনেকের মতে, তিনি তাঁর এক নিকট আত্মীয়কে ভক্তপ্রসাদ রূপে কল্পনা করেছিলেন। মানিকগাজী, পাঁচী তেলেনী, প্রভৃতি নামগুলিও তাঁর স্বগ্রামের কোন না কোন পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নাম থেকে তিনি নিয়েছিলেন। যাই হ'ক, 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ছিল পরস্পরের পরিপূরক। এই দুই প্রহসনে মধুসূদন আধুনিক ও প্রাচীন উভয়কেই তীব্র কষাঘাত করেছিলেন। উৎকর্ষের দিক থেকে বিচার করলে, "একেই কি বলে সভ্যতা ?" অবশ্য 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসনের চেয়ে বহু দিক থেকেই ছিল শ্রেষ্ঠতর।

এই প্রহসন দুটিও বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্যে নির্বাচিত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিনয় হয় নি। কারণ সম্বন্ধে

বেলগাছিয়া নাট্যশালার সর্বপ্রধান অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

> ...A few of the "young Bengal" class, getting a scent of the farce "একেই কি বলে সভ্যতা ?" and feeling that the caricature made in it touched them too closely, raised a hue and cry, and choosing for their leader a gentleman of position and affluence who, they knew, had some influence with the Rajas, deputed him to dissuade them from producing the farce on the boards of their Theatre. This gentleman (also a "young Bengal") fought tooth and nail for the success of his mission. The Rajahs would not yield at first, but under great pressure were obliged to give up the farce. Rajah Issur Chandra Sing was so disgusted at this affair that he resolved not only to give up the other farce too, but to have no more Bengali plays acted at the Theatre.

ইয়ং বেঙ্গলদের চাপসৃষ্টির ফলে 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' প্রহসন অভিনীত হ'তে পারে নি। এই ধরনের চাপসৃষ্টির ফলে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র এতোই বিরক্ত হয়েছিলেন যে, তিনি 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের অভিনয়ও তো বাতিল করেছিলেনই, সেই সঙ্গে আর কোনও বাংলা নাটক তাঁদের থিয়েটারে অভিনয় করবেন না ব'লেও ঘোষণা করেছিলেন। রাজাদের এই সিদ্ধান্ত বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে মারাত্মক ছিল। মধুসূদনের এই প্রহসন দুটির মুদ্রণের ব্যয় রাজারাই বহন করেছিলেন এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রহসন

দুটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এই অপ্রত্যাশিত ও অপ্রীতিকর ঘটনার পরে মধুসূদনও আর প্রহসন রচনায় হাত দেননি।

কেউ কেউ বলেছেন, প্রহসন দুটি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এগুলি যে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় প্রকাশিত হয়, তা মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুসূদনকে যে চিঠি লেখেন, তাতে তিনি বলেন:

The Chota Raja saw me this morning and I am glad to tell you he has agreed to pay in advance the printing charges of the two farces and a portion of the amount due from him on account of the English Sermistha.

১৮৫৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর প্রহসন দুটির ব্যয় আগাম দেওয়ার কথা হ'লে তা কখনই ১৮৫৯ সালে ছাপা হ'তে পারে না। ঐ প্রহসন দুটি ১৮৬০ সালের গোড়ার দিকেই প্রকাশিত হয়েছিল।

মধুসূদনের নাটকগুলি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। তবে তিনি মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনখানির খুবই প্রশংসা করেছিলেন। "His farces are however, good. One of them, entitled 'Is this civilization?' is the best in the language. This little work deserves notice independently of its own really great merit."

তিনি আরো বলেন, বাংলা ছাপাখানা থেকে যে গণ্ডায় গণ্ডায় বই বেরুচ্ছে, সেগুলির অধিকাংশই বিদ্যাসাগরের, টেকচাঁদ ঠাকুরের, দীনবন্ধু মিত্রের বা তাঁর নিজের পুস্তকগুলির গতানুগতিক অনুকরণ মাত্র। কিন্তু মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনের অনুকরণে যতো বই লেখা হয়েছে, তার তুলনা নেই। "...but perhaps, no

work has formed the model for so many imitators as 'Is this civilization ?' It is a farce with a purpose, being intended chiefly to ridicule and so expose the vice of drunkeness and the other evils by which it is generally attended. This little work···independently of its being in itself one of the two best farces in the language, gains additional importance from the large number of other books written after its model.···"

মধুসূদন যখন ইউরোপে, তখন ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শোভাবাজার থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি 'একেই কি ব'লে সভ্যতা' প্রহসনটি মঞ্চস্থ করেন।

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁর 'মধুস্মৃতি'তে লিখেছেন যে, "'একেই কি বলে সভ্যতা ?' ও 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনদ্বয় রচনা করিবার অব্যবহিত পরেই, মধুসূদন গ্রীক পুরানের ছায়াবলম্বনে তাঁহার 'পদ্মাবতী' নাটক রচনা করিলেন"—তা ঠিক নয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখের যে পত্রে ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মধুসূদনকে তাঁর প্রহসন অভিনয়ের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে প্রহসন রচনা করতে অনুরোধ করেছেন, সেই পত্রেই তিনি তাঁর দাদার 'পদ্মাবতী' নাটকের তিন-চার অঙ্কের প্রাপ্তির কথা এবং তাঁর নিজের গোটা নাটকটির সংক্ষিপ্তসার কয়েক মাস আগে দেখার কথাও জানাচ্ছেন: "Three or, I believe, four acts of your new drama are with my brother. I have not had the pleasure of seeing them yet, but from the synopsis which was read to me some months ago, I have no doubt that the plot under your able management would be turned to good account. I am thinking of some domestic farces to follow"···

ইত্যাদি। সুতরাং 'পদ্মাবতী' নাটক যে প্রহসন দুটির আগেই রচিত হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহ। তবে মধুসূদন পরে ঐ নাটকের কিছু পরিমার্জন, সংশোধন, এমন কি কিছু পরিবর্তনও হয়তো করতে পারেন।

'শর্মিষ্ঠা' তখনও মঞ্চস্থ হয় নি, তার অভিনয়ের প্রস্তুতি পূর্ণোদ্যমে চলছে, মধুসূদন মিঃ হিউমের অনুপস্থিতির ফলে মিঃ ফেগান অত্যধিক ব্যস্ত থাকায় অফিসে দশটা-পাঁচটা খাটতে বাধ্য হচ্ছেন, এবং তারই ফাঁকে 'পদ্মাবতী' নাটক, 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-র মতো দুটি প্রহসন রচনা করেছেন, এমন সময় মধুসূদন এক সাধারণ বিতর্কের জের টেনে অকস্মাৎ এক অসাধারণ কীর্তির ভিত্তি স্থাপন করলেন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি একদিন পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া ভিলায় মধুসূদন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে মধুসূদন বললেন, "যতোদিন না বাংলাভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ (Blank Verse) প্রবর্তিত হবে, ততদিন বাংলা নাটকের উন্নতির আশা নেই।"

যতীন্দ্রমোহন বললেন, "আমার মনে হয় না যে, বাংলাভাষায় অমিত্রাক্ষর প্রবর্তন সম্ভব হবে।"

মধুসূদন বললেন, "একবার চেষ্টা ক'রে দেখা উচিত।"

যতীন্দ্রমোহন বললেন, "অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ব্যঙ্গ ক'রে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাটা আপনার মনে আছে কি?—

কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি,
ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।"

মধুসূদন বললেন, "বৃদ্ধ ঈশ্বর গুপ্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ লিখতে পারেন নি ব'লে যে, আর কেউ পারবে না, তা যুক্তিপূর্ণ নয়।"

যতীন্দ্রমোহন বললেন, "সকল ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তিত হতে পারে ব'লে আমি মনে করি না। যতোদূর জানি, ফরাসী ভাষাতেও

অমিত্রাক্ষর ছন্দে কোনো কাব্য রচিত হয় নি। নিঃসন্দেহে ফরাসী ভাষা বাংলাভাষার চেয়ে অনেক উন্নত।"

মধুসূদন বললেন, "কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন, সংস্কৃত ভাষা বাংলাভাষার জননী, আর সংস্কৃত কাব্য-কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দেরই প্রাচুর্য।"

যতীন্দ্রমোহন বললেন, "সে কথা ঠিক। তবে বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার দুহিতা হলেও, সবলা জননীর দুর্বলা কন্যা।"

মধুসূদন বললেন, "না, বাংলাভাষা দুর্বলা নয়। যদি আপনাকে আমি শীঘ্রই আপনার ভুল না বোঝাতে পারি, তবে আপনি আমাকে যা ইচ্ছে তা বলবেন। আর যদি আপনাকে দেখাই যে, বাংলাভাষা অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তাহ'লে আপনি—"

যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনের মুখের কথা লুফে নিয়ে বললেন, "তাহ'লে আমি হার মানব এবং আপনার সেই কাব্য ছাপাবার সমস্ত খরচ দেবো।"

মধুসূদন উৎসাহে করতালি দিয়ে উঠলেন, "বেশ। দু-তিন দিনের মধ্যেই আপনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কবিতার কিছু নমুনা পাবেন।"

সত্যই, মধুসূদন কয়েকদিনের মধ্যেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কবিতার নমুনা যতীন্দ্রমোহনের কাছে পাঠালেন—তাঁর "তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্যের" প্রথম সর্গ। যার প্রারম্ভে অপূর্ব সেই ধবলগিরির সৌন্দর্য বর্ণনা—বাংলাভাষায় অভূতপূর্ব অমিত্রাক্ষর ছন্দে:

ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণ দর্শন;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল;
যেন ঊর্ধ্ববাহু সদা, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগিকুলধ্যেয় যোগী! নিকুঞ্জ, কানন,
তরুরাজি, লতাবলী, মুকুল, কুসুম—
অন্যান্য অচল ভালে শোভে যে সকল,

(যেন মরকতময় কনক কিরীট)
না পরে এ গিরি, সবে করি অবহেলা,
বিমুখ পৃথিবীপতি পৃথ্বীসুখে যেন
জিতেন্দ্রিয়! সুনাদিনী বিহঙ্গিনী দল,
সুনাদী বিহঙ্গ, অলি মত্ত মধুলোভে,
কভু নাহি ভ্রমে তথা! মৃগেন্দ্রকেশরী,—
করীশ্বর,—গিরীশ্বর শরীর যাহার,—
শার্দূল, ভল্লুক, বনচর জীব যত—
বনকমলিনী কুরঙ্গিণী সুলোচনা,—
ফণিনী মণিকুন্তলা, বিষাকর ফণী,
না যায় নিকটে তার—বিকট শেখর!
অদূরে ঘোর তিমির গভীর গহ্বরে,
কল-কল করে জল মহাকোলাহলে,
ভোগবতী স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী; ঘন ঘন বহেন পবন,
মহাকোপে লয়রূপে তমোগুণান্বিত,
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্বনাশকারী!
দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, দানবারি,—
দানবী, মানবী, দেবী, কিবা নিশাচরী,
সকলেরি অগম—দুর্গম দুর্গ যেন!—ইত্যাদি

যতীন্দ্রমোহন এই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্যের পাণ্ডুলিপি প'ড়ে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হলেন। তিনি এই পাণ্ডুলিপি তাঁর বন্ধু রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখালেন। সকলেই সমকণ্ঠে মধুসূদনের কৃতিত্ব স্বীকার করলেন। তাঁরা সকলেই মধুসূদনকে এই কাব্য শেষ করবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকার ষষ্ঠ পর্বের ৬৪ ও ৬৫ খণ্ডে, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় (ইংরেজী ১৮৫৯ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে) প্রকাশ

করলেন প্রথম দুই সর্গ। বাংলাভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে উৎকৃষ্ট কাব্য-কবিতা রচনা যে সম্ভব, মধুসূদন তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ ক'রে দেখালেন।

মধুসূদনের নবপ্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে বাঙ্গালী সাহিত্যরসিক মহলে যখন আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, তখন মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক দীর্ঘ প্রস্তুতির পর বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে মহাসমারোহে অভিনীত হলো—১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে। বাংলার ছোট লাট স্যার পিটার গ্রাণ্ট, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা ও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ও উচ্চপদস্থ ইংরেজ সস্ত্রীক এই অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। তাঁদের সকলকেই মধুসূদনকৃত শর্মিষ্ঠার ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হয়েছিল। অনুবাদ এতোই সুন্দর হয়েছিল যে, একজন বিশিষ্ট সামরিক কর্মচারী রাজা ঈশ্বরচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এই ইংরেজী নাটকের বাংলা অনুবাদ কি অভিনীত হ'লো?" রাজা যখন বললেন, "না, এটি বাংলা নাটকের ইংরেজী অনুবাদ।" তখন সামরিক কর্মচারী সবিস্ময়ে বললেন, "অনুবাদ যে এত সুন্দর হয় তা জানতাম না।"

ইউরোপীয় আঙ্গিকে লেখা এই প্রথম বাংলা নাটকটি মঞ্চসফল ও জনপ্রিয় হবে কিনা, সে বিষয়ে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সংশয় ছিল। বিপুল মঞ্চসাফল্য দেখে তাঁর সে সংশয় দূর হ'লো। পুস্তকাকারে যখন 'শর্মিষ্ঠা' প্রকাশিত হয়েছিল, তখন মধুসূদন সকলের কাছেই অকুণ্ঠ ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছিলেন। কিন্তু নাটকের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হয় তার মঞ্চসাফল্যে। শর্মিষ্ঠার মঞ্চসাফল্য দেখে মধুসূদনের আনন্দের সীমা রইলো না। তিনি সুহৃদ্ রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন:

> When Sharmista was acted at Belgachia the impression was simply indescribable. Even the least romantic spectator was charmed by the character of Sharmista and shed tears with her. As for my own feelings, they were "things to

dream of, not to tell". Poor old Ramchandra (রামচন্দ্র মিত্র—ইনি হিন্দু কলেজের প্রবীণ শিক্ষক এবং মধুসূদনের অত্যন্ত গুণগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ী ছিলেন) was half mad and grasped my hand, "Why my dear Modhu, my dear Modhu, this does you great credit indeed! Oh it is beautiful."

'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল এবং বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ছ রাত্রি অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকের মঞ্চসাফল্য সম্পর্কে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ১৮৫৯ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর একটি পত্রে লেখেন:

The representation of the Drama Sermistha has come off gloriously! Night before last was the sixth or the last night of its performances and the Lieut. Governor and several other respectable gentlemen Native and European were present on the occasion. You must have read the very handsome notices in the papers, so I will not write to trouble you with details.

মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে ইউরোপীয় আঙ্গিকের প্রবর্তন করলেও সংস্কৃত নাট্যরীতিকে তিনি ত্যাগ করেন নি বা ত্যাগ করতে চান নি। তিনি সংস্কৃত নাটকের নান্দী ও সূত্রধার পরিত্যাগ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' নাটককে তিনি আধুনিক আঙ্গিকের মধ্যে যতোখানি সম্ভব সংস্কৃত নাটককেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' নাটককে সংস্কৃত নাট্যাদর্শ অনুযায়ী মিলনান্তই করেছিলেন। 'পদ্মাবতী' যে গ্রীক উপাখ্যানের ছায়া অবলম্বনে রচিত হয়েছিল, তা ছিল ঘোরতরভাবে tragic. কিন্তু মধুসূদন তখনও সংস্কৃত নাট্যাদর্শ অনুসরণ করায় 'পদ্মাবতী'কে ট্র্যাজেডির পথে না নিয়ে গিয়ে মিলনান্তক নাটকে পরিণত করেছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর মধুস্মৃতিতে লিখেছেন :

> ইহার (তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গ রচনার) কিছুদিন পূর্বে তিনি (মধুসূদন) সংস্কৃতালোচনায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। এত শীঘ্র যে তিনি সংস্কৃত কাব্য-সিন্ধু মন্থন করিয়া শব্দরত্ন সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই অসামান্য ব্যাপার। পূর্বে এই বেলগাছিয়ার বাগানেই রত্নাবলী নাটকের মহড়ার সময়, গৌরদাসের সহিত নাটক-রচনা সম্বন্ধীয় কথোপকথনের ফলে মধুসূদন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া, সংস্কৃত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

নগেন্দ্রনাথের এই উক্তি ঠিক নয়। মধুসূদন বিশপ্‌স্‌ কলেজে গ্রীক ও লাটিন ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতও শিখেছিলেন। ঐ সময়ে তিনি সংস্কৃত শিখেছিলেন পণ্ডিত কুমার স্বামীর কাছে। মাদ্রাজেও তিনি কিছুদিন সংস্কৃত ভাষার চর্চা করেছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগস্ট তারিখে গৌরদাসকে মাদ্রাজ থেকে লেখা তাঁর পত্রে তিনি জানান, তিনি প্রতিদিন বেলা দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত তিন ঘণ্টা তেলেগু ও সংস্কৃতের চর্চা করছেন এবং তাঁর বাপ-পিতামহের ভাষাকে অপূর্ব সম্পদে সমৃদ্ধ করবার জন্যে তাঁর প্রস্তুতির অংশরূপে তিনি সংস্কৃত ভাষার চর্চা করছেন। 'রত্নাবলী' অনুবাদের সময়ে বাংলা থেকে হ'লেও সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। তাই 'শর্মিষ্ঠা' রচনাকালে তিনি রত্নাবলীর প্রভাবকে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

'পদ্মাবতী' নাটকেও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। বাংলা নাটক লেখার প্রস্তুতির জন্যেই মধুসূদন সংস্কৃত সাহিত্য চর্চা করেছিলেন, তা ঠিক নয়। তিনি রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লিখেছিলেন : By the bye—did I ever tell you that I taught myself Sanskrit at Madras? I am anything but a Pandit like Rajendra who is a thundering grammarian, but I know enough to read Kalidas, and that, I think, is quite enough for me.

নগেন্দ্রনাথ সোম লিখেছেন :

মধুসূদন সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য (বর্ধমান) ভেদিয়ানিবাসী পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নের নিকট রীতিমত সংস্কৃত কাব্যসমূহ পাঠ করিয়াছিলেন। · পণ্ডিত রামকুমারের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি ব্যাস, বাল্মীকি, ভবভূতি, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, বিশ্বনাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবি ও পণ্ডিতগণের গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়াছিলেন এবং মেঘদূত পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার এতদূর অনুরাগ পরিলক্ষিত হইয়াছিল যে, তিনি ইংরাজি, লাটিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেও তাঁহার প্রায় সমস্ত গ্রন্থের উপরিভাগে সংস্কৃত শ্লোক পরিবেশিত করিয়াছিলেন ; এই সকল উদ্‌ধৃত শ্লোক (Quotation) তাঁহার সংস্কৃতানুরাগেরই একান্ত পরিচায়ক।

নগেন্দ্রনাথের এই উক্তি অবশ্য সত্য। মধুসূদন কেবল তাঁর গ্রন্থের উপরিভাগে সংস্কৃত কোটেশনই ব্যবহার করেননি, তাঁর গ্রন্থমধ্যেও সংস্কৃত সাহিত্যের বহু রত্নরাজিকে বাংলা ভাষায় গ্রহণ ক'রে নিজের রচনা তথা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। কালিদাস ও ভবভূতি ছিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কবি। তাঁদের বহু শ্লোকের ভাবকে তিনি প্রায় হুবহু নিজের নাটকে ও কাব্যে গ্রহণ করেছিলেন। তা তাঁর দীর্ঘকাল সংস্কৃত সাহিত্য চর্চারই ফল।

'একেই কি বলে সভ্যতা'? নিয়ে ইয়ং বেঙ্গল যে গোলমাল করেছিল, তার ফলে বেলগাছিয়া নাট্যশালা বাংলা নাটক অভিনয় বন্ধ করেছিল : পরে রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বেলগাছিয়া নাট্যশালায় বাংলা নাটক অভিনয় আবার শুরু করবার ইচ্ছা করলে মধুসূদন কয়েকটি নাটক রচনায় হাত দেন। কিন্তু বেলগাছিয়া নাট্যশালা আর পুনরুজ্জীবিত হয় নি। এর অল্পকাল পরেই নাট্যামোদী রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকালমৃত্যু ঘটে। ফলে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় চির যবনিকাপাত হয়। সেই সঙ্গে মধুসূদনের বাংলা সাহিত্যে প্রবেশের যুগও শেষ হয়।

৯

খ্যাতির শীর্ষে

মধুসূদন তাঁর 'পদ্মাবতী' নাটকখানি তাঁর প্রহসন দুখানির আগেই লিখেছিলেন। পরে তিনি এই নাটকের কিছু পরিমার্জনা ও অংশ-বিশেষের কিছু পরিবর্তন ক'রে থাকবেন। মার্চ (১৮৫৯) থেকে মে (১৮৫৯) মধ্যে 'পদ্মাবতী' যে রচিত হয়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে নাটকখানি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষে। নাটকখানি যে তিনি 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের মতোই বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্যেই লিখেছিলেন, সেকথা তিনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কেশরচন্দ্র গাঙ্গুলীকে লিখেছিলেন, "How are you getting on with "Sharmistha"—my Garrick ? Have you seen Padmavati ? Will it do as Sharmistha's successor ?" কিন্তু 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' প্রহসনের অভিনয় নিয়ে ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় যে সোরগোল তুলেছিল, তার ফলে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বেলগাছিয়া নাট্যশালায় আর বাংলা নাটকের অভিনয় করবেন না, স্থির করায় মধুসূদনকে অন্য কোনও নাট্যামোদী সম্প্রদায়ের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। তাই ১৮৬০ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন: "There is another drama of mine which will be soon acted by a company of Amateurs. It is also written on the classical model." নাটকখানি যে পদ্মাবতী, তা বলাই বাহুল্য।

ঐ অ্যামেচার কোম্পানি কোন্‌টি, তা জানা যায় নি। কারণ, এই সময়ে ব্যাঙের ছাতার মতো অসংখ্য নাটুকে দল গজিয়ে উঠেছিল। চারিদিকে নাট্যাভিনয়ের এই উদ্যোগ-উদ্দীপনার কথা

উল্লেখ ক'রে মধুসূদন যতীন্দ্রমোহনকে যে পত্র লেখেন, তার উত্তরে যতীন্দ্রমোহন লিখেছিলেন : "Theatres, as you say, are really springing up like mushrooms, but unfortunately, they are short-lived also ; still they are a good sign of the times, for it is evident that a taste for the Drama is gradually spreading itself among us." যে নাট্যামোদী সম্প্রদায় মধুসূদনের "পদ্মাবতী" নাটকখানি মঞ্চস্থ করতে চেয়েছিল, সেটিও সম্ভবত স্বল্পায়ু ছিল। ফলে "পদ্মাবতী" ঐ সময়ে মঞ্চস্থ হওয়ার সুযোগ পায়নি।

মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা' লিখেছিলেন ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে; 'পদ্মাবতী'তে তিনি গ্রীক পুরাণের বিখ্যাত একটি কাহিনীর ছায়ানুসরণ করেছিলেন। গ্রীক পুরাণে আছে, কলহের দেবী ডিস্‌কর্ডিয়া অন্যান্য দেবীদের মধ্যে কলহসৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি সোনার আপেল তৈরি ক'রে তাতে "সর্বোত্তমা সুন্দরীর জন্যে" লিখে দেবরাজ জুপিটরের পত্নী জুনো, জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্যালাস এবং সৌন্দর্য ও প্রেমের দেবী ভেনাসের সামনে রাখেন। ফলে, কে ঐ সোনার আপেলের যোগ্যা অধিকারিণী, তা নিয়ে ঐ দেবীদের মধ্যে বিবাদ বাধে এবং তাঁরা ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিসকে মধ্যস্থ মানেন। দেবীরা নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্যারিসকে নানাবিধ পুরস্কারের লোভ দেখান। জুনো তাঁকে সাম্রাজ্য, প্যালাস তাঁকে সংগ্রামে বিজয়লক্ষ্মী ও ভেনাস তাঁকে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী নারী দিতে প্রতিশ্রুত হন। প্যারিস ভেনাসকেই সর্বাধিক সুন্দরী বোধে সোনার আপেলটি দেন। ভেনাস তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো প্যারিসকে গ্রীকরাজ মানেলাউসের পত্নী পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী হেলেনকে লাভে সহায়তা করেন। প্যারিস হেলেনকে অপহরণ করে ট্রয়ে নিয়ে গেলে গ্রীস ও ট্রয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। সেই যুদ্ধে ট্রয় ধ্বংস হয়। এই কাহিনীটি হোমারের মহাকাব্য ইলিয়াডের বিষয়বস্তু।

হোমারের মহাকাব্য ইলিয়াড মধুসূদনের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কিন্তু ঐ কাহিনীকে ভারতীয় সমাজ ও পরিবেশ এবং ভারতীয় নাট্যাদর্শের অনুরোধে মধুসূদন অনেকখানি পরিবর্তিত করেন। সোনার আপেলকে তিনি করেন স্বর্ণকমল। দেবরাজ জুপিটারের পত্নী জুনোকে ইন্দ্রাণী শচী এবং ভেনাসকে রতি রাখলেও তিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্যালাসকে করেন যক্ষরাজমহিষী মুরজা। কারণ, জ্ঞানের ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে তিনি সামান্যা সৌন্দর্যাভিমানিনী ও কলহপরায়ণা ক'রে চিত্রিত করতে কুণ্ঠাবোধ করেন। জ্ঞান ও বিদ্যার প্রতি মধুসূদনের চিরজীবনের অপরিসীম শ্রদ্ধাই এই পরিবর্তনের মধ্যে ফুটে উঠেছে। হেলেন ছিলেন অপরের বিবাহিতা পত্নী। তাঁকে প্রণয়িণীরূপে লাভ হিন্দু সমাজে অত্যন্ত নিন্দনীয়। তাই তিনি হেলেনের স্থলে কল্পনা করেন কুমারী অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যা পদ্মাবতীকে। সংস্কৃত নাট্যাদর্শে বিয়োগান্ত কাহিনী ছিল নিষিদ্ধ। তাই ইলিয়াডের বিয়োগান্ত পরিণামকে তিনি বর্জন ক'রে পদ্মাবতীর কাহিনীকে মিলনান্তক ক'রে তোলেন। কেবল তাই নয়, তিনি পদ্মাবতীকে মুরজার পাপভ্রষ্টা কন্যা-রূপে কল্পনা ক'রে মুরজা চরিত্রকে শচীর চরিত্র থেকে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দেন। তিনি কলহের দেবী ভিস্‌কর্ডিয়ার স্থলে আনেন হিন্দু পুরাণের কুখ্যাত বিবাদের দেবতা নারদকে।

ইলিয়াডের বিখ্যাত কাহিনীর ছায়ায় মধুসূদন তাঁর 'পদ্মাবতী' নাটকের কাহিনীকে এই রূপ দেন : বিদর্ভের রাজা ইন্দ্রনীল মৃগয়াকালে এক দেবোদ্যানে প্রবেশ করেন। যেখানে শচী, রতি ও মুরজা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কলহসৃষ্টির উদ্দেশ্যে নারদ একটি কনকপদ্ম নিয়ে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা সুন্দরী তিনিই এই পদ্মটি গ্রহণ করুন। দেবীরা ইন্দ্রনীলকে মধ্যস্থ করলে ইন্দ্রনীল রতিকেই সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বোধে কনকপদ্মটি দিলেন। ফলে শচী ও মুরজা তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন এবং রতি তাঁকে মাহিষ্মতী পুরীর রূপসী রাজকন্যা পদ্মাবতীকে পত্নীরূপে দিলেন। শচীদেবী ইন্দ্রনীলকে শাস্তিদানের জন্য

কলিদেবের শরণাপন্ন হলেন। কলিদেব বিদর্ভরাজ ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে প্রতিবেশী রাজাদের উত্তেজিত ক'রে বিদর্ভর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধালেন এবং সুকৌশলে পদ্মাবতীকে হরণ ক'রে এক অরণ্যময় স্থানে লুকিয়ে রাখলেন। রতি এই সংবাদ পেয়ে পদ্মাবতীকে সেই নির্জন অরণ্য থেকে উদ্ধার ক'রে ঋষি অঙ্গিরার আশ্রমে নিয়ে গেলেন এবং দেবী ভগবতীর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। ভগবতী শচীকে এই ক্রূরকর্ম থেকে নিরস্ত হ'তে উপদেশ দিলেন। রাজা ইন্দ্রনীল এদিকে যুদ্ধে জয়ী হয়ে রাজপুরীতে এসে দেখলেন পদ্মাবতী নেই। তিনি মনের দুঃখে সংসার ত্যাগ ক'রে তীর্থ ভ্রমণে গেলেন। অবশেষে অঙ্গিরার আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সেখানে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর মিলন হলো। দেবীরাও ভগবতীর আদেশে বিবাদ-বিসংবাদ ভুলে রাজদম্পতিকে আশীর্বাদ করলেন। মহর্ষি নারদও পদ্মাবতীকে আশীর্বাদ করলেন :

যশঃসরে চিররুচি কমলিনী রূপে,
শোভ তুমি, পদ্মাবতি রাজেন্দ্র-নন্দিনি !
যযাতির প্রণয়িণী দৈত্য রাজবালা
শর্মিষ্ঠা যেমতি ; তাঁর সহ নাম তব
গাঁথুক গৌড়ীয় জন কাব্যে-রত্নহারে,
মুকুতাসহ মুকুতা গাঁথে লোক যথা।

নারদের আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে মধুসূদন তাঁর নিজের বাসনাই প্রকাশ করেছেন—তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের মতোই তাঁর 'পদ্মাবতী' নাটকও বাঙ্গালীর কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করুক এবং বাংলা সাহিত্যে অন্যতম রত্নরূপে বিরাজ করুক। 'শর্মিষ্ঠা' নাটক পুস্তকাকারে আগেই প্রকাশিত হ'লেও তা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তাঁর অভিনয়ের পরেই। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বরের মধ্যে শর্মিষ্ঠা কয়েকবার অভিনীত হয়ে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ১৯শে মার্চ (১৮৫৯) তারিখে মধুসূদন গৌরদাসকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা থেকে জানা যায়, ঐ সময়ে পদ্মাবতীর প্রথম অঙ্ক রচিত হয়ে গিয়েছিল।

৩রা মে গৌরদাসকে লেখা তাঁর পত্র থেকে জানা যায়, ঐ সময় পদ্মাবতীর চতুর্থ অঙ্ক রচনা শেষ হয়ে গিয়েছে। মে মাসের মধ্যেই যে 'পদ্মাবতী'র রচনা শেষ হয়েছিল, এমন কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। ১৯শে মার্চ (১৮৫৯) তারিখে মধুসূদন গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, তার থেকে জানা যায়, ঐ সময়ে 'শর্মিষ্ঠা' প্রকাশিত হয় নি—

—My friends think that I should keep quite, till Sharmistha is brought out and makes me "Famous".

প্রকাশের দু-এক মাসের মধ্যেই 'শর্মিষ্ঠা' বাংলা 'কাব্য-রত্ন-হারে' মুক্তার স্থান পেয়েছিল, ভাবা যায় না। 'শর্মিষ্ঠা' জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, মঞ্চস্থ হওয়ার পরেই। অন্যপক্ষে, 'শর্মিষ্ঠা,' মঞ্চস্থ হওয়ার আগেই 'পদ্মাবতী' রচিত হয়েছিল। 'পদ্মাবতী' নাটকে কলিদেবের, নারদের ও দেবদেবীর কিছু উক্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হয়েছে। তাই মধুসূদনের জীবনীকাররা লিখেছেন, মধুসূদন 'পদ্মাবতী' নাটকেই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করা যায় না। মধুসূদন তাঁর 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' 'শর্মিষ্ঠা' মঞ্চস্থ হওয়ার পূর্বেই রচনা করেছিলেন। নারদের উল্লিখিত সংলাপ থেকে মনে হয়, ঐ সংলাপ 'শর্মিষ্ঠা' মঞ্চস্থ হওয়ার পরে রচিত। তাই 'পদ্মাবতী' নাটকেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল, তা বলা যায় না। তিলোত্তমাসম্ভবেই তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন। পরে তিনি পদ্মাবতীর কিছু কিছু সংলাপ গদ্য থেকে অমিত্রাক্ষর ছন্দে পদ্যে পরিবর্তিত ক'রে থাকবেন।

'পদ্মাবতী' নাটক পুস্তকাকারে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলের শেষে বা মে-র একেবারে গোড়ায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'তিলোত্তমাসম্ভব' তার অল্প কয়েকদিন বাদে, ১৮৬০ সালের মে মাসে-ই, প্রকাশিত হ'লেও সাধারণ পাঠক পদ্মাবতীতেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের দেখা প্রথমে চেয়েছিলেন। তা থেকেই মধুসূদন 'পদ্মাবতী' নাটকেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন, এই ভুল ধারণা প্রচলিত হয়েছিল।

'পদ্মাবতী' মধুসূদনের অপর দুখানি নাটক—'শর্মিষ্ঠা' ও 'কৃষ্ণকুমারী' অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

'পদ্মাবতী' রচনার পরে মধুসূদন তাঁর প্রহসন দুখানি—'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'—রচনা করেছিলেন। মে মাসের শেষার্ধ ও জুনমাসের প্রথমার্ধে এই প্রহসন দুখানি রচিত হয়েছিল, মনে হয়। মধুসূদনের প্রতিভা অতি দ্রুত সৃজনে পটু ছিল। মধুসূদন কেশব গাঙ্গুলীকে একটি পত্রে যে লিখেছিলেন—"ধীমা তেতালা is not the তাল for me," তা একান্তই সত্য। প্রহসন দুখানি রচনার পরেই জুন মাসের শেষার্ধে (১৮৫৯) মধুসূদন তাঁর "তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের" প্রথম দুই সর্গ রচনা ক'রে থাকবেন। কারণ, "বিবিধার্থ সংগ্রহ" পত্রিকার ষষ্ঠ পর্বে ৬৪ ও ৬৫ খণ্ডে ধারাবাহিকভাবে ঐ দুই সর্গ ১৮৫৯ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের আগে যে 'তিলোত্তমাসম্ভব' রচিত হয় নি, তা নিঃসন্দেহ। কারণ, মে মাসের ও তার আগেকার কোনও পত্রেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে মধুসূদন বা তাঁর বন্ধুদের বিন্দুমাত্র উল্লেখ বা উচ্চবাচ্য দেখা যায় নি। মে মাসে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে কোনও উল্লেখ বা উচ্চবাচ্য নেই অথচ জুলাই-আগস্ট মাসে 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম দুই সর্গ প্রকাশিত হ'লো—এ থেকে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন-জুলাইকে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের রচনারম্ভের কাল ব'লে ধরা অযৌক্তিক হবে না।

তিলোত্তমাসম্ভব সম্ভবত কিছুটা ধীমা তেতালাতেই রচিত হয়েছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দ কিভাবে দেশের বিদ্বজ্জন গ্রহণ করবেন, মধুসূদন তা লক্ষ্য করছিলেন।

"বিবিধার্থ সংগ্রহে" 'তিলোত্তমা' প্রকাশের পর যখন সুশিক্ষিত ও সাহিত্যামোদী পাঠকরা তার অভিনবত্ব ও সাফল্য সম্পর্কে একবাক্যে মত প্রকাশ করলেন, এবং মধুসূদনকে "তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্য শেষ

করবার জন্যে উৎসাহিত করলেন, তখনই তিনি তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য রচনায় পুনরায় হাত দেন এবং "তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য" রচনার কাজ শেষ করেন। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের রচনা যে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধেই শেষ হয়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। "তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল পর বৎসর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ব্যাপ্‌টিস্ট মিশন প্রেস থেকে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন এই কাব্য প্রকাশের সমুদয় ব্যয়ভার গ্রহণ ক'রেই ক্ষান্ত থাকেন নি, তিনি এই কাব্যটি রীতিমতো দেখে দিয়েছিলেন এবং কবিকে নানাভাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন। মধুসূদন যতীন্দ্রমোহনের পরামর্শ ও সমালোচনাকে অতিশয় মূল্য দিতেন। বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তিত এই অভিনব ছন্দে রচিত কাব্যটির কোথাও যাতে সামান্যতম ক্রটি, বিশেষতঃ ছন্দে ও অক্ষর-বিন্যাসে, না থাকে, সেজন্যে যতীন্দ্রমোহন খুবই সতর্ক হয়েছিলেন। সারা কাব্যটিতে অন্ত্যমিল না থাকলেও প্রতিটি চরণ চৌদ্দ অক্ষরে এবং ঐ চৌদ্দ অক্ষর ৮ ও ৬ অক্ষরে বিভক্ত ছিল।

তাই কাব্যের প্রতিটি চরণ অতি সতর্কতার সঙ্গে দেখার প্রয়োজন ছিল। এই সময়ে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটক রচনার কাজেও হাত দিয়েছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩:শে ডিসেম্বর তারিখে যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনকে যে পত্র লেখেন, তা থেকে বোঝা যায়, ঐ সময়ে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটক রচনার কাজেও ব্যস্ত ছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ঐ পত্রে লিখেছেন ঃ About the drama in blank verse, I will talk over the matter with the Rajas and read to them the few lines you have sent me as a specimen. আমাদের ধারণা, ঐ সময়েই তিনি তাঁর "পদ্মাবতী" নাটকেও অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত সংলাপগুলি সংযোজিত করেছিলেন। নগেন্দ্রনাথ সোম লিখেছেন, "মধুসূদন তিলোত্তমাসম্ভব অতি শীঘ্রই সমাপ্ত করেন।" কিন্তু এই উক্তিকে সহজে গ্রহণ করা যায় না। আমরা দেখি, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনকে একটি পত্রে জানাচ্ছেন ঃ

I am glad so say that I have been to able to finish your fourth Book. I was afraid lest I should be making the Printers wait for me ; so I managed to snatch a few leisure half hours and took up the Book. It so much engrossed my attention that unconsciously I found myself at the end of it ! I am delighted to find that my predictions have been verified ; the Muses seem to have brought their aid most gloriously ; for the fourth Book is even superior to the third. I may be mistaken, but such is my firm conviction. Knowing full well that you tolerate the liberties that I take, I have again presumed to make a few remarks in this Book.

যতীন্দ্রমোহন যে a few remarks করেছিলেন, মধুসূদন সেগুলিকে মূল্য দিয়ে তাঁর পাণ্ডুলিপিতে কিছু সংশোধন, পরিবর্তন বা সংযোজন ক'রে থাকবেন, এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয়। যাই হ'ক, মধুসূদন এই কাব্য যে জনসাধারণের জন্য নয়, ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষিত বিদ্বজ্জনের জন্যই রচনা করেছিলেন, তিনি মুদ্রিত গ্রন্থের সূচনায় যে তিনটি উদ্‌ধৃতি দিয়েছিলেন, তা থেকে জানা যায়। কারণ, তখনও তাঁর ধারণা ছিল, পয়ার ত্রিপদী ছন্দে অভ্যস্ত বাঙালী সাধারণ পাঠকের এই অভিনব ছন্দে অভ্যস্ত হ'তে সময় লাগবে। ঐ উদ্‌ধৃত বাক্যগুলি ভবভূতি থেকে—

উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোপি সমানধর্মা।
কালো হ্যয়ং নিরবধির্ বিপুলা চ পৃথ্বী॥

হোরেস থেকে একটি উক্তি, যার অর্থ হ'লো—Work not to attract the admiration of the crowd, be content with but a few readers.

মিল্‌টন থেকে একটি উক্তি—"Fit audience find tho' few."

মধুসূদন তাঁর "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য" যতীন্দ্রমোহনের নামেই উৎসর্গ করেন। ঐ উৎসর্গ পত্রে তিনি লেখেন:

> যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য, কেন না, এইরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্য পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্বসাধারণ, জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়ত সে শুভকালে এ কাব্য রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।

বলাই বাহুল্য, মধুসূদনকে ধন্যবাদের জন্য আদৌ অপেক্ষা করতে হয় নি। তাঁর পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যই পরিণত হয়েছিল।

মধুসূদন তাঁর "তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য" পৌরাণিক সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী নিয়ে রচনা করেছিলেন। সুন্দ-উপসুন্দ নামে দুই পরম-পরাক্রান্ত দানব-ভ্রাতার হস্তে পরাজিত হয়ে দেবগণ স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে যে যেখানে পেরেছেন, সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন—স্বর্গরাজ্য দানবগণের দ্বারা অধিকৃত হয়েছে। বায়ু, অগ্নি, যম, বরুণ প্রভৃতি দিক্‌পালেরা পলায়ন ক'রে ব্রহ্মলোকে এবং দেবরাজ ইন্দ্র হিমালয়ের নিভৃত শৃঙ্গ ধবলগিরিতে আশ্রয় নিয়েছেন। ধবলগিরির বর্ণনা দিয়েই কাব্যারম্ভ হয়েছে। এই ধবলগিরির এক নির্জন স্থানে দেবরাজ ইন্দ্র উপবিষ্ট আছেন। তাঁর দিব্য অস্ত্রশস্ত্র সম্মুখে লুণ্ঠিত হচ্ছে। দেবরাজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত। তিলোত্তমার এই প্রারম্ভাংশকে অনেকে ভাবগাম্ভীর্যে কবি কীট্‌সের হাইপিরিয়নের সঙ্গে তুলনা করেছেন। দেবরাজের চক্ষে নিদ্রা নেই। রজনী দেবী তাঁর চিরসহচরী নিদ্রাদেবীকে নিয়ে দেবরাজের সেবা ক'রেও তাঁর মনে

কণামাত্র শান্তির সঞ্চার করতে পারলেন না। রজনী দেবী, নিদ্রা দেবী ও স্বপ্ন দেবীর সকল চেষ্টা যখন ব্যর্থ হ'লো, তখন তাঁরা শচীদেবীকে আনবার জন্য আকাশ পথে প্রস্থান করলেন। ক্ষণকাল পরেই শচী দেবী ধবলগিরিতে উপস্থিত হলেন। শচী দেবীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সহসা ধবলগিরি শৃঙ্গে বসন্তের আবির্ভাব হ'লো। মধুসূদন এই অকাল বসন্তের আবির্ভাবের বর্ণনা কালিদাসের কুমারসম্ভবের অনুসরণেই করেছেন। শচীর আগমনে দেবরাজের বিষন্নতা দূর হ'লো। তিনি দেবদেবীদের সংবাদ নিয়ে জানলেন যে, তাঁরা ব্রহ্মলোকে দেবরাজের জন্য অপেক্ষা করছেন। দেবরাজ তা শোনামাত্র শচীকে নিয়ে তাঁর জ্যোতির্ময় বিমানে ব্রহ্মলোকে যাত্রা করলেন।

দ্বিতীয় সর্গে দেবযানে দেবদম্পতির ব্রহ্মলোকে যাত্রা কবি বর্ণনা করেছেন। প্রচণ্ড শব্দে দিগ্‌বিদিক কম্পিত ক'রে মেঘলোক ভেদ করে দেবযান মহাশূন্যে উত্থিত হ'লো—যা আধুনিক পাঠককে চন্দ্রাভিমুখে মহাশূন্যে রকেটযানগুলির যাত্রার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। অল্পক্ষণের মধ্যে দেবযান চন্দ্রলোক, সূর্যলোক অতিক্রম করে আরও উর্ধ্বে উত্থিত হ'লো। ব্রহ্মলোকের প্রচণ্ড প্রভায় দেবরাজ ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর চক্ষু ঝলসিত হ'লো। সারথি মাতলি বিমূঢ় হয়ে রথরশ্মি ত্যাগ করলেন। দেবযানের অচঞ্চল সমুজ্জ্বল পতাকা ব্রহ্মলোকে জ্যোতিঃ প্রভায় ম্লান ও বিবর্ণ হ'লো। অবশেষে রথ কারণ-সলিল-বক্ষে বিরাজিত ব্রহ্মলোকে উপনীত হ'লে, বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেবতারা ইন্দ্রকে দেখে সহর্ষে জয়ধ্বনি করলেন। অতঃপর তাঁরা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে মন্ত্রণায় মিলিত হলেন। পরামর্শ সভায় মধুসূদন দেবগণের চরিত্র চিত্রণে অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন। ইন্দ্রকেও তিনি এক অভিনব রূপ দান করেছেন—যা পৌরাণিক ইন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র এবং যা পরবর্তী কবিদের, বিশেষতঃ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর 'বৃত্রসংহার' কাব্যে ইন্দ্র-চরিত্র চিত্রণে, বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। পুরাণে বর্ণিত ইন্দ্র বিলাসী, স্বার্থপর, ঈর্ষাপরায়ণ, এমন কি লম্পট। কিন্তু তিলোত্তমাসম্ভবের ইন্দ্র কর্তব্য-

পরায়ণতা, পরার্থপরতা, করুণা প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণে ভূষিত ও দেবোচিত মহিমায় মহিমান্বিত। শেষ পর্যন্ত দেবগণ পরামর্শ ক'রে স্থির করলেন, তাঁরা ব্রহ্মার নিকট গমন করবেন। দেবগণ ব্রহ্মার উদ্দেশে যে স্তব করলেন, তা মধুসূদন কালিদাসের কুমারসম্ভব থেকেই গ্রহণ করেছেন। দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বিধাতা বললেন :

…ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি
নিবারিতে এ দানব দ্বয়ে।…

ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব কিভাবে সংঘটিত করা যায়, সে সম্পর্কে দেবতারা অত্যন্ত চিন্তিত, তখন দৈববাণী হ'লো :

"আনি বিশ্বকর্মায়, হে দেবগণ, গড়
বামায় অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে।
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম,
ভূত, তিল তিল করি সবা হইতে লইয়া
সৃজ এক প্রমদারে—ভবপ্রমোদিনী।
তা হতে হইবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি।"

ইন্দ্র তখন বায়ুকে বিশ্বকর্মাকে আনবার জন্যে পাঠালেন। বায়ুর বিশ্বকর্মা পুরীতে গমনের বর্ণনায় পথিমধ্যস্থিত সূর্যলোক, চন্দ্রলোক, যমপুরী প্রভৃতির চিত্র এঁকেছেন কবি। যমপুরীর যে বিস্তৃত বিবরণ আমরা মেঘনাদবধ কাব্যে পাই, তিলোত্তমাসম্ভবেই তার সূচনা পাওয়া যায়। বিশ্বকর্মার ভবনেরও সুন্দর কল্পনা :

…কতক্ষণে
উত্তরমেরুতে বীর উত্তরিলা আসি।
অদূরে শোভিল বিশ্বকর্মার সদন।
ঘন ঘনাকার ধূম উড়ে হর্ম্যোপরি,
তাহার মাঝারে হৈম গৃহাগ্র অযুত
ভোতে, বিদ্যুতের রেখা অচঞ্চল যেন
মেঘাবৃত আকাশে, বা বাসবের ধনু

মণিময়। প্রবেশিয়া পুরী বায়ুপতি
দেখিলেন চারিদিকে ধাতু রাশি রাশি
শিলাকার; মূর্তিমান দেব বৈশ্বানরে।

বায়ুর মুখে সংবাদ পেয়ে বিশ্বকর্মা ব্রহ্মলোকে গেলেন। তাঁর প্রচণ্ড তপোবলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থ ব্রহ্মলোকে আকৃষ্ট হ'লো। বিশ্বকর্মা তা থেকে তিল তিল সংগ্রহ ক'রে তিলোত্তমার দেহ নির্মাণ করলেন। দেবগণ সেই অতুলনীয়া নারীমূর্তি দর্শনে বিমুগ্ধ হলেন। তখন পুনরায় দৈববাণী হ'লো:

পাঠাও, হে দেবপতি, এ রমা বামারে
(অনুপমা বামাকুলে) যেথা অমরারি
সুন্দ ও উপসুন্দাসুর।...
...এ মাধুরী হেরি,
কামমদে মাতি দৈত্য মরিবে সংগ্রামে।
তিল, তিল লইয়া গড়িলা সুন্দরীরে
দেবশিল্পী, তেঁই নাম রাখ তিলোত্তমা।

ঐ সময়ে সুন্দ ও উপসুন্দ বিন্ধ্যারণ্যে বনবিহারে মত্ত ছিল। ইন্দ্র তিলোত্তমাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন, এবং তিলোত্তমাকে সেখানে পাঠালেন। ঋতুরাজ বসন্ত ও কামদেব অদৃশ্যভাবে তিলোত্তমার সঙ্গে চললেন। দৈত্যদ্বয় তিলোত্তমাকে দেখলো। প্রথমে তারা তিলোত্তমাকে ভগবতী গৌরী জ্ঞানে তাঁর পাদপূজার জন্য অগ্রসর হ'লো। কিন্তু কামদেব শরজালে তাদের অস্থির ক'রে তুললেন। ফলে দু'জনেই একই সঙ্গে কামোন্মত্ত হয়ে তিলোত্তমার হাত ধরলো। এইভাবে দুই ভ্রাতার দ্বন্দ্ব শুরু হ'লো। উপসুন্দ বললো:

.. কি কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে
ভ্রাতৃবধূ তব বীর?...

সুন্দ বললো:

বরিনু কন্যায় আমি তোমার সম্মুখে

এখনি। আমার ভার্য্যা, গুরুজন তব,
দেবর বামার তুমি ; দেহ হাত ছাড়ি।

ক্রমেই ক্রোধান্বিত দৈত্যদ্বয় অসি নিষ্কোষিত ক'রে পরস্পরকে আঘাত করলো। দৈববাণী সার্থক হ'লো। সুন্দ উপসুন্দ পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে নিহত হ'লো। দৈত্যপুরী শ্মশান হ'লো। দেবতারা স্বর্গরাজ্য ফিরে পেলেন। তিলোত্তমা ইন্দ্রের আদেশে সূর্যলোকে প্রস্থান করলেন। এই হ'লো তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের কাহিনী।

মধুসূদন তিলোত্তমার পাণ্ডুলিপি যতীন্দ্রমোহনকে উপহার দিয়েছিলেন। যতীন্দ্রমোহন সেটিকে সযত্নে বাঁধিয়ে নিজের গ্রন্থাগারে আজীবন রক্ষা করেছিলেন। মধুসূদন তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের পাণ্ডুলিপি যতীন্দ্রমোহনকে স্বহস্তে উপহার দিচ্ছেন এবং যতীন্দ্রমোহন তা গ্রহণ করছেন—এইরূপ একটি আলোকচিত্র তৎকালীন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার মেসার্স রিনেক অ্যাণ্ড কোম্পানিকে দিয়ে তোলানো হয়েছিল। যতীন্দ্রমোহন ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মে তারিখে একপত্রে মধুসূদনকে তিলোত্তমার পাণ্ডুলিপি উপহার পেয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন :

> I know not how to thank you adequately for the very valuable present of the manuscript তিলোত্তমা in the Poet's own handwriting! I will preserve it with the greatest care in my Library, as a monument that marks a grand epoch in our literature, when Bengali poetry first broke through the fetters of rhyme and soared exultingly into the lofty region of sublimity which is her genuine province…

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'লে তা শিক্ষিত পাঠকমহলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করলো। রাজনারায়ণ বসু,

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের" উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে নিবন্ধ লিখলেন। রাজনারায়ণ বসু 'তিলোত্তমা' গ্রন্থাকারে উপহার পেয়ে মেদিনীপুর থেকে এক দীর্ঘ পত্র লিখলেন। তাতে তিনি মধুসূদনের প্রতিভায় বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে বললেন:

> If Indra had spoken Bengalee, he would have spoken in the style of the poem. The author's extra-ordinary loftiness and brilliancy of imagination, his minute observation of nature, his delicate sense of beauty, the uncommon splendour of his diction and the rich music of his versification charm us in every page. It is an intellectual treat of the first description···

তিনি ঐ পত্রে আরো বললেন, বিশ্বকর্মা যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে তিল তিল সৌন্দর্য নিয়ে তিলোত্তমার সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি মধুসূদনও বিশ্বসাহিত্য থেকে তিল তিল ভাবের সৌন্দর্য নিয়ে তাঁর কাব্যপ্রতিমা তিলোত্তমা রচনা করেছেন:

······all the great masters of song—Vyas and Valmiki, Homer and Virgil, the Hebrew Prophets and Dante, Tasso and Milton, Kalidas and Shakespeare have contributed their respective quotas to the composition of the 'Tilottama';

তিনি এ কথাও বললেন যে, যে মানুষটি সুরায় ও হিন্দুর নিষিদ্ধ খাদ্যে সর্বদা অভ্যস্ত, যে সাহেবী পোশাক পরে, ইংরেজী ভাষাকে ভালোবাসে, এদেশীয় ভাষাগুলিকে অতিশয় ঘৃণা করে, সেই মানুষটি কিনা হিন্দু কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করবে, তাও অতিশয় বিস্ময়কর। মধুসূদন ঐ কথার উত্তরে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসের সঙ্গে বলেছিলেন,

তুমি কেমন করে জানলে যে আচার্য ব্যাস মাঝে মাঝে হিন্দুর নিষিদ্ধ খাদ্য খেতেন না বা মদে চুমুক দিতেন না ?—"Pray how do you know that Rev. Dr. Vyas did not march into beef and sip his brandy pawny ?"

রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর প্রভৃতির মতো ব্যক্তিরা মধুসূদনকে অমিত্রাক্ষর প্রবর্তনের জন্য বাংলা সাহিত্যে এক নবযুগের প্রবর্তকরূপে স্বীকৃতি দিলেও মধুসূদনকে একদিকে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যদল, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ ও প্যারীচরণ সরকারের মতো ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের তীব্র বিরোধিতা, নিন্দা ও ব্যঙ্গবিদ্রূপের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। তাঁকে উপহাস করবার জন্য অমিত্রাক্ষরছন্দের বিকৃতি ক'রে অনেক ব্যঙ্গ কবিতাও রচিত হয়েছিল। মধুসূদনের এই কাব্যকৃতির প্রতি একশ্রেণীর প্রভাবশালী ও পণ্ডিত ব্যক্তি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছেন দেখে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছিলেন :

> Poor fellow ! he is born in evil days, when he will get nothing for his pains save the approbation of a select few. Our countrymen are not yet in a position to appreciate and enjoy blank verse.

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নবপ্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ও মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের নিন্দা করেছেন শুনে তিনি লিখেছিলেন :

For the present I hear that even the renowned Vidyasagar, for whom I have the greatest respect, thinks our pet an abortion, the worthless issue of drunkenness and stupidity. Would such abortions were plentiful in the country and men to know their value !

এইসব বিরুদ্ধ সমালোচনা রাজনারায়ণ বসুকেও খুবই পীড়া দিয়েছিল। তিনি তাঁর পূর্বোক্ত পত্রেই মধুসূদনকে লিখেছিলেন :

Alas ! Why have you undertaken the thankless task of reforming the poetry of your degenerate country ? ·· But the power above decrees otherwise. Hence the obstinate determination to reform sooner Bengalee poetry than "wear the imperial diadem of all the Russias." Your reward is great indeed—immortality.

মধুসূদনও এইসব নিন্দায় অবিচলিত ছিলেন। ঐসব সমালোচনা ও বিরুদ্ধ মতামত সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লিখেছিলেন :

I have heard that V—has been speaking of it with contempt. This does not surprise me. He cannot know much of the "master-singers" whom the author of the Tilottama imitates, and in whose school he has learnt to write poetry. This ebulition of ill nature on the part of V—has lowered him in the estimation of not a few of the serious-minded men of the day in this city. At least, that is what I hear. Jotindra thinks it is "clan-feeling" or in plainer words downright envy. Others less wild than Jotindra call the old boy, a dirty envious fellow. Some other Pundits, literary stars of equal magnitude, say—"হাঁ, উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে। মন্দ হয় নি।" But they regret the author did not write in rhyme, that would have

made him popular. These men, my dear Raj, little understand the heart of a proud, silent lonely man of song! They regret his want of popularity, while, perhaps, his heart swells within him in visions of glory, such as they can form no conception of. But hang the insects of the day!

বিদ্যাসাগর নাকি তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যকে worthless issue of drunkenness and stupidity বলেছিলেন। মধুসূদন অত্যধিক পরিমাণে সুরাপান করতেন সত্য; এমন কি, পরবর্তীকালে তিনি সাধারণত জলের পরিবর্তে 'বিয়ার' খেতেন। কিন্তু রচনাকালে তিনি মদ খেতেন না। সেকথা তিনি ১৮৬০ সালের ১৪ই জুলাই তারিখে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি পত্রে জানান:

Talking about wine and all vicious indulgences, though by no means a saint and teetotal prude, I never drink when engaged in writing poetry; for, if I do, I can never manage to put two ideas together! There is not a line in Tilottama written under the inspiration of even such a mild thing as a glass of rosy sherry or beer.

বিদ্যাসাগর তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের নিন্দা করায় মধুসূদন যে বিদ্যাসাগরের প্রতি রুষ্ট হয়েছিলেন বা বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধার বিন্দুমাত্র হ্রাস হয়েছিল, তা ভাববার কোনও কারণ নেই। মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে একজন মহৎ মানুষরূপেই শ্রদ্ধা করতেন; পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত কোনও কাব্যগ্রন্থকে তিনি উপযুক্ত মূল্য দিতে পারেন নি, কারণ যে পাশ্চাত্য কাব্য ও কবিদের আদর্শে তিনি নিজে কাব্য রচনা

করেছেন, বিদ্যাসাগরের তার সঙ্গে পরিচয় নেই। সেজন্য তাঁর মনুষ্যত্বের মহত্বের কোনও হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। বিদ্যাসাগর এদেশে হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ক'রে যে কল্যাণ সাধন করেছিলেন, মধুসূদন সে বিষয়ে সর্বদা সচেতন ছিলেন। তাই কয়েকদিন পরের একটি পত্রে তিনি রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন :

I have no objection to subscribe one half of my pay towards a statue for I. C. Vidyasagar as the Promoter of Widow-pre-marriage.

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ত্রুটি সম্পর্কে যেসব মন্তব্য মধুসূদনের কানে আসছিল, সেগুলির মধ্যে একটি ছিল এর ভাষা সরল নয়। সে সম্পর্কে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে ১৮৬০ সালের ২৪শে এপ্রিল লিখেছিলেন :

I am afraid you think my style hard, but believe me, I never study to be grandiloquent like the majority of the "barren rascals" that write books in these days of literary exitement. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) inspiration ! Good Blank Verse should be sonorous and the best writer of Blank Verse in English is the toughest of poets—I mean old John Milton ! And Virgil and Homer are anything but easy. ·· I began the poem in a joke, and I see I have actually done something that ought to give our national Poetry a good lift at any rate, that will teach the future poets of Bengal to write in a strain very different from that of the man of Krishnagar—the father

of a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genius.

বিদ্বজ্জনের জন্যেই মধুসূদন তাঁর 'তিলোত্তমা' রচনা করেছিলেন—'Fit audience find—tho' few' মিল্টনের এই বাক্য তাঁর আদর্শ ছিল। কিন্তু 'তিলোত্তমা' গ্রন্থাকারে প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল, fit audience কেবল বিদ্বজ্জনের মধ্যেই নয়, জনসাধারণের মধ্যেও রয়েছে। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' গ্রন্থাকারে প্রকাশের অল্পকাল পরেই মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছেন:

The Tilottama is going on well. The first edition is nearly exhausted. Even the stiff old pundits are beginning to unbend themselves, and the "Someprokash" has spoken out in a manner rather encouraging than otherwise. Blank verse is the go now. As old Runjit Sing used to say, when looking at the map of India,—"*Sub lal ho jaga*", I say "Sub Blank verse ho jaga".

কিছুদিন পরে আর একটি চিঠিতে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন:

I am going to print a plain edition of Tilottama, I wish to try and improve the text. The versification in many places is rather defective. A demand for that work is also increasing daily.

পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি মিত্রাক্ষরে রচিত কাব্য-কবিতা পাঠে অভ্যস্ত বাঙ্গালী পাঠক গোড়ার দিকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ পড়তে অসুবিধা বোধ করতেন। তাই মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে তাঁর ১৮৬০ সালের ১লা জুলাই তারিখে লেখা পত্রে জানান:

Let your friends guide their voices by the pause

(as in English Blank Verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the Language. My advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is.

অমিত্রাক্ষর ছন্দ পাঠে বাঙ্গালী পাঠক প্রথমটা কিছু অসুবিধা বোধ করলেও অল্পদিনের মধ্যেই বাঙ্গালীর কণ্ঠ, কর্ণ ও চিন্তাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধ্বনি পূর্ণ ক'রে তুলেছিল। এ ছিল বাংলা সাহিত্যে তাদের নূতন প্রেম, নূতন অভিজ্ঞতা।

মধুসূদন 'তিলোত্তমা' কাব্যেরও ইংরেজী অনুবাদ করতে শুরু করেন। তবে তা তিনি কিছুটা মাত্র করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত Mookerjee's Magazine নামে সাময়িক পত্রে এই অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। যে কারণেই হ'ক, ইংরেজী অনুবাদটি মধুসূদন তাঁর চিরপ্রিয় অমিত্রাক্ষর ছন্দে করেন নি, মিত্রাক্ষরেই করেছিলেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ ছাড়া বাংলা নাটকের উন্নতি সম্ভব নয়, মধুসূদনের এই ধারণা থেকেই তিনি বাংলাভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ তিনি প্রবর্তনও করলেন। কেবল প্রবর্তন করলেন না, একটি সার্থক ও বহু-প্রশংসিত কাব্যও রচনা করলেন। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দে যে উন্নততর নাটক রচিত হ'তে পারে, তাঁর এই অভিমতকে তিনি তখনও কার্যত প্রয়োগের সুযোগ পান নি। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর 'পদ্মাবতী' নাটকের পাণ্ডুলিপিতে কঞ্চুকী, কলি, দেবদেবী ও নারদের কিছু সংলাপে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করলেও, তা তাঁর মতামত প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাই তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে সম্পূর্ণ নাটক রচনাতেও হাত দিলেন। নাটকের নাম 'সুভদ্রা', সে যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলিকে একটি পত্রে মধুসূদন লেখেন:

Some weeks ago, I sent you the First Act of সুভদ্রা through our friend Jodu. Here goes the Second Act.

I must tell you, my good friend, that I do not intend this drama for the stage. It is simply a dramatic poem.

এই নাট্যকাব্যটি মধুসূদন যে কারণেই হ'ক শেষ করেন নি। পরবর্তীকালে 'সুভদ্রা-হরণ' নিয়ে তিনি একটি কাব্য রচনাতে হাতও দিয়েছিলেন, কিন্তু তা-ও প্রথম সর্গের সূচনার বেশী এগোয় নি।

নাট্যকাব্য ছাড়াও ঐ সময়ে তিনি মঞ্চের জন্য পুরোপুরি অমিত্রাক্ষর ছন্দে একটি নাটক লেখার পরিকল্পনা করছিলেন, তা আমরা যতীন্দ্রমোহনের একটি চিঠি থেকে জানতে পারি। জানতে পারি, অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটকের সংলাপ কেমন মঞ্চোপযোগী হ'তে পারে তার কিছু নমুনা তিনি ১৮৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসেই যতীন্দ্রমোহনের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং সম্ভবত ঐ নমুনা পাইকপাড়ার রাজাদের দেখাতেও অনুরোধ করেছিলেন। ১৮৫৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুসূদনকে একটি পত্রে লেখেন: About the drama in blank verse, I will talk over the matter with the Rajas and read them the lines you have sent me as a specimen.

সম্ভবতঃ পাইকপাড়ার রাজারা অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটক সম্পর্কে উৎসাহ দেখাননি, তাই মধুসূদন আপাততঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটক রচনার সংকল্প ত্যাগ করেন।

যতীন্দ্রমোহন ঐ পত্রে (৩১ ডিসেম্বর, ১৮৫৯) আরও লেখেন: "I have received the MSS from our friend Rajendra.

I will peruse the stanzas carefully and let you know my humble opinion about them."

যতীন্দ্রমোহন এখানে কোন্ কাব্যের পাণ্ডুলিপির কথা বলছেন? "তিলোত্তমার" পাণ্ডুলিপি যে নয়, তা বোঝা যায়, "stanzas" শব্দটি থেকে। ১৮৬০ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন: "By the bye, I have a small volume of odes in the press. They are all about poor old Radha and her বিরহ।" এই ক্ষুদ্রকবিতাগুচ্ছ যে "ব্রজাঙ্গনা কাব্য," সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" রচিত হওয়ার পর কিছুদিন তা পাণ্ডুলিপিতে বন্ধু-মহলে পঠিত হয়েছিল এবং তারপর এমন এক ব্যক্তি তার গ্রন্থ স্বত্বও প্রকাশের ভার নিয়েছিলেন, যাতে ব্রজাঙ্গনা কাব্য মুদ্রণে কিছু বিলম্ব হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তাই আমাদের মনে হয়, পূর্বোক্ত পত্রে যতীন্দ্রমোহন যে কবিতার পাণ্ডুলিপির কথা বলেছেন, তা ব্রজাঙ্গনা কাব্যেরই পাণ্ডুলিপি। অর্থাৎ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের আগে,—মেঘনাদবধ রচনারম্ভের বহু আগে, (মেঘনাদবধকাব্যের রচনা শুরু হয়েছিল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে)—"ব্রজাঙ্গনা কাব্য" রচিত হয়েছিল। তাই ব্রজাঙ্গনা কাব্যের" রচনাকাল সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তা ভ্রমাত্মক।

মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন: তিলোত্তমা-সম্ভব ও একেই কি বলে সভ্যতা একসঙ্গে রচনা যদি বিস্ময়ের বস্তু হয়, মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা একসঙ্গে রচনা তদপেক্ষা শতগুণ অধিক বিস্ময়কর। শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর "কাব্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন" গ্রন্থে লিখেছেন: "মেঘনাদবধ রচনার পরে তিনি আর বীররসাত্মক কাব্য রচনা করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এই সঙ্কল্প বশে তিনি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনা করিয়াছিলেন।" রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মধুসূদনের ১৮৬০ সালের ২৪শে এপ্রিলের পূর্বোক্ত পত্র থেকে জানা যায়, ঐ সময় 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ছাপার জন্যে গিয়েছে।

ঐ পত্রে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রস্তাবনা অংশ পাঠিয়ে তাঁর মতামত জানতেও চেয়েছেন—"I enclose the opening invocation of my "মেঘনাদ"—You must tell what you think of it." ঐ সময় মেঘনাদবধের রচনা যে বেশীদূর এগোয়নি, তা মধুসূদনের পরবর্তী দুখানি চিঠি থেকেও বেশ বোঝা যায়। ১৮৬০ সালের ১৫ই মে তারিখের পত্রে মধুসূদন লিখেছেন: "I am going on with Meghanad by fits and starts." ১৮৬০ সালের ১৪ জুলাই এর পত্রে লেখেন: "I have nearly done one-half of the Second Book of Meghanad."

এইসব উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" মেঘনাদ-বধ কাব্যের পরে তো নয়ই, সমসময়েও রচিত হয় নি। নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর মধুস্মৃতিতে লিখেছেন: "রাজনারায়ণ বসুর মধুসূদনকে লিখিত ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে তারিখের পত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, "ব্রজাঙ্গনা কাব্যের" প্রথম কয়েকটি কবিতা 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনার সময়েই লিখিত হইয়াছিল।" এই উক্তি বহুলাংশে সত্য। ব্রজাঙ্গনা-কাব্যের সূচনা তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচনার সময়ে হ'লেও তার অধিকাংশ কবিতা তিলোত্তমাসম্ভব রচনার পরেই রচিত হয়েছিল ব'লে মনে হয়।

মধুসূদন মিত্রাক্ষর ছন্দের তুলনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দকেই কাব্যের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত বাহন মনে করতেন। কারণ এতে কবির মন মিত্রাক্ষরের নিয়মমাফিক বন্ধনে বাঁধা থাকে না। অমিত্রাক্ষরের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মধুসূদন ঐ সময়ে কেশব গাঙ্গুলীকে একটি পত্র লেখেন:

> I need scarcely tell you that the Blank form of verse is the best suited for Poetry in every language. A true poet will always succeed in Blank verse as a bad one in Rhyme. The grace and beauty of the former's thoughts will

claim attention, as the melody of the latter will conceal the poverty of his mind. Besides, a truly noble mind will always wither away under restraint, of whatever description that mind may be. In China they confine the feet of their women in iron-shoes. What is the result ? Lameness.

মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস করতেন এই কারণে যে, এতে ভাবসম্পদ্ না থাকলে কবিতা রচনা সম্ভব নয়। অন্য পক্ষে, মিত্রাক্ষরে ভাবসম্পদ্ না থাকলেও কবিতা রচনা সম্ভব, কারণ কবির ভাব-দৈন্য ধ্বনিমাধুর্যে ঢাকা পড়ে। কিন্তু ভাবসম্পদের সঙ্গে ধ্বনিমাধুর্য যুক্ত হ'লে তাতে সোনায় সোহাগা হওয়ার কথা। রবীন্দ্রনাথের রচনা ভাবসম্পদের সঙ্গে মিত্রাক্ষরের ধ্বনিমাধুর্যের মিলনেই এমন অতুলনীয় হয়ে উঠেছে। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের সম্বন্ধে দুর্বোধ্যতা ও ভাষার মাধুর্যহীনতার যে অভিযোগ উঠেছিল, মধুসূদন তার উত্তরে মিল্টন, হোমার, ভার্জিল প্রভৃতির কাব্যগুলির ঐসব দোষের উল্লেখ ক'রে কৈফিয়ত দিয়েছিলেন। কিন্তু কৈফিয়ত দিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি। তিনি মিত্রাক্ষর ছন্দে সুললিত ভাষায় কাব্য রচনা করতে অক্ষম বলেই যে অমিত্রাক্ষরের আশ্রয় নিয়েছেন, এমন অপবাদও নিন্দুকের দল যে চালু করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তাই সেই নিন্দুকের দলকে স্তব্ধ করবার জন্যেই তিনি সম্ভবত প্রমাণ দিতে চেয়েছিলেন যে তিনি ছন্দোবন্ধে সুললিত ভাষায় সুমধুর কাব্যও রচনা করতে অক্ষম নন। ঐ সময়ে জয়দেবের সুললিত অমর কাব্য 'গীতিগোবিন্দম্' ও বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলী তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাই তিলোত্তমা কাব্য রচনার সময়ে বা তার অব্যবহিত পরে তিনি রচনা করেন তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'। যখন তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে হিমালয়ের সমুন্নত ও সুগম্ভীর কাব্যসুষমা গড়ে তুলছিলেন, তখনই তিনি ধ্বনিত করেছিলেন নির্ঝরিণীর

সুমধুর কলধ্বনি! আশ্চর্য এই শক্তি। তিলোত্তমাসম্ভবের প্রথম দুই সর্গ ১৮৫৯ সালের মে-জুন মাসেই রচিত হয়েছিল। ঐ সময়ে তিনি 'একেই কি বলে সভ্যতার' মতো প্রহসনও রচনা করেছিলেন। মধুসূদনের কবিমানসের এই অপূর্ব লীলা দেখে তখন ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছিলেন, "It is a wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand, while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tilottama." তিলোত্তমা-রচনা-কালেই ব্রজাঙ্গনা কাব্যের সূচনাও তেমনই বিস্ময়কর। নগেন্দ্রনাথ সোম লিখেছেন:

> অমিত্রছন্দ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মধুসূদনের চিত্ত নিধুবাবু, রাম বসু ও হরুঠাকুর প্রভৃতি বাঙ্গালীর প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের রচিত সঙ্গীতের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ টপ্পা-রচয়িতা নিধুবাবুর আদর্শে গীতিকা রচনা করিতে অভিলাষী হইয়া তিনি বন্ধু গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন,
>
> I mean to try Nidhoo's odes as soon as get my Pandit. কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অনুকরণে মধুসূদন দুই চারিটি সঙ্গীত ব্যতীত আর কিছুই রচনা করেন নাই। তাঁহাদিগের রচিত সঙ্গীতে ভোগ-লালসার প্রাবল্য, রুচির হীনতা এবং বিলাসের আবিলতা উপলব্ধি করিয়া, তিনি ঐ শ্রেণীর গীতি-রচনা হইতে বিরত হন। এই সময়েই তিনি জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিতার কলয়িত নিকুঞ্জকাননে ভ্রমণ করিতে করিতে মধুসূদনের কবিহৃদয় পুলক-প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মনে-মনে অভিনব গীতছন্দে কোন গ্রন্থরচনার সঙ্কল্প করিতেছিলেন, এমন সময়ে একদিন বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায় কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই, তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি করিতে

পার?" এই কথা শুনিয়া মধুসূদনের গীতি-কবিতা রচনার অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল।

এইভাবেই ব্রজাঙ্গনাকাব্য রচনার সূচনা হয় ব'লে নগেন্দ্রনাথ সোম বলেছেন। যাই হ'ক, গীতিকবিতা রচনাতেও মধুসূদন অভাবিত প্রতিভার পরিচয় দিলেন। তাঁর আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় গঠিত সাহেবী মন যে রাধার বিরহ নিয়ে এমন সুন্দর গীতিকবিতা রচনা করতে পারে, তা সকলেরই কল্পনার অতীত ছিল।

সাহিত্য-পরিষদ্ থেকে প্রকাশিত ব্রজাঙ্গনা কাব্যের ভূমিকায় সম্পাদকরা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস লিখেছেন:

> অমিত্রাক্ষর কবিতা রচনাতে অনুরাগ সত্ত্বেও মধুসূদন এই ছন্দোবদ্ধ গাথাগুলি রচনা করিয়া বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। গতানুগতিক পয়ার ও ত্রিপদীর মোহ এড়াইয়া তিনি নিজের আবিষ্কৃত (নানা ছন্দের সংমিশ্রণে) ছন্দ-স্তবক-পদ্ধতির পরীক্ষায় 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ফাঁদিয়াছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন:
>
> I have made up my mind to write (Deo volente!) three short poems in Blank verse, and then do something in rhyme; don't fancy I am going to inflict পয়ার and ত্রিপদী on you. No! I mean to construct a stanza like the Italian ottava Rima and write a romantic tale in it.

কিন্তু ব্রজেন্দ্রবাবুর মতো শ্যেনদৃষ্টি সমালোচকের চোখে যে কিভাবে চিঠির তারিখ এড়ালো, তা বুঝতে পারছি না। মধুসূদন ১৮৬০ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখের চিঠিতে রাজনারায়ণ বসুকে অন্য একটি পত্রে লিখেছেন: "By the bye, I have a small volume of odes in the press. They are all about

poor Radha and her বিরহ।" অর্থাৎ ১৮৬০ সালের এপ্রিল মাসের আগেই 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' লেখা হয়ে গেছে। ১৪ই জুলাই তারিখের পত্রে মধুসূদন ইতালীয় অষ্টপদী ছন্দে যে tale লেখার কথা বলেছিলেন, তা যে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' নয়, তা ধ্রুবসত্য। ব্রজাঙ্গনা কাব্য 'a tale' বা কথা-কাহিনী জাতীয় কাব্যও নয়। আসলে, মধুসূদনের মন ঐ সময় বিচিত্র রসতরঙ্গে লীলায়িত ছিল। বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন ছন্দোবন্ধে বিভিন্ন ধরনের নাটক ও কাব্য রচনার অজস্র কল্পনা, পরিকল্পনা সর্বদাই তাঁর মনকে পরিপূর্ণ ও উচ্ছ্বলিত ক'রে রাখতো। ১৮৫৯ থেকে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মধুসূদনের জীবনে সৃষ্টির যে উন্মাদনা আমরা দেখি, এমন কাব্যোন্মাদনা কোনও কবির ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এই উন্মাদনা ছিল বন্যার প্লাবন কিংবা আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুদ্গারের মতো, যেমন প্রচণ্ড, তেমনি স্বল্পস্থায়ী। এই কয়েক বছর মধুসূদনের মন ভাবে, রঙে, রসে, কল্পনায় যেমন ইন্দ্রধনুর সুষমা ও উচ্চতা লাভ করেছিল, তেমনি ইন্দ্রধনুর মতোই তা বিলীন হয়ে গিয়েছিল স্বল্পকালের মধ্যে। মধুসূদনের জীবনের এ এক মহারহস্য। বস্তুতপক্ষে তাঁর ইতালীয় অষ্টপদী ছন্দের অনুকরণে ছন্দোবন্ধে রচিত a romantic tale তিনি কোনদিন রচনা করেননি; তাঁর সংকল্পিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত তিনটি ক্ষুদ্র কাব্যও (short poems) ছিল অরচিত। ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনার পর এইসব ইচ্ছার কথা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন—তিনি পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শে মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডি রচনায় সমস্ত শক্তি বিনিয়োগ করেছিলেন।

মধুসূদনের ইচ্ছা ছিল 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' তিনি 'বিরহ', 'বিহার' ইত্যাদি কয়েক সর্গে রচনা করেন। কিন্তু তিনি 'বিরহ' নামে প্রথম সর্গটিই লিখেছিলেন। এই সর্গটি 'বংশীধ্বনি', 'জলধর', 'যমুনাতটে', 'ময়ূরী', 'পৃথিবী', 'প্রতিধ্বনি', 'উষা', 'কুসুম' প্রভৃতি আঠারোটি গীতিকবিতার সমষ্টি। মধুসূদন এই গীতিকবিতাগুলিতে মিত্রাক্ষরে বহুবিধ ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং সকল পরীক্ষাতেই তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন।

মধুসূদন ছিলেন একালের কবি, যে কালে মানবিকতাই প্রধান সুর। তাই স্বাভাবিকভাবেই ব্রজাঙ্গনা কাব্য বৈষ্ণব কবিদের ভক্তিরসের আধার হয় নি, তা মানবিক প্রেমেই সিক্ত ও সজল হয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও সেগুলি বহু ভক্তেরও হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছিল, কারণ ভক্ত তো মানুষ, ভক্তি তো প্রেমেরই নিবিড়তম রূপ।

বাংলার প্রাচীন কবিদের অনুকরণে মধুসূদন ব্রজাঙ্গনা কাব্যের প্রত্যেক গীতি-কবিতার শেষে ভনিতা যোগ করেছিলেন। যেমন:

'বংশীধ্বনি' কবিতায়—

মধু কহে ব্রজাঙ্গনে, স্মরি ও রাঙা চরণে,
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসূদন।
যৌবন মধুর কাল, আশু বিনাশিবে কাল
কালে পিও প্রেমমধু করিয়া যতন।

'জলধর' কবিতায়—

মধু কহে হে কামিনী, আশা মহামায়াবিনী
মরীচিকা কার তৃষা কবে তোষে সতি?

'যমুনাতটে' কবিতায়—

মধু কহে, মিছে ধনি করিছ রোদন
কাহার হৃদয়ে দয়া করেন বসতি?

'কুসুম' কবিতায়—

কবি মধু ভণে, পাবে, ব্রজাঙ্গনে,
মধুসূদন!

ইত্যাদি।

'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য লেখা ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে শেষ হ'লেও তা ছাপা হয়ে গ্রন্থাকারে বেরুতে বেশ দেরি হয়েছিল। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম খণ্ড ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হওয়ার পরে 'ব্রজাঙ্গনা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬১ সালের জুলাই মাসে। তা থেকেই সাধারণত এই ধারণা প্রচলিত হয়েছে যে, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'

'মেঘনাদবধ কাব্যের' পরে রচিত হয়েছিল। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত হ'তে কেন এতো দেরি হয়েছিল, তা জানা যায় নি। বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামে এক ব্যক্তি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশের ব্যয় বহন করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জীবনস্মৃতিতে' এই বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত সম্পর্কে লিখেছিলেন:

মধুসূদন দত্ত মহাশয় কিরূপ সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন, তাহার একটা ঘটনা বলিতেছি। বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামে আমাদের একজন পরিচিত ও অনুগত লোক ছিলেন। তিনি সর্বদাই তাঁর টাকে হাত বুলাইতেন এবং ব্যবসা-সম্বন্ধীয় নানাবিধ মতলব আঁটিতেন। কিন্তু কোন ব্যবসায়েই তিনি লাভবান হইতে পারেন নাই। যে কাজেই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। কিন্তু এদিকে তিনি একজন কাব্যরসিক ও রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। মাইকেলের নিকট হইতে 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের পাণ্ডুলিপি লইয়া পড়িয়া অবধি, তিনি মাইকেলের অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়েন; ব্রজাঙ্গনা পড়িয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মাইকেল তাহা জানিতে পারিয়া—'ব্রজাঙ্গনা'র সমস্ত স্বত্ব (copyright) সেই পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই বৈকুণ্ঠবাবুকে দান করেন। বৈকুণ্ঠবাবু নিজ ব্যয়ে কাব্যখানি প্রকাশ করেন।

মধুসূদন তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের উপরে 'পদাঙ্কদূত' থেকে "গোপী-ভর্ত্তুর্বিরহবিধুরা—উন্মত্তেব" এই কথাগুলি উদ্‌ধৃত ক'রে দিয়েছিলেন। 'ব্রজাঙ্গনা' বলতে কবি রাধিকাকেই বোঝাচ্ছেন। বিরহিণী রাধিকার চিত্রই মধুসূদন এই কাব্যে এঁকেছেন। বৈষ্ণব কবিরা রাধিকাকে এবং তাঁর প্রেম ও বিরহকে যেভাবে দেখেছিলেন, মধুসূদন সে চোখে দেখেন নি। মধুসূদনের রাধা পরমা প্রকৃতি রাধা নন, তিনি প্রিয়-বিরহিণী রমণী মাত্র। কৃষ্ণও ভগবান্ নন্, প্রেমিক মানুষ মাত্র। প্রেমিকের জন্য প্রেমিকার যে আকুলতা, যে বেদনা, তা-ই ব্রজাঙ্গনার উপজীব্য। রাধিকার দিব্য প্রেম চিত্রিত করতে গিয়ে অনেক বৈষ্ণব কবি মানব-

প্রেমের যে আবিলতা তাতে আরোপ করেছেন, মধুসূদনের কাব্য তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। রাধাকে পরমা প্রকৃতি ও কৃষ্ণকে পরম পুরুষ রূপে কল্পনা করায় রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে যে অবতারবাদ আত্মপ্রকাশ করেছিল, অবতারবাদের ঘোর বিরোধী ব্রাহ্মরা তাকে ঘৃণার চক্ষেই দেখতেন। তাই রাজনারায়ণ বসু মধুসূদনের অন্যান্য রচনা সম্পর্কে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখিয়েছিলেন, ব্রজাঙ্গনা সম্পর্কে তা দেখাতে পারেন নি। এজন্য মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন :

> I think you are rather cold towards the poor lady of Braja. Poor man ! When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias. Besides, Mrs. Radha is not such a bad woman after all. If she had a "Bard" like your humble servant from the beginning, she would have been a very different character. It is the vile imagination of poetasters that has painted her in such colours.

মধুসূদন রাধার মধ্যে ভর্তৃবিরহবিধুরা উন্মত্তা নারীরই এক করুণ চিত্র অঙ্কিত করেছেন। কৃষ্ণ মথুরায় গিয়েছেন, রাধার কাছে বৃন্দাবন আজ শূন্য, উন্মত্তার মতো রাধা কৃষ্ণেরই স্মৃতি ও কৃষ্ণেরই ছায়া দেখছেন সর্বত্র। ব্রজাঙ্গনা কাব্যের আঠারোটি গীতিকবিতা প্রিয়-বিরহিণী নারীর আঠারোটি অশ্রুবিন্দুর মতো ঝরেছে।

এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের বন্ধু ভোলানাথ চন্দ্রের উক্তিটি স্মরণীয় :

Nothing could exeed the pleasure his Vrajangana Kavya afforded me. It is the production of a *refined intellect. By the side of Jayadeva's spiritualised Radha, Modhu's Radha has a "more terrestrial mould".*

বৈষ্ণব পদাবলীর আধ্যাত্মিকতা মানুষকে যতো আকর্ষণ করেছে, তার লক্ষগুণ বেশী করেছে তার মানবিক প্রেমের চিত্রটি। তাই মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' নিছক মানব-প্রেমের গভীরতার অভিব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও বহু বৈষ্ণব ভক্তকেও আকৃষ্ট করেছিল, তাঁরা তাঁদের চিরপরিচিতা রাধাকেই ব্রজাঙ্গনার মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে। 'ব্রজাঙ্গনা' পড়ে নবদ্বীপ থেকে এক পরম বৈষ্ণব ব্রজাঙ্গনার কবিকে দেখবার জন্যে কলকাতা ছুটে এসেছিলেন। তিনি কল্পনাও করেন নি যে, মধুসূদন একজন খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী সাহেব-সুবো মানুষ। তিনি খোঁজ ক'রে অবশেষে খিদিরপুরে মধুসূদনের বাসায় উপস্থিত হলেন। বাড়িতে ঢুকে দেখলেন, একজন কোট-প্যাণ্ট-পরা কালো মোটা-সোটা লোক একটি চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর কাগজে কি লিখছেন। বাড়ি ভুল হয়েছে ভেবে তিনি শশব্যস্ত হয়ে যখন চলে যাচ্ছেন, তখন মধুসূদন তাঁকে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, "আপনি কাকে খুঁজছেন?"

বৈষ্ণব বললেন, "এটা কি ৬নং জেম্‌স্ লেন? এখানে কি মধুসূদন দত্ত থাকতেন?"

"কেন, তাঁকে আপনার কি দরকার?"

আমি তাঁর "ব্রজাঙ্গনা" পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। তাই একবার সেই বৈষ্ণবচূড়ামণি পরম ভক্তকে দেখবার জন্যে নবদ্বীপ থেকে কলকাতায় ছুটে এসেছি।"

মধুসূদন বললেন, "আমারই নাম মধুসূদন।"

বৈষ্ণব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি কিছুক্ষণ মধুসূদনের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আবেগভরে বললেন, "তুমি বাবা, শাপভ্রষ্ট।"

মধুসূদন তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য রচনা ক'রে শ্রীরামপুরে বিখ্যাত জমিদার গোপীকৃষ্ণ গোস্বামীকে দেখতে দেন। গোপীকৃষ্ণ ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তিনি ব্রজাঙ্গনা পড়ে এতোই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি

মধুসূদনের বিধর্মিতা এবং সাহেবিয়ানা সত্ত্বেও মধুসূদনের একান্ত অনুরাগী হয়ে ওঠেন। তাঁদের ছুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। গোপীকৃষ্ণের পুত্র রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: "My father was very well-affected towards poet M. Dutt. He used to come to our house very often when he lived with his family in Chandernagar." হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো পণ্ডিত ব্যক্তি-ও 'ব্রজাঙ্গনা' প'ড়ে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, "তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' গীতিকাব্যে জয়দেবের সমস্থানীয়।" নগেন্দ্রনাথ সোম লিখেছেন: "মধুসূদন তাঁহার এই ক্ষুদ্র গীতিকাব্যখানিকে এতই ভালবাসিতেন যে, সময়ে সময়ে মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, 'মেঘনাদবধ কাব্য অপেক্ষা আমার "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" ভাল।' মিল্টনও তাঁহার 'Paradise Lost' অপেক্ষা 'L'Allegro' গীতিকাব্যকেই উৎকৃষ্ট বলিতেন। পুত্রাপেক্ষা কন্যার প্রতি জনকের স্নেহ যে সমধিক হইয়া থাকে, এই সকল উক্তিই তাহার উদাহরণ।"

'তিলোত্তমা' ও 'ব্রজাঙ্গনা' রচনার পরে কাব্য ও গীতিকাব্য রচনায় তাঁর অসাধারণ প্রতিভা প্রমাণিত হ'লেও মধুসূদন তাঁর প্রথম প্রেম নাটককে ভুলতে পারেন নি। 'সুভদ্রা-হরণ' ছিল তাঁর নিজের ভাষায় a dramatic poem বা নাট্যকাব্য। তা মঞ্চোপযোগী হবে না জেনে তিনি তার রচনা থেকে বিরত থাকেন এবং অন্য কোনও নাটক রচনার কথা ভাবতে থাকেন। তিনি মাদ্রাজে যখন ছিলেন, তখন ইংরেজীতে সুলতানা রিজিয়ার ইতিহাস অবলম্বনে একটি নাটকের কয়েক অঙ্ক লিখেছিলেন। এখন আবার সেই কাহিনীই তাঁকে আকর্ষণ করলো। তিনি 'রিজিয়া' নামে একটি নাটক লেখার সংকল্প ক'রে তার কাহিনীর একটি সার-সংক্ষেপ সেযুগের বিখ্যাত নট কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলির কাছে পাঠালেন। কেবল অভিনেতারূপেই নয়, নাট্য-

সমালোচক রূপেও কেশব গাঙ্গুলিকে মধুসূদন অসাধারণ শ্রদ্ধা করতেন। তাঁকে তিনি শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাটকের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা গ্যারিকের নাম অনুসারে 'গ্যারিক' ব'লে সম্বোধন করতেন। একটি পত্রে তিনি তাঁকে O thou avatar of the Roman Roscious and the English Garric! ব'লে সম্বোধন করেছিলেন। কেশববাবু মধুসূদনের 'রিজিয়া' নাটকের সার-সংক্ষেপ পেয়ে তা তিনি যতীন্দ্রমোহনকে পড়তে দিলেন এবং বেলগাছিয়া নাট্যশালার পরিচালক রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের সঙ্গে আলোচনা করতে বললেন। যতীন্দ্রমোহন ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র দুজনেই বললেন, এই সার-সংক্ষেপ থেকে তাঁরা এই নাটকের ভালো-মন্দ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে পারছেন না। তাছাড়া, তাঁদের মতে, বাংলা নাটকে ঐসব মুসলমানী নাম সম্ভবত শ্রোতাদের কানে ভালো লাগবে না। সুতরাং 'শর্মিষ্ঠা' ও 'তিলোত্তমা'র রচয়িতার পক্ষে এ ধরনের কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা উপযুক্ত হবে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া, এই নাটকের চরিত্রের সংখ্যাও অত্যধিক, নারী চরিত্রও খুব বেশী, যা মঞ্চস্থ করবার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করবে। যতীন্দ্রমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্রের এই অভিমত কেশববাবু মধুসূদনকে একটি পত্রে জানালেন। ঐ পত্রের শেষে তিনি লিখলেন: "By the bye, a thought strikes me. Can't we cull out a subject from the history of the Rajputs? I believe the field is pretty extensive and may yield innumerable hints for the imagination of a writer like yourself."

'রিজিয়া' নাটকের সার-সংক্ষেপ দেখে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে ঐ নাটক লিখতে উৎসাহিত না করায় তিনি ঐ নাটক লেখা থেকে বিরত হলেন।

সম্ভবতঃ 'রিজিয়া' নাটকের সার-সংক্ষেপ পাঠাবার আগেই মধুসূদন তাঁর অমর কাব্য মেঘনাদ রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন। কারণ, ৪ঠা এপ্রিল (১৮৬০) তারিখের চিঠিতে তিনি "মেঘনাদবধ-

কাব্য" রচনারম্ভের কথা রাজনারায়ণ বসুকে জানিয়েছিলেন এবং ঐ চিঠির সঙ্গে 'মেঘনাদবধকাব্যের' প্রথম সর্গের প্রস্তাবনা অংশ যাতে তিনি বাগ্‌দেবীকে ও কল্পনা দেবীকে আবির্ভূত হওয়ার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছেন, তা-ও পাঠিয়েছিলেন। "I enclose the invocation of my "মেঘনাদ"—you must tell me what you think of it. A friend here, a good judge of poetry, has pronounced it magnificent." ১৫ই মে তারিখের চিঠিতে তিনি রাজনারায়ণকে লেখেন: "I am going on with Meghanad by fits and starts. Perhaps the poem will be finished by the end of the year."

"মেঘনাদবধকাব্য" রচনায় ব্যাপৃত থাকলেও ঐ সময় নাটক তাঁর মন থেকে দূরে যায় নি। মধুসূদন কেবল বহুমুখী প্রতিভার অধিকারীই ছিলেন না। তাঁর মন একই সঙ্গে বহু বিষয়ে বহু চিন্তায় বহু কল্পনায় বহু অনুভূতিতে সক্রিয় থাকতো। যে সময়ে তিনি হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিল্‌টনের আদর্শে মহাকাব্য রচনায় ব্যস্ত, সে সময়েও তিনি বাংলা নাটক ও নাট্যশালাকে কিভাবে পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শে সঞ্জীবিত ক'রে তোলা যায়, সে চিন্তাতেও ছিলেন অধীর। তাই ১৫ই মে (১৮৬০) তারিখের ঐ পত্রেই তিনি রাজনারায়ণকে জানান যে, তাঁর 'পদ্মাবতী' নাটকের এককপি তিনি রাজনারায়ণকে পাঠাবার জন্যে তাঁর প্রকাশককে বলেছেন এবং তিনি ঐ নাটক সম্পর্কে রাজনারায়ণের মতামত কি তা জানতে চান। তারপর তিনি জানান, তিনি ঐ নাটকে এ দেশীয় নাট্যাদর্শ অনুসরণ করলেও অতঃপর তিনি পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শই অনুসরণ করবেন এবং পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ অনুসরণের দ্বারাই এদেশে প্রকৃত জাতীয় রঙ্গালয় স্থাপন সম্ভব হবে।

If I should live to write other dramas, you

may rest assured, I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya Darpan. I shall took to the great dramatists of Europe for models. That would be founding a real National Theatre.

রাজনারায়ণ বসুকে লেখা তাঁর ৩রা আগস্ট (১৮৬০) তারিখের পত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, ঐ সময়ে তাঁর মেঘনাদবধের প্রথম সর্গ লেখা সমাপ্ত হয়ে গেছে, এবং তিনি প্রথম সর্গের পাণ্ডুলিপি কপি করিয়ে রাজনারায়ণকে পাঠাচ্ছেন এবং রাজনারায়ণের মতামত আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাচ্ছেন। ঐ সময়ে মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গের রচনা কিছুটা—প্রায় দু শ লাইনের মতো এগিয়েছে।

Here is the First Book of the Meghanada. I hope you will find the writing legible. You need not return the sheets. I have another copy by me. I need scarcely say that I shall look out with feverish anxiety to hear from you,······

I sent you a few lines the other day, as the exordium of the second Book of Meghanada. I have since changed my mind, and the second Book will be quite a different thing from what you probably expect.······

মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পর পুনরায় নাটক লেখায় মনোনিবেশ করেন। রিজিয়ায় তিনি মুসলিম যুগের ইতিহাসকে নাট্যবস্তু করতে চেয়েছিলেন। মুসলমানী নাম অনভ্যস্ত শ্রোতা বা দর্শকদের কাছে পীড়াদায়ক হবে এই আশঙ্কা ক'রে তাঁর নাট্যজগতের বন্ধুরা তাঁকে নিরুৎসাহ করেছিলেন। তাঁদের

আশঙ্কা যে অমূলক, পরবর্তীকালের বহু ঐতিহাসিক নাটক তার প্রমাণ। তবু বন্ধুদের আশঙ্কাকেই শিরোধার্য ক'রে তিনি এখন হিন্দু ইতিহাস থেকে কাহিনী নিতে সংকল্প করলেন। এ বিষয়ে তিনি কেশববাবুর পরামর্শ মতো রাজপুতানার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁর নাটকের আখ্যান বস্তুর সন্ধান করতে লাগলেন। "For two nights I sat up for hours pouring over the tremendous pages of Tod and about 1. A. M. last Saturday, the Muses smiled. মধুসূদন রাজপুতানার শেষের দিকের ইতিবৃত্ত থেকে 'কৃষ্ণকুমারীর' কাহিনীকে তাঁর নাটকের জন্যে মনোনীত ক'রে ঐ নাটকের সার-সংক্ষেপ যতীন্দ্রমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র ও কেশববাবুর দেখার জন্যে পাঠালেন। "What a romantic Tragedy it will make!" তিনি কেশববাবুকে জানালেন, "If you like the plot, I promise you the play in six weeks, if not earlier."

পরের চিঠিতে মধুসূদন কেশববাবুকে জানালেন: তিনি মেঘনাদের মৃত্যু সম্পর্কে একটি কাব্যরচনায় ব্যস্ত আছেন। আগামী বছর জানুয়ারি মাসে তিনি আইন পরীক্ষা দিতে চান, এ বৎসর তো প্রায় শেষ হয়ে এলো, সেজন্যে পড়াশুনোর প্রয়োজন, তবু যদি ছোট রাজা সত্যই বেলগাছিয়া নাট্যশালাকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্যে নূতন নাটক চান, তবে তিনি সব ফেলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নাটক লিখে দেবেন। ঐ চিঠিতে তিনি লিখলেন: "But if the Chota Rajah really makes up his mind to reopen his theatre, I am his man! This I wish, you would ascertain next Sunday, when I suppose you will have an opportunity of seeing both of him and Jotindra. Ask the Chota Rajah candidly what his real intentions are. There is no use writing a play

and then leaving it to rot in my desk." কৃষ্ণকুমারীরও 'পদ্মাবতী' নাটকের দশা হয়, মধুসূদন তা চাইতেন না।

সম্ভবতঃ বেলগাছিয়া নাট্যশালার বন্ধুরা মধুসূদনকে তাঁর নূতন নাটক মঞ্চস্থ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাই মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকখানি দ্রুত শেষ করেন। বইখানি লিখতে তাঁর মাত্র একমাস সময় লেগেছিল—১৮৬০ সালের ৬ই আগস্ট থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। কেশব গাঙ্গুলীকে লেখা একটি পত্রে তিনি লেখেন :

You must not fancy that I have been idle, Kissen Cumari was finished two days ago. Begun 6th August finished 7th September—rather quick work, old fellow ! But in these days of steam and other stimulating powers, a man must keep pace with the time !

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে মধুসূদন পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শকেই অনুসরণ করেন। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যাদর্শে কেবল মিলনান্ত নাটকই লেখা হ'তো, কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী' ছিল বিয়োগান্ত নাটক বা ট্র্যাজিডি। অনেকে 'কৃষ্ণকুমারীকে' বাংলা ভাষার প্রথম বিয়োগান্ত নাটক বলেছেন। তবে এর আগেই দুজন নাট্যকার দুটি বিয়োগান্ত নাটক বাংলা ভাষায় লিখেছিলেন—বিয়োগান্ত 'কীর্তিবিলাস নাটক' লিখেছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত এবং বিয়োগান্ত 'বিধবাবিবাহ নাটক' লিখেছিলেন উমেশচন্দ্র মিত্র। নাটক দুটি যথাক্রমে ১৮৫২ ও ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' যে প্রথম বিয়োগান্ত ঐতিহাসিক নাটক, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ঐ সময়ে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' কাব্য খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কেশববাবু যখন রাজপুতদের বৃত্তান্ত থেকে মধুসূদনকে তাঁর নাটকের কাহিনী সংগ্রহ করতে পরামর্শ দিলেন, তখন মধুসূদন তাই করলেন। উদয়পুরের রাণা

প্রতাপাদিত্যের বংশধর রাণা ভীমসিংহের কন্যা ছিলেন কৃষ্ণকুমারী। কৃষ্ণকুমারীর রূপে গুণে আকৃষ্ট হয়ে জয়পুরের লম্পট প্রকৃতির রাজা জগৎসিংহ এবং মরুদেশের রাজা মানসিংহ তাঁর পাণিপ্রার্থী হলেন। উভয়েই জানালেন, কৃষ্ণকুমারীকে তাঁর চাই, নইলে তিনি উদয়পুর ধ্বংস করবেন। ভীম সিংহ উভয়সংকটে পড়লেন। উদয়পুরের সে পূর্ব পরাক্রম এখন ছিল না। সুতরাং জয়পুরের রাজা বা মরুদেশের রাজা কাউকেই প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। কন্যা কৃষ্ণকুমারীই সকল অশান্তির মূল; তাই কৃষ্ণকুমারীকেই তিনি হত্যার আদেশ দিলেন। কৃষ্ণকুমারী স্বেচ্ছায় নিজের জীবন আহুতি দিয়ে সকল সমস্যার নিরসন করলেন। ইতিহাসে রয়েছে, কৃষ্ণা বংশমর্যাদা ও সকলের সুখ-শান্তি রক্ষার জন্য বিষপানে আত্মহত্যা করেছিলেন। মধুসূদন নাটকীয়তা উৎপাদনের জন্যে অস্ত্রাঘাতে কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু ঘটিয়েছেন। মধুসূদন এই নাটকে ঘটনাবিন্যাস, চরিত্র-চিত্রণ, নাটকীয়তা-সৃষ্টি, সকল কিছুই অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে করেছিলেন। এই নাটকে মধুসূদন পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ অনুসরণ করলেও সংস্কৃত নাটকের প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেননি। এই নাটকে মদনিকা ও বিলাসবতীর চরিত্র সৃষ্টিতে বিশাখ দত্তের মৃচ্ছকটিক নাটকের মদনিকা ও বসন্তসেনার ছায়া সহজেই চোখে পড়ে।

কৃষ্ণকুমারীই মধুসূদনের শেষ নাটক। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকও শেষ পর্যন্ত বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হ'লো না। 'পদ্মাবতী', 'একেই কি বলে সভ্যতা?', 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ', নাটক ও প্রহসনগুলির মতোই 'কৃষ্ণকুমারী' মধুসূদনের আশঙ্কাকে সুপ্রমাণিত ক'রে ডেস্কে পচতে লাগলো।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। নাটকটি প্রকাশনের ব্যয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহনই দিয়েছিলেন। মধুসূদন বইখানি লিখেই উৎসর্গ করেন কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলির নামে। ঐ সময়ে একটি পত্রে তিনি কেশববাবুকে লেখেন: "Here is

Kissen Cumari. I dedicate her to the first actor of the age···" ঐ পত্রের শেষে তিনি লিখেছিলেন: "And now work away like a jolly fellow, and sèt Jotinder Baboo to write the songs." সম্ভবতঃ এই পত্রাংশের উপর নির্ভর ক'রে কোনও কোনও জীবনীকার লিখেছেন যে, কৃষ্ণকুমারী নাটকের গানগুলি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের লেখা। কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের উৎসর্গপত্রে (মঙ্গলাচরণে) মধুসূদন লিখেছেন, "এ নাটকেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পদ্য রচনা ত্যাগ করিয়াছি।" সুতরাং ও নাটকের কিছু গান যে মধুসূদন লিখেছিলেন, তা নিঃসন্দেহ। নগেন্দ্রনাথ সোম যে লিখেছেন, "মাত্র দুইটি সঙ্গীত যতীন্দ্রমোহন রচনা করিয়াছিলেন", তা সত্য বলেই মনে হয়।

বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনীত না হ'লেও কয়েক বছর পরে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি শোভাবাজারের প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি সর্বপ্রথম এই নাটক মঞ্চস্থ করেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়িতেও এই নাটক অভিনীত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ অভিনয়ে কৃষ্ণকুমারীর মা অহল্যাবাঈয়ের ভূমিকায় নেমেছিলেন। তারপর মধুসূদনের মৃত্যুর কিছু পূর্বে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি কলকাতায় প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ন্যাশন্যাল থিয়েটারে 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনীত হয়। দীর্ঘকাল মধুসূদন যে জাতীয় রঙ্গমঞ্চের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শে রচিত নাটক যে রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করবে ব'লে মধুসূদনের স্থির বিশ্বাস ছিল, মধুসূদনের জীবদ্দশাতেই সেই জাতীয় রঙ্গমঞ্চে কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় একটি স্মরণীয় ঘটনা। ভীমসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এই ছিল তাঁর প্রথম আবির্ভাব।

মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনা শেষ ক'রেই আবার মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কেশববাবুকে লেখা পূর্বোক্ত পত্রেই

তিনি লেখেন: "Don't depend upon me, for I am going to plung deep into heroic poetry again."

মধুসূদন সম্পর্কে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তিনি একই সঙ্গে তাঁর একাধিক পুস্তকের কিছু কিছু অংশ তাঁর কলমচিদের ব'লে যেতেন, এবং তাঁরা তা টুকে নিতেন। এই প্রবাদ বিশ্বাসযোগ্য নয়। মধুসূদন বিভিন্ন ধরনের পুস্তক প্রায় একই সঙ্গে বা পর পর দ্রুত রচনা করায় এরকম জনশ্রুতির সৃষ্টি হয়েছিল। মধুসূদনের হাতের লেখা ভালো ছিল না, তাই, এবং তাঁর রচনার যাতে কোনরকম বর্ণাশুদ্ধি না থাকে সেজন্যেও তিনি পণ্ডিতদের দিয়ে তাঁর রচনাগুলিকে নকল করাতেন। মধুসূদনের দ্রুত সৃজনশীল ও বহুমুখী আশ্চর্য প্রতিভা এই ধরনের জনশ্রুতি সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

৬ই আগস্ট (১৮৬০) থেকে মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। ৩রা আগস্টের আগেই তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ যে শেষ হয়েছিল, তা আমরা ১৮৬০ সালের ৩রা আগস্ট তারিখে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা তাঁর একটি পত্র থেকে জানতে পারি। ঐ পত্র থেকে এ-ও জানতে পারি যে, মধুসূদন 'মেঘনাদবধকাব্যকে' ৯ সর্গ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে ইচ্ছুক।

> I am so happy you like my Meghanad. I mean to extend it to 9 সর্গs. I have finished the second and as soon as I can get a copy made, you shall have it. I hope the second Book will enchant you! The name is "বরুণানী", but I have turned out one syllable. To my ears this word is not half so musical as বারুণী, and don't know why I should bother myself about Sanskrit rules.

মধুসূদন তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচনা করবার পরে রাজনারায়ণ

তাঁকে "সিংহলবিজয়" নিয়ে একটি জাতীয় মহাকাব্য রচনা করতে বলেছিলেন। রাঢ়ের বিজয়সিংহ কিভাবে দেশত্যাগী হয়ে সিংহল জয় করেছিলেন, বাঙ্গালীর এই বীরত্বগাথা যে বাঙ্গালীর জাতীয় মহাকাব্যের একটি উপযুক্ত বিষয়, সে বিষয়ে রাজনারায়ণ বা মধুসূদন কারো সন্দেহ ছিল না। মধুসূদন তাঁর কাব্য রচনার জন্য সিংহলকেই বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু যে সিংহল ছিল বিজয় সিংহের পদার্পণের ও বিজয়ের বহু আগের সিংহল, যার নাম ছিল লঙ্কা। বিজয় সিংহের লঙ্কা বিজয়ের চেয়ে রামচন্দ্রের লঙ্কা অভিযানের কাহিনী মধুসূদনকে অনেক বেশী আকৃষ্ট করতো। তাই রামচন্দ্র কর্তৃক আক্রান্ত লঙ্কার কাহিনীকেই তিনি তাঁর কাব্যের জন্যে বেছে নিলেন এবং বাঙ্গালীর অপূর্ব বীরত্ব গাথা রচনা তিনি ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখলেন। রাজনারায়ণবাবু সিংহল বিজয়ের (লঙ্কাবিজয়ের) কাহিনী নিয়ে মহাকাব্য লিখতে বলায় লঙ্কা নিয়েই কাব্য রচনার কথা মধুসূদনের মনে সম্ভবত জেগেছিল। তখন তিনি প্রথমে সম্ভবতঃ মেঘনাদবধের ঘটনা অবলম্বন ক'রে তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের মতোই তিন-চার সর্গে সমাপ্ত একটি কাব্য রচনা করতে চেয়েছিলেন। অন্ততঃ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল তারিখে রাজ-নারায়ণ বসুকে লেখা পত্র থেকে তা-ই মনে হয়।

> The subject you propose for a national Epic [সিংহলবিজয়] is good—very good indeed. But I don't think I have as yet acquired a sufficient mastery over the 'Art of poetry' to do it justice. So you must wait a few years more. In the meantime I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit. Do not be frightened, my dear fellow, I won't trouble my readers with Vir Ras (বীর রস). Let me write a few Epiclings and thus acquire a pucca fist.……

কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্য রচনা শুরু করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মধুসূদন দেখলেন, ইতিমধ্যেই তিনি a sufficient mastery over the Art of poetry এবং a pucca fist লাভ করেছেন। তাই কয়েকটি Epiclings রচনার পরিবর্তে তিনি রীতিমতো একটি Epic বা মহাকাব্য রচনা করতে সংকল্প করলেন। কিছুটা রচনার পরেই তিনি তাঁর কাব্যকে নয়টি সর্গে বিস্তৃত করতে মনঃস্থ করলেন। তিনি 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনার পরে আবার যখন মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় নিমগ্ন হলেন, তখন তাঁর মেঘনাদবধকে যতদূর সম্ভব একটি মহাকাব্যে পরিণত করতে সচেষ্ট হলেন এবং দশটি সর্গে শেষ করবেন বলে স্থির করলেন। ঐ সময়ে রাজনারায়ণ বসুকে তিনি যে পত্র লেখেন, তাতে তিনি জানান :

I have resumed Meghanad—and am working away at the Third Book. If spared, I intend to lengthen the poem to ten Books and make it as complete an epic as can be. The subject is truly heroic ; only the Monkeys spoil the joke—but I shall look to them.

সেই সঙ্গে তিনি ঐ পত্রে একথাও জানালেন যে, প্রথম পাঁচ সর্গ রচনা হয়ে গেলেই তিনি পুরো কাব্যটি শেষ না হওয়ার আগেই ঐ কাব্যের প্রথম খণ্ড ছেপে প্রকাশ ক'রে ফেলতে চান। কারণ, পুরো কাব্যখানি দেওয়ার পূর্বে তিনি জনসাধারণকে এই কাব্যের কিছু আস্বাদ দিতে ইচ্ছুক। পুস্তকটি প্রকাশের অসুবিধাও নেই। কারণ, দিগম্বর মিত্র (পরে রাজা) ছাপার খরচ দিতে রাজী হয়েছেন।

মধুসূদনের শিল্পীমানস ছিল বড়োই বিচিত্র। তিনি যখন মহাকাব্য রচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁর মন ক্ষুদ্রতম কবিতা রচনার কথাও চিন্তা করছিল। ঐ পত্রেই তিনি রাজনারায়ণ বসুকে জানান যে, তিনি বাংলা ভাষায় সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতাও প্রবর্তন করতে চান।

ইংরেজী সাহিত্যে শেক্‌স্‌পীয়র ও মিল্‌টন চতুর্দশপদী কবিতা রচনা ক'রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। নাটকের ক্ষেত্রে শেক্‌স্‌পীয়র যেমন ছিলেন মধুসূদনের আদর্শ, তেমনি মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে মিল্‌টনও ছিলেন মধুসূদনের আদর্শ। এঁরা দুজনেই সনেট রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাই তাঁদের মতোই মধুসূদনও চতুর্দশপদী কবিতা রচনা ক'রে তাঁদেরই পথ অনুসরণ করতে চাইলেন। তিনি রাজনারায়ণবাবুকে বাংলা ভাষায় সনেট প্রবর্তনের ইচ্ছার কথা কেবল জানালেন না, 'কবি-মাতৃভাষা' নামে একটি সনেট লিখেও পাঠালেন। পরে ঐ সনেটটি পরিবর্তিত আকারে চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে 'বঙ্গভাষা' নামে স্থান পেয়েছে।

রাজনারায়ণবাবুকে পাঠানো সনেটটি নিচে দেওয়া হ'লো :

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য-রতন
অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্ট দেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুললক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধনপতি?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে?

শেক্‌স্‌পীয়র ও মিল্‌টনের মতোই ওয়ার্ডওয়ার্থ-ও সনেট রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ওয়ার্ডওয়ার্থ-ও ছিলেন মধুসূদনের অন্যতম প্রিয় কবি। মধুসূদন রাজনারায়ণবাবুকে ঐ পত্রে লিখেছিলেন:

I don't think R.—[মধুসূদন কবি রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের কথাই বলছেন] either reads or can appreciate Milton ; otherwise he would not have made those remarks in the concluding portion of the article. He reads Byron, Scott and Moor, very nice poets in their way no doubt, by no means of the highest School of poetry, except, perhaps, Byron, now and then. I like Wordsworth better.

রাজনারায়ণ বসু মাইকেল মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুকে দেওঘর থেকে বৃদ্ধ বয়সে লেখা পত্রে লিখেছিলেন : "একদিন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে আমরা কয়েকজন বন্ধু বসিয়া আছি, সেই সময় তিনি (মধুসূদন) Wordsworth's Sonnet in praise of the Sonnet এমন করিয়া আবৃত্তি করিলেন যে, আমরা বিমোহিত হইলাম।" এটি মধুসূদনের বিলেত থেকে ফিরে আসবার ও চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনার পরের ঘটনা। যাই হ'ক, মেঘনাদবধ-কাব্য রচনার সময় থেকেই বাংলা ভাষায় সনেট প্রবর্তনের সংকল্পও মধুসূদনের মাথায় বাসা বেঁধেছিল। আগে তিনি ইংরেজী ভাষায় কিছু সনেট অবশ্য লিখেছিলেন। কিন্তু 'কবি-মাতৃভাষা' বাংলায় তাঁর প্রথম সনেট এবং এটি বাংলা ভাষাতেও প্রথম সনেট।

'মেঘনাদবধ' কাব্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে কবিমানসে মহাকাব্যের রূপ নিলো। ঐ সময়ে চতুর্দশপদী কবিতা রচনার কথা কবির মনে এলেও এখন তিনি মহাকাব্য রচনাতেই নিমগ্ন হয়ে রইলেন। তিনি ১৮৬০ সাল শেষ হওয়ার আগেই মেঘনাদবধ-কাব্যের প্রথম পাঁচ সর্গ শেষ ক'রে ফেলেছিলেন। ঐ কাব্য দ্রুতগতিতে মুদ্রিত হ'লো এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'লো। মধুসূদন 'মেঘনাদবধকাব্য' দিগম্বর মিত্রের নামেই উৎসর্গ করেন। তিনি ঐ উৎসর্গপত্রে (মঙ্গলাচরণ) লেখেন :

যখন আমি "তিলোত্তমাসম্ভব" নামক কাব্য প্রচার করি, তখন আমার এমন প্রত্যাশা ছিল না, যে এ অমিত্রাক্ষর ছন্দ এদেশে ত্বরায় আদরণীয় হইয়া উঠিবেক; কিন্তু এখন সে বিষয়ে আমার কোন সংশয়ই নাই। এ বীজ অবসরকালেই সংক্ষেত্রে সংরোপিত হইয়াছে। বীরকেশরী মেঘনাদ, সুরসুন্দরী তিলোত্তমার ন্যায়, পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হইলে, আমি পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুধীসমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'লো। সুধীসমাজ একবাক্যে মধুসূদনকে এ যুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ব'লে ঘোষণা করলেন। তাঁরা একটি অভিনব কাজও করলেন। এ পর্যন্ত কবিকে কখনও সংবর্ধনা-সভার আয়োজন ক'রে সম্মানিত করা হয়নি। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'বিদ্যোৎবাহিনী সভার' পক্ষ থেকে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সন্ধ্যায় এই সংম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করলেন। এই সভায় বাংলাদেশের বহু বিদ্যোৎসাহী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন। সভার পক্ষ থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ একটি অভিনন্দনপত্র পড়লেন এবং একটি রৌপ্যনির্মিত সুরম্য পানপাত্র উপহার দিলেন। অভিনন্দনে বলা হ'লো:

···আপনি বাঙ্গালা ভাষায় যে অনুত্তম অশ্রুতপূর্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাঙ্গালা ভাষার আদিকবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অনুত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময়

পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকসামান্য কার্য্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাসী এক্ষণেও অনেকে আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না……ইত্যাদি।

এই মানপত্রের উত্তরে মধুসূদন সম্ভবত একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। ঐ ভাষণটি ১৮৬১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকটে যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

স্বদেশের উপকার করা মানবজাতির প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র মানুষ দ্বারা যে এদেশের তাদৃশ কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়। তবে গুণানুরাগী আপনারা আমাকে যে এতদূর সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহৃদয়তা।

বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়। ভগবতী বসুমতী সেই জল প্রাপ্ত যাদৃশ উর্ব্বরতরা হয়, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা দ্বারা এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য।

আমি বক্তৃতাবিষয়ে নিপুণতাবিহীন। সুতরাং আপনার এ প্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি

যাবজ্জীবন আপনার এবং এই সামাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাকি।

'মেঘনাদবধ কাব্য' কেবল সুধী সমাজেই সমাদৃত হ'লো না। তা সাধারণ পাঠকের কাছেও জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনাকালে "Fit audience find—Tho' few," তাঁর এই আদর্শের অর্থ সম্ভবত ছিল পণ্ডিতসমাজ। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্য প্রথম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই কাব্য যে সাধারণ পাঠকসমাজেও কতোখানি সমাদৃত হয়েছে, মধুসূদন ব্যক্তিগত একটি ঘটনায় তার পরিচয় পেলেন। তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি চিঠিতে ঘটনাটির বর্ণনা নিজেই দিয়েছেন।

তিনি একদিন কোনও কাজে চীনা বাজারে গিয়েছিলেন। সেখানে দেখলেন একজন দোকানদার দোকানের সামনে বসে একমনে মেঘনাদবধ পড়ছে। কৌতূহলী হয়ে মধুসূদন দোকানে ঢুকে দোকানদারকে বললেন, "আপনি কি বই পড়ছেন?"

দোকানদার বললেন, "আজ্ঞে, এ একখানি নূতন কাব্য।"

মধুসূদন বললেন, "আপনাদের বাংলা ভাষায় তেমন কোন ভালো কবিতাই নেই—তা আবার কাব্য।"

দোকানদার বললেন, "বলেন কি মশায়! এই একখানি কাব্যই তো যে-কোন ভাষাকে গৌরবান্বিত করতে পারে।"

মধুসূদন বললেন, "আচ্ছা, পড়ুন দেখি শুনি আপনার কাব্য।"

দোকানদার মধুসূদনের সাহেবী পোশাক দেখে সন্ধিগ্ধ হয়ে বললেন, "আপনি সম্ভবত এ কবির ভাষা বুঝতে পারবেন না।"

মধুসূদন বললেন, "দেখাই যাক্ না চেষ্টা ক'রে।"

দোকানদার তখন কাব্য থেকে একটি অংশ পড়লেন:

বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে হে রতিরঞ্জন। ইত্যাদি।

খানিকটা প'ড়ে দোকানদার একটু থামলে মধুসূদন তাঁর হাত থেকে

বইখানি নিয়ে কয়েকটি জায়গা নিজে প'ড়ে শোনালেন। তাঁর পড়ার ভঙ্গি, উচ্চারণ ও সুর-লালিত্য দোকানদারকে বিস্ময়াভিভূত ক'রে ফেললো। দোকানদার আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহাশয় কোথায় থাকেন?"

মধুসূদন তাঁকে অস্পষ্ট একটা উত্তর দিয়ে চলে গেলেন। মেঘনাদবধ কাব্য এতোই জনশ্রুতি লাভ করেছিল যে, সেই স্বল্প শিক্ষার যুগেও হাজার কপির একটি সংস্করণ বছর ফুরোবার আগেই ফুরিয়ে গিয়েছিল এবং মধুসূদনের জীবদ্দশায় ছটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

মধুসূদনের একটি পত্র থেকে জানা যায়, ঐ সময়ে রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় মধুসূদনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। রাজনারায়ণ বসু মধুসূদনের এতোই ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, তিনি একটি পত্রে 'গীত-গোবিন্দ' থেকে একটি বাক্য উদ্‌ধৃত করে লিখেছিলেন, কবে তিনি "মধুসূদন-বদন-সরোজ" দেখবেন। রাজনারায়ণবাবু সম্ভবতঃ ১৮৬১ সালের গোড়ার দিকেই কলকাতা এসেছিলেন। তিনি কলকাতায় মধুসূদনের বাসায় এসে দেখলেন, মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যের প্রুফ দেখছেন। তিনি বন্ধুকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রুফ দেখতে বললেন, "My dear Raj, will not this make me immortal?" রাজনারায়ণ বললেন, "তাতে আর সন্দেহ কি?" রাজনারায়ণ লিখেছেন, মধুসূদনের মতো অনেক কবিরাই আত্মশ্লাঘা দোষে দুষ্ট। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মধুসূদনের পত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, দুই বন্ধুর ওই সাক্ষাৎকারের পরই মধুসূদন জ্বরে আক্রান্ত হন এবং ছ-সাত-দিন শয্যাশায়ী ছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্য রচনাকালে তাঁর মানসিক পরিশ্রম কি ধরনের হয়েছিল, তার কিছুটা ইঙ্গিত আমরা ঐ পত্র থেকে পাই। মধুসূদন লিখেছিলেন:

A few hours after we parted, I got a severe attack of fever and was laid up for six or seven

days. It was a struggle whether Meghanad will finish me or I finish Meghanad. Thank Heaven, I have triumphed. He is dead, that is to say, I have finished the Book VI in about 750 lines. It cost me many a tear to kill him…

ঐ পত্রে তিনি বন্ধু রাজনারায়ণকে একথাও জানান যে,

The poem is rising into splendid popularity. Some say it is better than Milton—but that is all bosh—nothing can be better than Milton; many say it licks Kalidasa; I have no objection to that. I don't think it impossible to equal Virgil, Kalidasa and Tasso. Though glorious, still they are mortal poets; Milton is divine.

বিদ্যোৎসাহিনী সভা থেকে সংবর্ধনা পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই, সম্ভবত ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসেই মধুসূদন সপ্তম ও অষ্টম সর্গ শেষ করেন। বিদ্যোৎসাহিনী সভা তাঁকে কিছুদিন পূর্বে ("not long ago") সম্মানিত করেছে, এই সংবাদ জানিয়ে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে যে পত্র লেখেন, তাতে জানান,

I have finished the sixth and seventh Books of Meghanad and am working at the eighth. Mr. Ram is to be conducted through Hell to his father, Dasaratha, like another Æneas.

তিনি ঐ পত্রে এই সংবাদও দেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও মেঘনাদবধ কাব্য পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি নাকি বলেছেন যে, কোন হিন্দু লেখকই মধুসূদনের কাছে দাঁড়াতে পারেন না এবং তাঁর কল্পনা শক্তি যতোদূর যাওয়া সম্ভব, ততোদূর গিয়েছে। পরের চিঠিতে মধুসূদন রাজনারায়ণকে জানান যে, মেঘনাদের দ্বিতীয় খণ্ড ছাপা

হচ্ছে; এখনও তাঁর শেষ (নবম) সর্গ কিছুটা ("a few hundred lines") লিখতে বাকি। তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশিত হবে এবং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ছাপা চলছে। সুতরাং তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত।

মধুসূদন জানান, তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম খণ্ডের চেয়েও ভালো হবে। তিনি লেখেন:

> I believe you will like the second part of Meghanad still better, at least I have been finishing it with more care. I shall not conceal from you that some part of it fills my heart with adulation. I had no idea, my dear fellow, that our mother tongue would place at my disposal such exhaustless materials, and you know I am not a good scholar. The thoughts and images bring out words with themselves,—words that I never thought I knew. Here is a mystery for you.

মধুসূদনের কাব্য রচনা সম্পর্কে আর একটি প্রচলিত প্রবাদ মধুসূদনের নিজের এ উক্তি মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। মধুসূদন তাঁর কাব্যরচনার সময়ে উপযুক্ত শব্দ নির্বাচনের জন্য প্রায়ই পণ্ডিতদের ও অভিধানসমূহের সাহায্য নিতেন, এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। মধুসূদনের কাব্যে দুরূহ শব্দের বহুল প্রয়োগ এই রকম একটি কিংবদন্তীর জন্ম দিয়েছিল মনে হয়। "The thoughts and images bring out words with themselves,—words that I never thought I knew. Here is a mystery for you."—মধুসূদনের এই উক্তিটি লক্ষণীয়।

মধুসূদন যখন মেঘনাদবধের নবম সর্গ রচনা করছিলেন, তখন

তিনি ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডের বাসায় ছিলেন না। এর কিছু আগেই তিনি খিদিরপুরের ৬নং জেম্‌স্‌ লেনের বাসায় চ'লে এসেছিলেন। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের শেষ সর্গ ও "বীরাঙ্গনা কাব্য" খিদিরপুরের এই বাসাতেই রচিত হয়েছিল। তাই এই গৃহটিও ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডের মতোই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৮৬১ সালের ২৯শে আগস্ট তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণকে যে পত্র লেখেন, তাতে তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড সম্পর্কে তাঁর মতামত দ্রুত জানাবার জন্যে লিখেছেন। ঐ পত্রের আগে যে পত্রটি মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন, তার তারিখ জানা যায় নি। ঐ পত্রে মধুসূদন জানাচ্ছেন যে, তিনি রাজনারায়ণের মেদিনীপুরের ঠিকানায় মেঘনাদবধের দ্বিতীয় খণ্ডের এক কপি পাঠিয়েছেন। ঐ দুই পত্রের মধ্যে সময়ের ব্যবধান সম্ভবত খুব বেশি নয়। রাজনারায়ণের মতামতকে মধুসূদন এতোই মূল্য দিতেন যে, বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে এক কপি পাঠিয়েছিলেন ভাবাও অসঙ্গত নয়। তাই মনে হয়, মেঘনাদবধের দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসের গোড়ার দিকেই প্রকাশিত হয়েছিল।

মেঘনাদবধ মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি। 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার পরেও তিনি বলেন, তিনি যদি অনুশীলন করতে থাকেন, তবে দু-চার বছরে এর চেয়েও ভালো কিছু করতে পারবেন। 'তিলোত্তমাসম্ভব' রচনার সময়ে তাঁর ভাষা ও ছন্দের মধ্যে যে দুর্বলতা ছিল, তা মেঘনাদবধে হ্রাস পেয়েছে—তিনি রাজনারায়ণকে এই পার্থক্য লক্ষ্য করতে বলেন। তবু লোকে তাঁকে 'মিল্‌টন' বলছে, 'কালিদাস' বলছে, এইসব প্রশংসা তাঁর কতখানি প্রাপ্য তিনি জানেন না।

I have already heard myself called both "Milton and Kalidas." How far I deserve the

compliment, I cannot say, but it is certainly flattering. I think if I am spared some years, yet, and allowed to go on my own way, I shall do better ; for I want practice. See the difference in language and versification, if in nothing else, between Tilottama and Meghanad.

মধুসূদনের এই আত্মসমালোচনা সত্ত্বেও মেঘনাদবধ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতিগুলির অন্যতম এবং মধুসূদনের অমরত্ব এই কাব্যখানির উপরই নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত। মেঘনাদবধের কাহিনী রামায়ণ থেকে গৃহীত হ'লেও মধুসূদন রামায়ণকে সর্বত্র অনুসরণ করেন নি। এ ধরনের সংযোজন ও পরিবর্তনের অধিকার সকল শ্রেষ্ঠ কবিদেরই আছে। শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলির জন্য প্রচলিত কাহিনী, কিংবদন্তী ও ইতিবৃত্তের কঙ্কালকে গ্রহণ করলেও তাতে তিনি আপন সৃজনী শক্তি দিয়ে রক্ত মাংসপেশী মেদ মজ্জা স্নায়ু ও লাবণ্য সঞ্চার করেছিলেন। রামায়ণের কাহিনী নিয়েও যেসব কাব্য নাটক পূর্বে রচিত হয়েছিল, সেগুলিতেও ভারতীয় কবিরা নিজ নিজ উদ্ভাবনী শক্তি অনুসারে সংযোজন ও পরিবর্তন করেছিলেন। কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশে' ভবভূতি তাঁর 'উত্তররামচরিতে', এমন কি কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণেও এই ধরনের সংযোজন ও পরিবর্তন করতে কুণ্ঠিত হন নি।

মধুসূদন তাঁর মেঘনাদবধের উপকরণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু কবি থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এদেশীয় কবিদের থেকে যা নিয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশী নিয়েছিলেন পাশ্চাত্য কবিদের রচনা থেকে। তিনি প্রায়ই বলতেন, "My writings are three-fourth Greek." মেঘনাদবধ কাব্য রচনাকালে তিনি একখানি পত্রে রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন :

It is my ambition to engraft exquisite graces of Greek mythology in the present poem. I

mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the poem. I shall not borrow Greek stories, but write, rather try to write, as a Greek would have done.

মধুসূদন গ্রীক কাহিনীকে যে একেবারে বর্জন করতে পেরেছিলেন, তা নয়। মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গ গ্রীক পুরাণের কাহিনীর আদর্শেই রচিত হয়েছিল। রামায়ণে দেবতারা কোথাও প্রত্যক্ষভাবে রামচন্দ্রের সহায়তা করেননি। কিন্তু হোমারের ইলিয়াডে দেবদেবীরা মানবদের বিবদমান দুই দলেরই সহায়তা করেছিলেন। তাই দ্বিতীয় সর্গে মধুসূদন হর-পার্বতীর সাক্ষাৎকারের যে দৃশ্য এঁকেছেন, তা ইলিয়াডের কাহিনীর আদর্শেই এঁকেছেন। তিনি এই সর্গ সম্পর্কে নিজেই রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন :

You will no doubt, be reminded of the fourteenth Iliad and I am not ashamed to say that I have intentionally imitated it—Juno's visit to Jupiter on Mount Ida.

মধুসূদন গ্রীক, রোমক, ইতালীয় কবিদের কাছ থেকে কোন কাহিনীর ছায়া গ্রহণ করলেও তাকে তিনি ভারতীয় রূপ দিতে বা অন্ততঃপক্ষে ভারতীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। যেমন মেঘনাদবধের এই দ্বিতীয় সর্গে জুপিটার ও জুনোর মিলনের সঙ্গে তিনি কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গের কাহিনীকে মিশ্রিত করতে চেষ্টা করেছেন। প্রমীলা চরিত্রে তিনি ভার্জিলের 'ইনিয়াড' কাব্যের ক্যামিলা, টাসোর 'জেরুজালেম ডেলিভার্ড' কাব্যের ক্লারিন্‌ডা, হোমারের ইলিয়াড কাব্যের অ্যাথিনি প্রভৃতির ছায়াপাত

হ'লেও মধুসূদন তাকে তাঁর প্রিয় কবি কাশীরাম দাসের মহাভারতের প্রমীলা চরিত্রের আদর্শে গঠন করতে চেষ্টা করেছেন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বহু কবিই স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা দিয়েছেন এবং স্বর্গ ও নরক দর্শন তাঁদের একটি অতি প্রিয় বিষয়। প্রাচ্যদেশীয় মহাকাব্যে যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন একটি বিখ্যাত ঘটনা। স্বর্গ ও নরকের বর্ণনায় পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে ভার্জিল, দান্তে, মিল্‌টন প্রভৃতি মহাকবিরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধুসূদন তাঁর মহাকাব্যে এইসব পাশ্চাত্য কবির আদর্শে স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা দানের সুযোগ ক'রে নিয়েছেন শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের পুনর্জীবন প্রাপ্তির উপায় সন্ধানে রামচন্দ্রের প্রেত-নগরীতে গিয়ে পিতা দশরথের সঙ্গে সাক্ষাতের মধ্যে। বলাই বাহুল্য, রামায়ণে ওই ধরনের কোন ঘটনা নেই। মেঘনাদবধের অষ্টম সর্গে কাহিনীর এই অংশ মধুসূদন প্রধানতঃ ভার্জিলের 'ইনিয়াড' মহাকাব্য থেকে নিয়েছিলেন। শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের শোকে রামকে অত্যন্ত শোকাকুল দেখে দেবী দুর্গার হৃদয় করুণার্দ্র হ'লো। দেবী দুর্গার অনুরোধে মহাদেব মায়াদেবীকে লঙ্কাপুরীতে পাঠালেন। মায়াদেবী রামকে প্রেতপুরীতে নিয়ে গিয়ে পিতা দশরথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করালেন। রাম দশরথের মুখে লক্ষ্মণের পুনর্জীবন প্রাপ্তির উপায় শুনলেন। এই ঘটনা রামায়ণবহির্ভূত। মধুসূদন 'ইনিয়াড' মহাকাব্যের অষ্টম সর্গের অনুকরণে এই কাহিনী রচনা করেছেন। বীর ইনিআসের মতোই রাম গভীর সুড়ঙ্গপথে প্রেতপুরীতে অবতরণ করেছিলেন। ইনিয়াডে প্রেতপুরীর বাইরে ভীষণদর্শন যেসব মূর্তির কল্পনা করা হয়েছে, মধুসূদন তাদেরই অনুকরণে তাঁর প্রেতপুরীর বাইরে ভীষণকায় যমদূত ও যমদূতীদের কল্পনা করেছেন। ইনিয়াডের 'সিবিল' হয়েছে মধুসূদনের মায়াদেবী এবং ইনিয়াডের 'আকরন' বা 'স্টিক্‌স্' হয়েছে মধুসূদনের বৈতরণী। স্টিক্‌স্ নদীর মাঝী ইনিআসকে যেতে দিতে অস্বীকার করলে সিবিল তাকে মায়াদণ্ড দেখিয়েছিলেন। বৈতরণীরক্ষক যমদূত রামকে যেতে দিতে অস্বীকার করলে মায়াদেবীও তেমনি তাকে

শিবের ত্রিশূল দেখিয়েছিলেন। ইনিআসের মতো রামও প্রেতপুরীতে তাঁর পূর্বপরিচিত বহু ব্যক্তিকে দেখেছিলেন। প্রেতপুরীর ভয়ঙ্করতার বর্ণনা করতেও মধুসূদন ইনিয়াডের অনুসরণ করেছিলেন। তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে যার সূত্রপাত হয়েছিল, তার পূর্ণ পরিণতি হয়েছিল মেঘনাদবধ কাব্যে। মধুসূদন স্বর্গেরও বর্ণনা করেছিলেন। যে স্বর্গও পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত হয়েছিল। এ স্বর্গ এবং ভারতীয়দের কল্পিত ও কাম্য স্বর্গলোক ছিল স্বতন্ত্র। নরক ও স্বর্গ বর্ণনায় মধুসূদন বিশেষভাবে পাশ্চাত্য কবিদের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রধান আদর্শ ছিল ভার্জিলের 'ইনিয়াড' ও দান্তের 'ডিভিনা কমেডিয়া'।

কেবল আখ্যায়িকার গঠনে ও চরিত্র-চিত্রণেই মধুসূদন পাশ্চাত্যের অনুসরণ করেন নি। তিনি মহাকাব্য রচনার আঙ্গিকেও পাশ্চাত্যের অনুকরণ করেছিলেন। ভারতীয় মহাকাব্যের আদর্শ ছিল কাহিনীর সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে বর্ণনা। কিন্তু মধুসূদন তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের মৃত্যুর পূর্ববর্তী প্রায় সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেও তিনি ধারাবাহিক ভাবে সে বিবরণ দেননি। তিনি পাশ্চাত্য আদর্শে কাহিনীর মাঝখানেই কাব্যারম্ভ করেছেন। কাব্যের সময়সীমা করেছেন তিন দিবস ও দুই রাত্রি। কিন্তু পাত্রপাত্রীর দুঃখে তিনি সুদীর্ঘকালের প্রায় সমস্ত পূর্ববৃত্তান্তের বর্ণনা দিয়েছেন।

পাশ্চাত্য মহাকবিদের আদর্শে তিনি কাব্যের সূচনায় মিউস্ (Muse) বা বাগ্‌দেবীকে মহাকাব্যের কাহিনী উদ্‌ঘাটনের জন্য আবির্ভূতা হ'তে আহ্বান করেছেন। হোমার তাঁর মহাকাব্যে ইনিয়াডের প্রারম্ভে লিখেছিলেন:

Achilles' wrath to Greece the direful spring,
Of woes unnumbere'd, heavenly goddess, sing!

* * *

Declare, O muse! in what ill-fated hour
Sparing the strife, from what offended power,

Latona's son a dire contagion spread ;
And heap'd the camp with mountains of the dead.

ওডিসি মহাকাব্যেও হোমার লিখেছিলেন :

The man for wisdom's various acts renown'd,
Long exercised in woes, O Muse, resound ;

* * *

Oh, snatch some portion of these acts from fate,
Celestial Muse ! and to our world relate.

ভার্জিল-ও তাঁর 'ইনিয়াড' মহাকাব্যে লিখেছিলেন :

O Muse ! The causes and the crimes relate,
What Goddess was provoked, and whence her hate :
For what offence the Queen of heaven began
To persecute so brave, so just a man,
Involved his anxious life in endless cares,
Exposed to wants, and hurried to wars.

মিল্‌টনও তাঁর Paradise Lost মহাকাব্যের প্রথমে বাগ্‌দেবীকে আহ্বান করেছিলেন :

Of man's first disobedience, and the fruit
Of that forbidden tree, whose mortal taste
Brought death into the world and all our woe,
With loss of Eden till one greater Man
Restore us, and regain the blissful seat,
Sing, heavenly Muse, that on the secret top
Of Oreb, or of Sinai, didst inspire
That shepherd, who first taught the chosen seed

In the beginning how the Heavens and Earth
Rose out of chaos ;...

এইসব পাশ্চাত্য মহাকবিদের অনুসরণে মধুসূদনও তাঁর কাব্যের সূচনা করেছিলেন বাগ্‌দেবী, ভারতী ও কল্পনাদেবীকে আহ্বান জানিয়ে :

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ? কি কৌশলে, রাক্ষস-ভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
ঊর্ম্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা ?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি ! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূসহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর সতি !
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে ?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে,
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি !
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যে রত্নাকর কবি ! তোমার পরশে,
সুচন্দন বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে !
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে ?

কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর তার প্রতি স্নেহ
সমধিক। উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরসে! গাইব মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত; উরি দাসে দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুল-বন-মধু
লয়ে রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

এইভাবে বাগ্‌দেবীর আহ্বান মধুসূদন পাশ্চাত্য মহাকবিদের আদর্শে তাঁর তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যেও করেছিলেন। তিনি কাব্যারম্ভে ধবলগিরির বর্ণনা দিয়ে লিখেছিলেন:

এ হেন নির্জ্জন স্থানে দেব পুরন্দর
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
বীণাপাণি? কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে
প্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ দয়াময়ি! ইত্যাদি।

অল্প কয়েক মাসের ব্যবধানেই মধুসূদন 'তিলোত্তমা' ও 'মেঘনাদবধ' রচনা করেছিলেন। তিনি রাজনারায়ণ বসুকে তিলোত্তমা ও মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে যে পার্থক্য এবং মেঘনাদবধ কাব্যের অধিকতর উৎকর্ষের কথা লিখেছিলেন। তা মেঘনাদবধ কাব্যের যে কোনও অংশ পড়লেই বোঝা যায়। তিলোত্তমা রচনার পর মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য' রচনায় ভাষায় মাধুর্য সৃষ্টির যে অনুশীলন করেছিলেন, 'মেঘনাদবধ কাব্যের' ভাষাকে সেই অনুশীলনই সম্ভবত এই প্রাঞ্জলতা ও মাধুর্য দিয়েছিল। ভাষার প্রাঞ্জলতায়, প্রকাশ সৌকর্যে, মাধুর্যে, ভাবের গভীরতায় ও সমুন্নত মহিমায় এবং ছন্দের অপরূপ বিন্যাসে 'মেঘনাদবধ' বাংলা সাহিত্যে এক বিস্ময়কর কবিকৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাই 'মেঘনাদবধ কাব্য' পাঠক সমাজে এতোই চাঞ্চল্য ও আলোড়ন সৃষ্টি

করেছিল। এ শুধু অমিত্রাক্ষর ছন্দের জয়যাত্রা ছিল না, এ ছিল পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সাহিত্যের মিলনেরও জয়গাথা।

বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তি, যিনি তিলোত্তমাকাব্যের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দকে স্বাগত জানান নি, তিনিও ইতিমধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকূলে মতামত প্রকাশ করেছিলেন এবং তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের মধ্যে মধুসূদনের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন। রাজনারায়ণকে লেখা একটি পত্রে মধুসূদন লিখেছিলেন: "The renowned Vidyasagar has at last condescended to see 'great merit' in it…". অপর একটি পত্রে তিনি রাজনারায়ণকে লেখেন: "You will be pleased to hear that the great Vidyasagar is almost a convert to the new poetical creed and he is beginning to treat the apostle who has propagated it with great attention, kindness and almost affection." ঐ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ও পণ্ডিত ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের স্বীকৃতি ও স্নেহ লাভ মধুসূদনের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মধুসূদনের নবসাহিত্য সৃষ্টিকে যাঁরা সন্দেহের চোখে দেখছিলেন, তাঁরা এখন ধীরে ধীরে তাঁর প্রতিভাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মধুসূদন বিদ্যাসাগরকেও জয় করেছিলেন। এই জয় একটি বিশাল হৃদয়-সাম্রাজ্য জয়ের সমতুল্য ছিল।

রাজনারায়ণ বসু কেবল মধুসূদনের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন না, ছিলেন মধুসূদনের সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সমঝদার ও উৎসাহদাতা। তিনিই মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সমালোচনা লেখেন। তিনি বলেন:

> বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণ রসের গাঢ়তা, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার নির্বাচন শক্তি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য অনুধাবন করিলে, তাঁহার (মধুসূদনের) 'মেঘনাদবধ' বাংলা ভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। মিল্টন ও বাল্মীকিতে এবং তাঁহাতে

যদিও অনেক অন্তর, কিন্তু তিনি এই মহাকবিদের দৃষ্টান্তানুসরণে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য হইয়াছেন বলিতে হইবে। তাঁহার কাব্যে ইউরোপ ও এশিয়ার মহাকবিদিগের অনুকরণের প্রাচুর্য দেখা যায় সত্য বটে, কিন্তু তিনি যাহা অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা নূতন বেশে সুশোভিত করিয়াছেন। এ প্রকার অনুকরণ দূষণীয় হইলে মিল্টনের ন্যায় কবিও বহু নিন্দার্হ হয়েন। দত্তজ মহাশয় বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছেন। কেবল ইহার দ্বারাই তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই কাব্যের প্রধান গৌরব এই যে, ইহার হিন্দুর আকার প্রায় সকল স্থানেই রক্ষিত হইয়াছে অথচ সকল স্থানে বিশুদ্ধ ইউরোপীয় রুচি প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই কাব্যটি এশিয়া রূপ জনিতা ও ইউরোপ রূপ জনয়িত্রীর সন্তান স্বরূপ।

কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' মেঘনাদবধের সমালোচনায় লিখলেন :

বাংলা সাহিত্যে এইপ্রকার কাব্য উদিত হইবে, বোধহয়, সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না।

"শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব মাঝারে
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা এ জগতে।"

হায়! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে চিনিতে পারেন নাই। সংসারের নিয়মই এই, প্রিয় বস্তুর সহিত যাহার নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদ্‌গুণরাজির পরিচয় প্রদান করে ; তখন আমরা মনে মনে কত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি! অনুতাপ আমাদিগের শরীর জর্জরিত করে, তখন তাঁহাকে স্মরণীয় করিতে যত চেষ্টা করি, জীবিতাবস্থায় তাহা মনেও আইসে না।

মাইকেল মধুসূদন দত্তজ, জীবিত থাকিয়া যতদিন যত কাব্য রচনা করিবেন তাহাই বাংলা ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। লোকে অপার ক্লেশ স্বীকার করিয়া জলধি-জল হইতে রত্ন উদ্ধার-পূর্বক বহু মানে অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশে গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্নলাভে কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি, অনাদর প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই। কিন্তু তাহাতে মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরাই আমাদের অজ্ঞতার জন্য জনসাধারণ্যে লজ্জিত হইব।

মধুসূদনের সমসাময়িক প্রায় সকল সাহিত্যরসিকই মধুসূদনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে কারো সংশয় মাত্র ছিল না। মাঝে মাঝে সমালোচনার যে ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা যেত, তা ছিল তাঁর রাক্ষসদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ পক্ষপাত এবং রামায়ণে বর্ণিত রাম ও লক্ষ্মণ চরিত্রকে যথোপযুক্ত মর্যাদাদানের অভাব সম্পর্কে। মধুসূদন সত্যই রাক্ষসদের প্রতি যতোখানি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, রাম ও লক্ষ্মণ প্রভৃতির প্রতি ততোখানি করেন নি। মধুসূদন খ্রীষ্টান ছিলেন, তাই হিন্দুধর্মের অবতাররূপে বর্ণিত রাম-লক্ষ্মণকে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে হীন ক'রে চিত্রিত করেছিলেন, একথা ভাববার কোনও কারণ নেই। মেঘনাদের বীর চরিত্র তাঁকে আকৃষ্ট ও তাঁর কবিত্বকে উদ্বোধিত করেছিল। তাই মেঘনাদের প্রতি তাঁর এই সহমর্মিতাই তাঁকে রাম ও লক্ষ্মণের চরিত্রকে নিষ্প্রভ ক'রে চিত্রিত করতে বাধ্য করেছিল। আর একটি কারণও তাঁকে রাক্ষসদের প্রতি সহানুভূতিশীল ক'রে তুলেছিল। ঐটি ছিল জাতীয়তাবাদের যুগ। ইতালি ও জার্মানির জাতীয় রাষ্ট্ররূপে জন্মলাভ এবং সেজন্য সংগ্রাম ছিল ঐ সময়কার বিশ্ব ইতিহাসের প্রধান ঘটনা। ফ্রান্সও জাতীয়তা-বাদের বাণীতে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিল। জার্মানি ও ফ্রান্সের প্রতি মধুসূদন যে কতোখানি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তা তাঁর পুত্রদের নামের মধ্যে ফ্রেডেরিক ও নেপোলিয়ন নাম সংযোগ করা থেকেই বোঝা যায়।

রাক্ষসরাজ রাবণ যতো অপরাধ করুন, রাম ও তাঁর সহযোগীরা ছিলেন লঙ্কা-আক্রমণকারী। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে রাক্ষসরাজ রাবণ ও রাক্ষসরা তাঁদের মাতৃভূমি রক্ষায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মধুসূদনের জাতীয়তাবাদই রাক্ষসদের প্রতি তাঁকে সহানুভূতিশীল ক'রে তুলেছিল। বিভীষণ রামের পক্ষে যোগ দেওয়ায়, তিনি মধুসূদনের চক্ষে ছিলেন দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক, মধুসূদনের নিজের ভাষায়—scoundrel. মধুসূদনের এই জাতীয়তাবাদই রাবণ ও ইন্দ্রজিতের চরিত্রকে এমন মহনীয় ক'রে তুলেছে। তাই কাব্যের সূচনাতেই প্রিয় পুত্র বীরবাহুর মৃতদেহ দেখে রাবণ বলেন :

যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল সাধ এ শয়নে
সদা। রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ় ; শত ধিক্ তারে,…

বীরবাহুর মাতা চিত্রাঙ্গদা যখন পুত্রশোকে কাতর হয়ে রাবণকে ভৎ'সনা করছেন,.তখনও রাবণ বলছেন :

এ বিলাপ, কভু দেবি, সাজে কি তোমারে ?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীর মাতা তুমি,
বীরকর্মে হত পুত্রহেতু কি উচিত
ক্রন্দন ?

ইন্দ্রজিতের কণ্ঠেও এই দেশপ্রেম—

…বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে,
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ ;…

তাঁর কণ্ঠে পিতৃব্য বিভীষণের প্রতি কঠোর ভর্ৎসনা—

……"ধর্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ। বিখ্যাত জগতে
তুমি ;—কোন্ ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা।
এ শিক্ষা হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা ! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।"

যে কারণেই হোক, রামচন্দ্র পররাজ্য আক্রমণ করেছেন, রাবণ যতোই অপরাধী হ'ন, তিনি স্বদেশ রক্ষায় জীবন ও সর্বস্ব পণ করেছেন—এই দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদই মধুসূদনকে রাক্ষসদের প্রতি যে সহানুভূতিশীল ক'রে তুলেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কেবল মধুসূদন নয়, ঐ সময়ে শিক্ষিত ভারতবাসীর মনেও দেশপ্রেম অতিশয় প্রচ্ছন্নভাবে হ'লেও জাগ্রত হয়েছিল—তা-ও মেঘনাদবধ কাব্যের দ্রুত জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।

যাই হ'ক, 'মেঘনাদবধ কাব্য' যে মধুসূদনকে খ্যাতির তুঙ্গশীর্ষে স্থাপন করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। মধুসূদন ঐ যুগের বাংলা সাহিত্যের, তথা ভারতীয় সাহিত্যের, সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরূপেই স্বীকৃতি পেয়েছিলেন এবং 'মেঘনাদবধ কাব্যই' তাঁকে সে স্বাকৃতি দিয়েছিল।

১০

আশার ছলনা

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে, মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সেই, মধুসূদন জীবনে সম্মানের উচ্চাসনে আসীন হয়েছিলেন—স্বীকৃতি পেয়েছিলেন বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরূপে। তাঁর আর্থিক অবস্থাও মোটামুটি সচ্ছল ছিল। সরকারি চাকরি ও পুস্তকবিক্রয় থেকে যা আয় হচ্ছিল, তা থেকে একটি বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারের অভাব থাকার কথা নয়। অবশ্য মধুসূদন আবাল্য যে জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন, তাতে এই আয় ছিল সামান্যই। 'মেঘনাদবধ' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের কিছুদিন আগে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে যে পত্র লেখেন, তাতে তিনি বলেন:

> Have you heard that I have won my Kidderpore house case? The whole claim has been decreed except in the matter of my mother's jewels. I could not exactly prove my claim in that matter, so Judge has only decreed 1300 rupees. But he has given me *wasilot* from the death of my father's death, which amounts to upwards of 2000 Rs. I am prospering, thank God. But I sigh for some independent position, so that I might devote myself, wholly and solely, to my favourite studies.

পৈতৃক ভূসম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যে মামলা চলছিল, তাতেও মধুসূদন জয়ী হয়েছিলেন। ঐ ভূসম্পত্তির মূল্য ছিল প্রায় ৭৫০০০ টাকা। অবশ্য ঐ ভূসম্পত্তিতে তাঁর অধিকার আদালত

থেকে সাব্যস্ত হ'লেও তা থেকে আয় পেতে তাঁর কিছু দেরী হয়েছিল। ১৮৬০ সালের আগস্ট (?) মাসে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি পত্রে মধুসূদন লিখেছিলেন:

As for my law suits I have won one, another is dragging its slow length along. I am at present master of an estate paying 2500 to 3000 Rs. a year. But the devil! a rupee of it I do not expect to see for months, probably for years yet. There is an appeal pending in the Sudder. How I sometimes wish, my dear Raj, that I were a Rishi in my forest solitude! But thank God, I am not unhappy. If the world does not care for me, I do not care for it. We are quits.

"I am not unhappy." সত্যই মধুসূদনের অসুখী হওয়ার কথা নয়। তাঁর পড়াশুনো ও সাহিত্য সাধনার জন্য কিছু নির্জনতার প্রয়োজন হ'লেও তাঁর অরণ্যবাসী ঋষি হওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তাঁর ছোট্ট সংসারটিতে আনন্দের উপকরণ অল্প ছিল না। সাধ্বী স্নেহশীলা পত্নী, যিনি স্বামীর সাধনায় নিজেকে উপযুক্ত সঙ্গিনী ক'রে তুলতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি, আর তাঁর শিশু পুত্র-কন্যা। 'শর্মিষ্ঠা'র খ্যাতির মধ্যেই মধুসূদনের এই কন্যাটি ১৮৫৯ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই মধুসূদন এর নাম রেখেছিলেন শর্মিষ্ঠা। 'মেঘনাদবধ কাব্যের' খ্যাতির মধ্যেই ১৮৬১ সালের জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, যার নাম রেখেছিলেন তিনি ফ্রেডেরিক মাইকেল মিল্টন দত্ত। সুতরাং নিঃসংশয়ে বলা চলে, মধুসূদন ঐ সময়ে একটি সুখী পরিবারেরই অধিকারী ছিলেন।

তিনি যে পত্র লিখেছিলেন, If the world does not care for me, I do not care for it. We are quits. একথা অবশ্য

সত্য নয়। এ দুনিয়া মধুসূদনকে আর্থিক প্রাচুর্য ছাড়া মানুষের কাম্য আর সব কিছুই দিয়েছিল। নিজের অবিবেচনার ফলেই আর্থিক সচ্ছলতার দিক্ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। তাঁর মতো বন্ধু-ভাগ্য খুব অল্প লোকেরই হয়ে থাকে। আবাল্য তাঁর বন্ধু-ভাগ্য ছিল সকলের ঈর্ষার বস্তু। বন্ধুরা সর্বদাই তাঁকে নিজেদের মধ্যমণি ক'রে রেখেছিলেন। গৌরদাস বসাক, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, ভোলানাথ চন্দ্র, বঙ্কুবিহারী দত্ত, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা দিগম্বর মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী, দীনবন্ধু মিত্র, মনোমোহন ঘোষ, এমন কি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত সে যুগের সকল শ্রেষ্ঠ মানুষই তাঁর অনুরাগী ছিলেন। কেউ তাঁকে উপযুক্ত সম্মান ও সমাদর দিতে কার্পণ্য করেন নি। পাইকপাড়ার রাজারা তাঁর প্রয়োজনে তাঁকে অর্থসাহায্য করতেও কুণ্ঠিত হননি। তিনি নিজেও এঁদের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পোষণ করতেন। জনসাধারণও তাঁকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা, সম্মান ও সমাদর দিতে কুণ্ঠিত হয় নি। সুতরাং দুনিয়া সম্পর্কে তাঁর We are quits ছিল নিতান্ত পরিহাসোক্তি।

সাধারণ মানুষ যা পেলে স্বর্গসুখ অনুভব করতো, তা পেয়েও কিন্তু মধুসূদন সন্তুষ্ট হননি। সমুন্নত পর্বতের তলদেশে অনেক সময় যে জ্বলন্ত লাভাস্রোত গোপন থাকে, তেমনি একটি অন্তর্দাহ তাঁকে সকলের অজ্ঞাতে সর্বদা দগ্ধ করতো। খ্যাতি, ভোগবিলাস, অর্থসুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, কিছুই সেই জ্বালাকে, সেই দাহকে প্রশমিত করতে সমর্থ হয়নি। কিন্তু —কিসের এই দাহ, কিসের এই জ্বালা? সে কি হারানো অতীত, যা আর শত চেষ্টাতেও ফিরে পাওয়া যায় না? সে কি অনুতাপ—দুঃসহ স্মৃতির দংশন! স্নেহময়ী মাতা ও স্নেহময় পিতার স্মৃতি, পরিত্যক্তা পত্নী রেবেকা এবং পরিত্যক্ত দুই পুত্র ও কন্যার স্মৃতি—নিজের অবিবেচনা ও হঠকারিতার জন্য অনুতাপ? মধুসূদন ৬নং জেম্‌স্ লেনে থাকতেন।

ঐ সময়ে তিনি তাঁর পৈতৃক বাড়িটির দখল পাননি। জেম্‌স্‌ লেনের বাসাটি তাঁর বাল্যের ও কৈশোরের শত আনন্দময় স্মৃতিতে ভরা পৈতৃক বাড়িটিরই নিকটে ছিল। ঐ পৈতৃক বাসভবনটি কি তাঁর বাল্য ও কৈশোরের স্মৃতিকে উদ্বেলিত করতো—কৈশোরের ও যৌবনের উন্মাদনায় তিনি হঠকারিতা ক'রে তাঁর পিতামাতাকে যে দুঃসহ বেদনা দিয়েছিলেন, ঐ বাড়িটির প্রতিটি ইট কি তা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতো? পরে তাঁর বন্ধু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদনের বাসভবনটি কিনেছিলেন। হরিমোহনকে জাহ্নবী দেবী খুবই স্নেহ করতেন। হরিমোহন জাহ্নবী দেবীকে মা বলে ডাকতেন। যে বৎসর মধুসূদন খ্রীষ্টান হন, সেই বৎসরই হরিমোহন হন মাতৃহীন। তখন থেকে জাহ্নবী দেবীই হরিমোহনের শূন্য মাতৃস্থান পূরণ করেন। হরিমোহন লিখেছেন:

মাইকেলের অতিশয় মাতৃভক্তি ছিল, তিনি বলিতেন, 'মায়ের আমি একমাত্র পুত্র।' যে পর্যন্ত তিনি বাঙ্গালা দেশে ছিলেন, প্রায় মধ্যে মধ্যে রাত্রিযোগে আসিয়া জননীকে দর্শন দিতেন।

মাইকেলের খিদিরপুরস্থ ভদ্রাসন বাটী আমি ক্রয় করিয়া বাস করি। ঐ বাটীতে একবার ৺জগদ্ধাত্রী পূজার দিন মাইকেল সন্ধ্যার সময় আইসেন। নিজের বসতবাটীতে পূজার সমারোহ দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে মাতৃউদ্দেশে বলেন ;—'মা! তুমি কোথায়? আজ আসিয়া দেখ, তোমার যোগ্য পুত্র [হরিমোহন] তোমার বাটী কিরূপ সাজাইয়াছে—তুমি একবার স্বর্গলোক ত্যাগ করিয়া আসিয়া দেখ। তোমার কুপুত্র, আমি নরাধম, তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি।'

সুতরাং নিজের উচ্চাশার মোহে হঠকারিতায় মধুসূদন একদিন মা ও বাবাকে যে দারুণ দুঃখ ও বেদনা দিয়েছিলেন, তা যে নিরন্তর তাঁর অন্তরে একটি বাষ্পলোক সৃষ্টি করতো না, কে বলতে পারে?

তিনি হেন্‌রিয়েটার প্রেমে প'ড়ে একটি নারী ও চারটি শিশুর

প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিলেন। হেন্‌রিয়েটার প্রেম, কিম্বা শিশু কন্যা 'শর্মিষ্ঠা' শিশু পুত্র মিল্‌টন—সেই বিশ্বাসঘাতকতার গ্লানি থেকে তাঁকে মুক্ত করতে পেরেছিল? সম্ভবত পারেনি। নইলে প্রেমের নিগড় গড়ি সাধে চরণে পরায় তাঁর এতো ক্ষোভ ও অনুতাপ কেন?

মধুসূদনের সম্পর্কে একটি প্রচলিত ধারণা, তিনি এদেশীয় নারীদের পত্নীরূপে গ্রহণের অযোগ্য মনে করতেন এবং তাই শ্বেতাঙ্গিনীদের মধ্যেই তাঁর যোগ্যা পত্নীর সন্ধান করেছিলেন। খ্রীষ্টান সমাজে থাকায় এবং ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসায় তিনি শ্বেতাঙ্গিনীকেই পর পর পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালী নারীদের সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণাই ছিল। তিনি নিজের মার কথা বা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মার কথা জীবনে ভুলতে পারেননি। ভূদেবের মার সেই দেবীমূর্তিকে মধুসূদন তাঁর কাব্যে কোনও সম্রাজ্ঞীর কল্পনায় ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। অথচ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় ও শ্বেতাঙ্গিনী বিবাহ করে পাশ্চাত্য রীতিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে গিয়ে তাঁকে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সমাজ-সংসার ও আত্মীয়তা থেকে চিরজীবনের জন্য নির্বাসিত থাকতে হয়েছিল এবং পাশ্চাত্য ইউরোপীয় প্রথায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে গিয়ে তাঁকে নিরন্তর অর্থসংকটেও পড়তে হয়েছিল। তাই 'কি ফল লভিনু হায়' ব'লে তাঁর অনুতাপ ও আত্মসমালোচনাও অস্বাভাবিক ছিল না।

ধর্মীয় সাধনা ও আধ্যাত্মিকতা মধুসূদনকে কখনও আকৃষ্ট করে নি। তাই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও এবং খ্রীষ্টীয় সমাজের মধ্যে থাকলেও তা তাঁর জীবনে নিতান্ত অনাবশ্যক ও অবান্তর ছিল। নিরর্থক একটি আশার ছলনায় ভুলেই তিনি তা করেছিলেন। রাজনারায়ণ বসু 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনাকালে কলকাতায় এসে মধুসূদনের সঙ্গে যখন দেখা করেন, তখন রাজনারায়ণ তাঁকে বলেছিলেন, "এ ধারণা আমার জন্মিয়াছে যে, তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ ও আহার ইংরেজের মত হইলেও তোমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে হিন্দু।" মধুসূদন তার উত্তরে বলেছিলেন: "তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ, আমি হিন্দু, কিন্তু একটা সমাজ ঘেঁষিয়া

না থাকিলে চলে না, এইজন্য খ্রীষ্টীয় সমাজ ঘেঁষিয়া আছি। বিশেষতঃ যখন খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছি, তখন ঐ সমাজ ঘেঁষিয়া থাকা কর্তব্য।"

হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন:

"ধর্ম সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, 'আমি আপনাকে খ্রীষ্টধর্মবিহিত কোন কার্য করিতে দেখি না, আপনি আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানী নহেন, হিন্দুধর্মও বিসর্জন দিয়াছেন; মনুষ্য মাত্রেরই এক একটি ধর্ম আছে—আপনার কি ধর্ম? তাহাতে মাইকেল উত্তর দেন—"ধর্ম সম্বন্ধে আমি কোন কথা কহিতে ইচ্ছুক নহি; তবে তোমাকে উপদেশ দিবার জন্য এইমাত্র বলিতে পারি যে, Do to others as you wish they should do to you. ইহা অপেক্ষা আর ধর্ম নাই; ইহা ধারণা করিয়া কাজ করিলে ঐহিক সুখ আছে।"

মধুসূদনের প্রায় সমস্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুই হিন্দু ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টান হওয়ায় সে বন্ধুত্ব কোনভাবে ক্ষুণ্ণ হয়নি সত্য, তবু তা যে বন্ধুদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিপূর্ণ মিলনে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল, তা-ও সত্য। ঐ সময়ে মধুসূদন একবার নিজ জন্মস্থান সাগরদাঁড়িতে গিয়েছিলেন। মধুসূদন তখন যশের সুউচ্চ শিখরে। তাই আত্মীয়-স্বজনদের কাছে তিনি যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিলেন। তিনিও অমায়িকতা ও আনন্দপ্রকাশের কার্পণ্য করেন নি। নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর মধুস্মৃতিতে মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রীর একটি চিঠি উদ্‌ধৃত করেছেন। তাতে ভ্রাতুষ্পুত্রী বলেছেন:

"তাঁহার ভ্রাতৃজায়ারা আচারপরায়ণা বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে ক্ষেপাইয়া আমোদ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের রান্না খিচুড়ী ও পায়স (যাহা কবিবরকে খাইতে দেওয়া হইত) বিছানার উপরে রাখার ভাণ করিয়া, 'আমি জাতিভ্রষ্ট, তোমাদিগকে ছুঁইয়া দিব, ছোট ছোট ভাইপোদিগকে আমার উচ্ছিষ্ট খাওয়াইয়া দিব' ইত্যাদি বলিয়া রহস্য করিলেন।"

মধুসূদন এই ব্যাপারে বাইরে রহস্য-পরিহাস করলেও তিনি যে তাঁর আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন, তাঁদের কাছে অস্পৃশ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয়, তা নিশ্চয় মর্মে মর্মে বোধ করতেন। নরেন্দ্রনাথ আর একটি ঘটনারও উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন:

আত্মীয়-স্বজন ও স্বদেশীয়গণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া মধুসূদন তাঁহার মাতুল বংশীধর ঘোষের আহ্বানে সাগরদাঁড়ি হইতে কাটিপাড়ায় গমন করেন। তখন তাঁহার মাতুলবংশ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। বংশীধর ঘোষ তাঁহার একমাত্র কীর্তিমান্ ভাগিনেয়কে পরম স্নেহে ও আদরে সংবর্ধিত করেন।

বংশীধর ঘোষ পুরমহিলাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন, মধুসূদনের জন্য প্রস্তুত বিবিধ রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যসামগ্রীসমূহ, স্বর্ণ-পাত্রাদিতে সজ্জিত করিয়া, যেন তাহাকে প্রদত্ত হয়। কিন্তু মধুসূদন খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী—তিনি স্বর্ণপাত্রে ভোজন করিলে পাছে উক্ত পাত্রাদি নষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় মহিলাগণ তৎপরিবর্তে কদলীপত্রে ও মৃৎপাত্রাদিতে তাঁহাকে ভোজন করিতে দিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে বংশীধর ঘোষ মধুসূদনের আহারের সময়, কোন কার্যোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিলেন। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, মধুসূদন আচমন করিতেছেন, ভৃত্য মৃৎপাত্র হইতে তাঁহার হস্তে জল ঢালিয়া দিতেছে। দেখিবামাত্র বংশীধর ঘোষ ক্রোধে আত্মহারা হইয়া ভৃত্যকে এরূপ সজোরে পদাঘাত করিলেন যে, সে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল্। মধুসূদন তখনই মাতুলের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, 'মামা! করেন কি? উহারা ঠিকই করিয়াছে—আমাকে স্বর্ণপাত্রে ভোজন করাইলে পাত্রাদি নষ্ট হইত।' বংশীধর ঘোষ টলিবার পাত্র নহেন। তিনি সক্রোধে মহিলাদিগকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে বলিলেন, 'না হয় এক সেট সোনার বাসনই নষ্ট হইয়া যাইত? তা বলিয়া কি আমার ভাগিনেয় মাটির বাসনে খাইবে? ক্ষতি ত আমারই হইত; তাহাতে তোমাদের কি ক্ষতি!...'

এই ঘটনাতে বংশীধরের স্নেহ যতোই প্রকাশ পাক, মধুসূদন যতোই হাসিমুখে এই অপমানকে গ্রহণ করুন, তিনি যে আজ তাঁর আদরের পাত্রপাত্রীদের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় ও অস্পৃশ্য, তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ও ইউরোপীয় জীবনযাত্রায় আহার, পরিচ্ছদ গ্রহণ ক'রে, একজন বিদেশিনী শ্বেতাঙ্গিনীকে—তিনি যতোই স্বামীপরায়ণা হ'ন—বিবাহ ক'রে মধুসূদন জীবনে কি পেয়েছিলেন এবং কি হারিয়েছিলেন—তা নিশ্চয় উপলব্ধি করেছিলেন।

তিনি আজ বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। কিন্তু সেজন্যে তো এ-সবের কিছুই প্রয়োজন ছিল না। তাই তিনি যে নিরন্তর অন্তর্দাহে দগ্ধ হতেন, তা-ই ছিল স্বাভাবিক।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে তত্ত্বোধিনী পত্রিকার জন্য একটি কবিতা লিখতে বলেন। ফলে মধুসূদন তাঁর বিখ্যাত 'আত্মবিলাপ' কবিতাটি লেখেন। 'আত্মবিলাপ' কবিতায় কবির এই অন্তর্দাহ-ই সকরুণরূপে প্রকাশ পেয়েছে:

আশার ছলনে ভুলি   কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি   কাল-সিন্ধু পানে যায়
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন   হীনবল দিন দিন,
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? একি দায়!

*   *   *

প্রেমের নিগড় গড়ি   পরিলি চরণে সাদে;
কি ফল লভিলি?
জ্বলন্ত পাবক-শিখা-লোভে   তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি!

পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ হায়!
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে!

*   *   *

ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায়রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে!

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন এমন একটি কাজ করেন, যাতে তাঁর সরকারী চাকরি যাওয়ার উপক্রম হয়। দীনবন্ধু মিত্রও ঐ সময়ে সরকারী উচ্চপদে আসীন ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি এদেশে ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী অবলম্বনে তাঁর বিখ্যাত নাটক 'নীলদর্পণ' রচনা করেন। সরকারী কর্মচারী ব'লে দীনবন্ধু এই নাটকে তাঁর নাম প্রকাশ করেন নি। ইংরেজ নীলকরদের জঘন্য কার্যকলাপ অনেক উদারমনা ইংরেজেরও বিরক্তির কারণ হয়েছিল। 'নীলদর্পণ নাটক' রচিত হ'লে এদেশে ইংরেজ নীলকরদের বীভৎস চিত্র স্বদেশীয় উদারমনা ব্যক্তিদের দৃষ্টিগোচর করাবার জন্যে পাদরি রেঃ জেম্‌স্ লং 'নীলদর্পণ' নাটককে ইংরেজীতে অনুবাদ ও প্রকাশ করতে মনঃস্থ করেন। কিন্তু নীলদর্পণের কথ্য সংলাপকে যথাযথ ইংরেজীতে অনুবাদ করবার শক্তি তাঁর ছিল না। একমাত্র মধুসূদনই যে এই দুরূহ কাজ করতে পারেন, সে বিষয়ে সকলেই একমত ছিলেন। মধুসূদনকে এ বিষয়ে অনুরোধ করা হ'লে তিনি সানন্দে সে দায়িত্ব নিলেন।

পদস্থ সরকারী কর্মচারী, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তারকনাথ ঘোষের বাসভবন ছিল ঝামাপুকুরে। ঐ বাড়িটিও সে যুগের সাহিত্যামোদী ও সাহিত্যিকদের মিলনস্থান ছিল। সম্মুখেই ছিল দিগম্বর মিত্রের বাড়ি। এ দু-ই বাড়িতে মধুসূদন প্রায়ই যাতায়াত করতেন। মধুসূদন তারকনাথ ঘোষের বাড়িতে বসে এক রাত্রির মধ্যে নাকি গোটা নীলদর্পণ অনুবাদ ক'রে দেন। History of Indigo Disturbance in Bengal-এর লেখক বলেছেন: The actual translation

was made by the immortal poet of the Meghnadbadh, —Michael Madhusudan Dutt. The translation was hurried through a single night.…" নগেন্দ্রনাথ সোম লিখেছেন: "ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারকনাথ ঘোষের ঝামাপুকুরস্থ বাসভবনে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন এক রাত্রির মধ্যে 'নীলদর্পণের' অনুবাদ কার্য সমাধা করেন। একজন 'নীলদর্পণ' পাঠ করিয়া যাইতেছেন, আর মধুসূদন চেয়ারে বসিয়া টেবিলের ওপর অবিরত লেখনী-সঞ্চালনে, ইংরেজীতে উহা ভাবান্তরিত করিয়া যাইতেছেন।"

নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ যখন প্রকাশিত হ'লো, তখন তাতে অনুবাদকের নাম ছিল না। মধুসূদন সরকারী কর্মচারী, তাই তাঁর নাম প্রকাশ সম্ভব ছিল না। বইয়ের উপরে মুদ্রিত ছিল: Nil Darpan or the Indigo Planting Mirror.—A Drama translated from Bengali by A Native. লং সাহেব ভূমিকায় লিখেছিলেন: "The original Bengali of this drama—the Nil Darpan or Indigo Planting Mirror—having excited considerable interest, a wish was expressed by various Europeans to see a translation of it. This has been done by a Native ; ··"

নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ও ইংলণ্ডে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ইংরেজী অনুবাদের প্রকাশক রেঃ জেম্স্ লংকে সরকার আদালতে অভিযুক্ত করেন। বিচারকালে বিচারপতি ওয়েল্স্ পর্যন্ত অনুবাদকের নাম প্রকাশের জন্য লংকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। কিন্তু লং সাহেব তাতে মধুসূদনের ক্ষতি হবে জেনে কোনমতেই তাঁর নাম প্রকাশ করলেন না। লং সাহেবের এই দৃঢ়তা সকলকেই চমৎকৃত করলো, কারণ, অনুবাদকের নাম প্রকাশ করলে প্রকাশকের চেয়ে অনুবাদকেরই দণ্ড হ'তো বেশী। লং সাহেবের জেল ও জরিমানা দু-ই হ'লো। তাঁর জরিমানার হাজার টাকা

কালীপ্রসন্ন সিংহ দিয়ে দিলেন। মামলার জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত টাকাও তিনিই দিয়েছিলেন।

এই সময় থেকেই দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে মধুসূদনের পরিচয়ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। দীনবন্ধু মধুসূদনের অত্যন্ত ভক্ত হয়ে ওঠেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দীনবন্ধু-চরিতে লিখেছেন: "এই গ্রন্থ রচনা করিতে করিতে দীনবন্ধু মেঘনায় নৌকাডুবি হইয়া জলমগ্ন হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন—লং সাহেব কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরাজি অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।" তিনি অন্যত্র আরো লিখেছিলেন: "...ইহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি শেষে তাঁহার জীবন-নির্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরি পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।"

লং সাহেব মধুসূদনের নাম আদালতে প্রকাশ না করলেও এ ধরনের অনুবাদ যে কেবল মধুসূদনের দ্বারাই সম্ভব, তা সকলে জানতেন—সরকারী উচ্চতন মহলও। তাই তাঁরা মধুসূদনকে এজন্য গোপনে তিরস্কার ক'রে থাকবেন। এই তিরস্কার-ও হয়তো মধুসূদনকে একটি স্বাধীন ও সম্মানজনক জীবিকার সন্ধানে প্রবৃত্ত করেছিল।

'মেঘনাদবধ' দ্বিতীয় খণ্ড রচনার পরেই অনেকে মধুসূদনকে নূতন আর একটি মহাকাব্য রচনার জন্য অনুরোধ করেন। যতীন্দ্রমোহন তাঁকে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ নিয়ে একটি মহাকাব্য লিখতে বলেন, আর এক বন্ধু বলেন উষাহরণ নিয়ে। রাজনারায়ণ বসু তাঁকে মেঘনাদবধ রচনার আগেই বলেছিলেন 'সিংহল বিজয়' নিয়ে একটি 'জাতীয় মহাকাব্য' রচনা করতে। 'সিংহল বিজয়' নিয়েই মধুসূদন শেষ পর্যন্ত আর একটি মহাকাব্য লিখবেন, স্থির করলেন। কিন্তু সিংহল বিজয়ের যে কাহিনী রাজনারায়ণ বসু তাঁকে ইতিপূর্বে জানিয়েছিলেন, তা তাঁর মনে ছিল না। তাই তিনি রাজনারায়ণকে লিখলেন: "Now I

am for your সিংহল বিজয় ; but I have forgotten the story and do not know in what work to find it ; kindly enlighten me on the subject.···Give me the সিংহল, old boy. I like a subject with oceanic and mountain scenery, with sea-voyages, battles and love-adventures. It gives a fellow's invention such a wide scope."

রাজনারায়ণবাবু ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে লেখা একটি পত্রে ঐ কাহিনী আগেই জানিয়েছিলেন এবং ঐ কাব্যে কি কি বিষয় সন্নিবেশ করা যেতে পারে এবং সেসব বিষয়ে তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে, তাও জানিয়েছিলেন। যে কোন সূত্র থেকেই হ'ক, মধুসূদন ঐ কাহিনীটি জানতে পারেন এবং 'সিংহল বিজয়' কাব্য রচনার জন্য একটি সার-সংক্ষেপ বা খসড়া প্রস্তুত করেন। তারপর তিনি 'সিংহল বিজয়' কাব্য রচনা শুরু করেন :

স্বর্ণসৌধে সুধাধরা যক্ষেন্দ্রমোহিনী
মুরজা, শুনি সে ধ্বনি অলকা নগরে,
বিস্ময়ে সাগর পানে নিরখি, দেখিলা
ভাসিছে সুন্দর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে
পতাকা, মঙ্গলবাদ্য বাজিছে চৌদিকে। ইত্যাদি।

কিন্তু মহাকাব্য রচনার সেই রুদ্রবীণার তার যেন কিভাবে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মধুসূদন 'সিংহল বিজয়' কাব্যের চব্বিশ চরণ রচনার পর আর অগ্রসর হ'তে পারেন নি। তিনি তাঁর এই আশঙ্কার কথা রাজনারায়ণবাবুকে যে পত্রে 'সিংহল বিজয়' লেখার সংকল্পের কথা জানিয়েছিলেন, সেই পত্রেই লিখেছিলেন, "···many of our friends are at me to dash out again." কিন্তু "It will not be an easy thing to beat Meghanad, but there is no harm in trying. What say you ? Or must I

sink into a writer of occasional lyrics and sonnets for the rest of my days?" মধুসূদন স্পষ্টতঃ বাগ্‌দেবীর বিদায়ের নূপুরধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন তাঁর অন্তরে। তাই বুক তাঁর দুরু দুরু ক'রে উঠেছিল। "...but there is no harm in trying." কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা বেশিদূর অগ্রসর হ'লো না। তিনি 'সিংহল বিজয়' কাব্য রচনা স্থগিত রাখলেন—প্রকৃতপক্ষে, ত্যাগ করলেন।

"...must I sink into a writer of occasional lyrics and sonnets for the rest of my life?"—এই আশঙ্কাও সত্য হ'তে বেশি বিলম্ব ছিল না। কিন্তু তাঁর কাব্যপ্রতিভা নির্বাপণের পূর্বে একবার উজ্জ্বল শিখায় জ্বলে উঠলো। তিনি বিখ্যাত রোমক কবি ওভিদের (Publius Ovidius Naso) Heroides বা বীর পত্রাবলীর অনুকরণে একটি কাব্য রচনা শুরু করলেন। ওভিদ পত্রাকারে পৌরাণিক নায়িকাদের জবানিতে এই কাব্য লিখেছিলেন। কৈশোরে তাঁকে কেউ 'পোপ' ব'লে ডাকলে মধুসূদন খুব খুশী হতেন। ইংরেজ কবি 'পোপ'-ও ওভিদের অনুকরণে পত্রাকারে কাব্য লিখেছিলেন। মধুসূদন এখন কোনও Heroic Poetry লেখার পরিবর্তে Heroides বা Heroic Epistles লেখায় মনোনিবেশ করলেন।

'মেঘনাদবধ' কাব্যের নবম সর্গ রচনাকালে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন:

> ...I suppose I must bid adieu to Heroic Poetry after Meghanad. A fresh attempt would be something like a repetition. But there is the wide field of Romantic and Lyric Poetry before me, and I think I have a tendency in the Lyrical way.

ওভিদের বীর-পত্রাবলী এই Romantic and Lyric Poetry-র দ্বার মধুসূদনের কাছে উন্মোচিত ক'রে দিয়েছিল। তাই মধুসূদন 'সিংহল বিজয় কাব্য' রচনা বন্ধ ক'রে বীর-পত্রাবলীর অনুকরণে তাঁর 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনায় মন দিলেন। ঐ সময়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মিল্‌টনের জন্ম হয়েছিল। সম্ভবতঃ তার ফলেই পত্নী হেন্‌রিয়েটা কিছুটা ভগ্নস্বাস্থ্য ও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মধুসূদন তাঁকে নিয়ে কিছুদিন নদীভ্রমণে কাটান এবং কিছুদিনের জন্য বর্ধমানে বেড়াতে যান। হেন্‌রিয়েটা শীঘ্র সুস্থ হয়ে ওঠেন। একটি পত্রে এ সংবাদ তিনি রাজনারায়ণ বসুকে জানান।

ঐ পত্রে তিনি আরও জানান যে, তিনি তাঁর নতুন মহাকাব্য 'সিংহল বিজয়' রচনায় বিশ-তিরিশ লাইনের বেশি এগোন নি। সাময়িকভাবে তা লেখা স্থগিত রেখেছেন এবং গত কয়েক সপ্তাহে পুরাণে বর্ণিত কতকগুলি বিখ্যাত নারীর পত্রাকারে কতিপয় কবিতা লিখেছেন। এই পত্রকাব্যের নাম বীর দিয়েছেন "বীরাঙ্গনা কাব্য"। তিনি ওভিদের মতোই একুশটি কবিতাপত্র লিখবেন স্থির করেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি এগারোটি লিখে ফেলেছেন। এই এগারোটি কবিতা-পত্র হ'লো (১) দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, (২) সোমের প্রতি তারা, (৩) দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী, (৪) দশরথের প্রতি কেকয়ী, (৫) লক্ষ্মণের প্রতি সুর্পণখা, (৬) অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী, (৭) দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী, (৮) জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা, (৯) নীলধ্বজের প্রতি জনা, (১০) শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী ও (১১) পুরুরবার প্রতি উর্বশী। তিনি ঐ পত্রে আরও জানান যে, বাকী কবিতাপত্রগুলি লেখার আগেই ঐ এগারোটি কবিতা ছাপাবার জন্যে প্রেসে যাচ্ছে। কারণ, ঐ কবিতাগুলি সম্পর্কে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মুদ্রক ঈশ্বরচন্দ্র বসু এবং অন্যান্য কয়েকজন বন্ধু "half-mad."

বীরাঙ্গনা কাব্য যে ১৮৬১ সালের অক্টোবরের পূর্বেই রচিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বীরাঙ্গনা কাব্যের এগারোটি পত্রিকা

শেষ ক'রে মধুসূদন রাজনারায়ণকে যে পত্র লেখেন, তাতে তিনি লিখেছেন যে, তিনি ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য বিলাত যেতে মনঃস্থ করেছেন এবং বিদ্যাসাগর সহজ শর্তে তাঁর পৈতৃক ভূসম্পত্তি বাঁধা রেখে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ ক'রে দেওয়ার ভরসা দিয়েছেন। অর্থাৎ তখনও তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির কোন বিলি-ব্যবস্থা হয়নি। ঐ সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থার তারিখ ছিল বাংলা ১২৬৮ সালের ৯ই আশ্বিন (অক্টোবর, ১৮৬১)। সুতরাং ১৮৬১ সালের ১লা অক্টোবর মাসের আগেই বীরাঙ্গনা নিঃসন্দেহে রচিত হয়েছিল। বীরাঙ্গনা-কাব্য ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের গোড়ায় প্রকাশিত হয়। মধুসূদন ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখের স্মারকলিপিতে লিখেছিলেন :

> It is my intention, God willing, to finish the poem in XXI Books. But I must print the XI already finished. The procceds of the first part must defray the expenses of printing the second. "Born an age too soon"—time will come when these works of mine will fill the pockets of printers, book-sellers, painters *et hoc genus omne* and now I am obliged to shell out.

"এক যুগ আগে জন্মেছি—কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন এইসব বই দিয়ে মুদ্রাকর, পুস্তক-বিক্রেতা, চিত্রকর, সকল শ্রেণীর মানুষই নিজেদের পকেট ভরবে, কিন্তু এখন আমার পকেট শূন্য"—মধুসূদনের এই উক্তি অত্যন্ত বেদনাদায়ক হ'লেও একান্ত সত্য ছিল। তাই তিনি ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রথম খণ্ড ছাপিয়ে যে অর্থ পাবেন, তা দিয়েই ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড ছাপাবার পরিকল্পনা করেছিলেন। অবশ্য, পরে ব্রজাঙ্গনা বা বীরাঙ্গনা, কোনও কাব্যেরই দ্বিতীয় খণ্ডের রচনা তিনি সমাপ্ত করতে পারেন নি। 'জনা' পত্রিকা শেষ ক'রে ঐ স্মারকলিপিতে তিনি একথাও লিখেছিলেন

যে : "The epistle of poor জনা must be revised and printed along with the second set. I am very unpoetical just now." কিন্তু দেখা গেল, 'জনা' পত্রিকা প্রথম খণ্ডেই প্রকাশিত হয়েছে। 'জনা' পত্রিকাটি অন্যান্য পত্রিকার তুলনায় কোন অংশে হীন নয়। তাই মনে হয়, 'জনা' পত্রিকাটি তিনি শেষ পর্যন্ত সংশোধন বা পরিমার্জন ক'রে দিয়েছিলেন। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা পত্রে মধুসূদন পত্রিকাগুলির যে তালিকা দিয়েছিলেন, তাতে ঐ পত্রিকা ৯ নম্বরে ছিল। কিন্তু প্রকাশিত গ্রন্থে 'জনা' পত্রিকার স্থান একাদশে অর্থাৎ প্রথম খণ্ডের শেষ সর্গে।

'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশের ব্যয়ভার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরই বহন করেছিলেন। ঐ কাব্য মধুসূদন উৎসর্গ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামে। উৎসর্গ-পত্রে (মঙ্গলাচরণ) তিনি লিখেছিলেন :

বঙ্গকুলচূড় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের চিরস্মরণীয় নাম এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে স্থাপিত করিয়া, কাব্যকার ইহা উক্ত মহানুভবের নিকট যথোচিত সম্মানের সহিত উৎসর্গ করিল। ইতি। ১২৬৮ সাল। ১৬ই ফাল্গুন।

মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লেখা ঐ সময়কার একটি পত্রে লেখেন :

I have dedicated the work to our good friend the Vidyasagar. He is a splendid fellow ! I assure you, I look upon him in many respects as the first man among us. You will be pleased to hear that his views regarding the new Poetry are very flattering, tho' he cannot manage to read the verse, yet, with eloquence. His admiration is honest, for he is above flattering any man.

'বীরাঙ্গনা' কাব্যের ১১টি পত্রিকার মধ্যে 'জনা' পত্রিকা ছাড়া আর

সবগুলিই প্রণয়-পত্রিকা। বিভিন্ন প্রকার নায়িকার বিভিন্ন প্রকার প্রেমের প্রকাশ মধুসূদন অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গেই ধ্বনিত করেছেন। উর্বশী গণিকা, তারা সধবা, শূর্পণখা বিধবা, রুক্মিণী কুমারী—নারী জীবনের সম্ভাব্য চার অবস্থার প্রতীক। এই চারজনের পত্রেই প্রত্যেকের চরিত্র ভিন্ন, প্রেম-নিবেদনের ভঙ্গিও ভিন্ন। 'জাহ্নবী' পত্রখানি প্রত্যাখ্যান-পত্র, তাতে জাহ্নবীদেবী প্রেমবন্ধন ছিন্ন ক'রে বিরহী শান্তনুকে রাজকার্যে ও আপন কর্তব্যে মনোনিবেশ করতে বলছেন। 'শকুন্তলা' পত্রিকায় বিরহিণী নারীর করুণ বিলাপই আগাগোড়া ধ্বনিত হয়েছে। 'দ্রৌপদী' পত্রিকাতেও বিরহিণী নারীর বিলাপই প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু 'শকুন্তলা' পত্রিকা থেকে তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'ভানুমতী' পত্রিকায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে রত স্বামী দুর্যোধনের অমঙ্গল আশঙ্কায় ব্যাকুলা সাধ্বী পত্নীর মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। 'কেকয়ী' ও 'জনা' পত্রিকা দুটি অনুযোগে মুখর। কিন্তু এই পত্রিকা দুটিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। কেকয়ীর পত্র নারীসুলভ অভিমানে পূর্ণ। আর জনার পত্র পূর্ণ বীরাঙ্গনা-সুলভ তীব্র অনুযোগে ও ধিক্কারে।

বীরাঙ্গনা-কাব্যে মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা ও ভাবের সমুন্নত গাম্ভীর্যের সঙ্গে ব্রজাঙ্গনা-কাব্যের মাধুর্য ও লালিত্য মিশ্রিত হয়ে অনির্বচনীয় হয়ে উঠেছে। এর ভাষার প্রাঞ্জলতা ও স্বচ্ছন্দ প্রবাহ সকলকে মুগ্ধ করে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বীরাঙ্গনা'-কাব্য সম্পর্কে বলেছেন:

It followd the Meghanadbadha, and there is the same gorgeous imagery, the same rich poetic diction and the same musical variously modulated versification. বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি স্মরণীয়।

সত্যই বীরাঙ্গনা কাব্যের ভাষার লালিত্য ও মাধুর্য অতুলনীয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে ভাষা যে কতো প্রাঞ্জল হ'তে পারে 'তারা' পত্রিকা থেকে তার কিছু নমুনা দেওয়া যেতে পারে:

গুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে,
সুধানিধি, মুদি আঁখি ভাবিতাম মনে,
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি,
মানভঙ্গ আশে নত দাসীর চরণে!
আশীর্বাদ ছলে মনে নমিতাম আমি।

কিংবা 'ভানুমতী' পত্রিকায়—

এখনও দেহ ক্ষমা, এই ভিক্ষা মাগি,
ক্ষত্রমণি! ভাবি দেখ,—চিত্রসেন যবে,
কুরুবধূদলে বাঁধি তব সহ রথে,
চলিল গন্ধর্ব দেশে, কে রাখিল আসি
কুল-মান-প্রাণ তব, কুরুকুলমণি?
বিপদে হেরিলে অরি, আনন্দ-সলিলে
ভাসে লোক; তুমি যার পরমারি, রাজা,
আসিল সে অশ্রুনীরে তোমার বিপদে!
হে কৌরবকুলনাথ! তীক্ষ্ণ শরজালে
চাহ কি বধিতে প্রাণ তাহার সংগ্রামে,
প্রাণ, প্রাণাধিক মান, রক্ষিল যে তব
অসহায় যবে তুমি—হায়! সিংহ সম
আনায় মাঝারে বদ্ধ রিপুর কৌশলে?

কিংবা 'জনা' পত্রিকায় নীলধ্বজের প্রতি জনার তেজোদৃপ্ত উক্তি:

হায়, পাগলিনী জনা! তব সভামাঝে
নাচিছে নর্তকী আজি, গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণাধ্বনি! তব সিংহাসনে
বসিছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে!
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে।
কি লজ্জা! দুঃখের কথা, হায়, ক'ব কারে?

হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী ?
যে দারুণ বিধি, রাজা, আঁধারিলা আজি
রাজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি
জ্ঞান তব ?···

কিংবা,

যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে
নব মিত্র পার্থ সহ! মহাযাত্রা করি
চলিল অভাগী জনা পুত্রের উদ্দেশে!
ক্ষত্রকুলবালা আমি ; ক্ষত্রকুলবধূ,
কেমনে এ অপমান স'ব ধৈর্য ধরি ?
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে ;
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্ত নগরে
লভি অন্তে! যাচি চিরবিদায় ও পদে!
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, "কোথা জনা ?" বলি ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি 'কোথা জনা' বলি!

'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রথম খণ্ড রচনার পরে মধুসূদন দ্বিতীয় খণ্ড রচনায় হাত দিয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী, অনিরুদ্ধের প্রতি ঊষা, যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা, নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী, নলের প্রতি দময়ন্তী ও ভীমের প্রতি দ্রৌপদী—এই ছ'খানি পত্রিকার কিছু কিছু অংশ তিনি লিখেওছিলেন। কিন্তু সেগুলি সিংহল বিজয়ের মতোই সামান্য কয়েক লাইন ক'রে ছাড়া আর বেশীদূর অগ্রসর হয় নি।

বীরাঙ্গনা কাব্যের ১১টি পত্রিকা লেখার পর রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন যে পত্র দিয়েছিলেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন: "But I suppose my poetical career is drawing to a close." সত্যই, মধুসূদনের কবিজীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। পরে তিনি

কয়েকটি কাব্য রচনার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, বিশ-তিরিশ লাইন ক'রে লিখেও ছিলেন। কিন্তু কোনটিতে বেশিদূর অগ্রসর হ'তে পারেন নি। ইউরোপে তিনি মাত্র চতুর্দশপদী কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন। তাই বীরাঙ্গনা কাব্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের কবি-জীবনের অবসান ঘটেছিল বলা চলে।

'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশের পরে মধুসূদনের জীবনপ্রবাহ অন্য খাতে প্রবাহিত হ'তে চলেছিল। আবার তাঁকে কুহকিনী আশা হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হ'লে Hindu Patriot কাগজের জন্য একজন সুযোগ্য সম্পাদকের অভাব দেখা দিলো। যতীন্দ্রমোহন ও বিদ্যাসাগর দুজনেই মধুসূদনকে Hindu Patriot কাগজ সম্পাদনার ভার নিতে অনুরোধ করলেন। যতীন্দ্রমোহন ও বিদ্যাসাগরের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে ১৮৬২ সালের গোড়ায় ঐ কাজের ভার মধুসূদন নিলেন এবং কিছুদিন Hindu Patriot কাগজটি সম্পাদনা করলেন। কিন্তু কাগজের পরিচালকরা মধুসূদনকে নিয়মিত পারিশ্রমিক না দেওয়ায় মধুসূদন ঐ কাজে ইস্তফা দিতে চান। তখন যতীন্দ্রমোহন তাঁকে সম্পাদকের পদ ত্যাগ না করতে অনুরোধ জানিয়ে ২৭শে মার্চ (১৮৬২) একটি চিঠি দেন।

I regret to hear that you have received no remuneration from the Patriot Fund up to this time; I have spoken strongly on the subject to Kristo Dass and I dare say a remittance of at least a portion of the amount due will soon be made to you.

তিনি আরও বললেন যে, একথাও সত্য, মধুসূদন সাহিত্যসাধনায় এর চেয়ে অনেক উপযুক্তভাবে তাঁর মূল্যবান্ সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারবেন। তবে তাঁর পক্ষে ঐ কাগজের জন্যে সপ্তাহে দু-তিনটি নিবন্ধ

লেখা এমন কিছু নয়। ঐ কাগজের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য অন্য ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। তাছাড়া, মধুসূদন নিজেও এই কাগজের ব্যাপারে সাহায্য করবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সুতরাং মধুসূদন যেন হঠাৎ সম্পাদকের পদ ত্যাগ না করেন। যদি এক মাসের মধ্যে কাগজের ম্যানেজার তাঁকে নিয়মিত পারিশ্রমিক না দেন, তখন তিনি সম্পাদকের কাজ ছেড়ে দিলে যতীন্দ্রমোহন তাঁকে আর অনুরোধ জানিয়ে ব্যস্ত করবেন না।

মধুসূদন যতীন্দ্রমোহনের অনুরোধ ঠেলতে পারেন নি। তবে খুব বেশিদিনও তাঁকে ঐ কাগজের সম্পাদনা করতে হয়নি। কারণ, তিনি ঐ সময়ে ইউরোপ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হ'তে থাকেন।

মধুসূদন এখন তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হ'লেও তা থেকে টাকাকড়ি পাচ্ছিলেন না। চাকরি থেকে তিনি যা পাচ্ছিলেন, তাও পাশ্চাত্য ধারায় জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সম্প্রতি 'নীলদর্পণ' অনুবাদ করার জন্য উপরওয়ালার কাছে তিনি যে তিরস্কার পেয়েছিলেন, তাও মধুসূদনের মতো আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষের পক্ষে নীরবে সহ্য ক'রে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তিনি একটি স্বাধীন জীবিকার সন্ধান করছিলেন। কাব্য, কবিতা, নাটক লিখে খ্যাতি ও সম্মান পেলেও তা থেকে জীবিকার সংস্থান হওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল। মধুসূদন পুলিশ আদালতে চাকরি নেওয়ার পর থেকে আইন ও আদালত সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, তাঁর চেয়েও অনেক নির্বোধ ও অযোগ্য ব্যক্তি আইনজীবী-রূপে স্বাধীন ভাবে অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করছে। তিনি আইন সম্বন্ধে যথেষ্ট পড়াশুনোও করেছিলেন এবং সদর দেওয়ানী আদালতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্যও প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আইন-ব্যবসায় তাঁর রক্তের মধ্যেও ছিল। তাঁর বাবা রাজনারায়ণ দত্ত আইনজীবীরূপে প্রচুর

অর্থোপার্জন করেছিলেন। সুতরাং স্বাধীন জীবিকার জন্য তিনি আইন-ব্যবসায়কেই বেছে নিলেন।

কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ের মতোই তাঁর উচ্চাশা ছিল মাত্রাহীন। তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে পরীক্ষা দিয়ে আইনজীবী হওয়ার পথ নিলেন না। তিনি ইউরোপীয় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, তাঁর পরিবার ইউরোপীয়, ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট মেলামেশা। তদুপরি, তিনি মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সুতরাং সাধারণ আইনজীবীরূপে আত্মপ্রকাশ তাঁর আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর ছিল। বাল্যকাল থেকে তাঁর স্বপ্ন ছিল ইংলণ্ড যাওয়ার। সে স্বপ্নও আবার তাঁকে পেয়ে বসলো। সুতরাং তিনি স্থির করলেন, তিনি ইংলণ্ডে যাবেন এবং ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসে স্বাধীন জীবিকা গ্রহণ করবেন।

'মেঘনাদবধ কাব্য' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পরেই সম্ভবত এ বিষয়ে মধুসূদন মন স্থির করেছিলেন। কারণ, ঐ সময়েই তিনি ইউরোপ যাওয়ার জন্য টাকা সংগ্রহের উদ্দেশে তাঁর পৈতৃক ভূসম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করেন। মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী মোক্ষদা দেবীকে তিনি তাঁর ভূসম্পত্তি সম্পর্কে যে দলিল ক'রে দেন, তা বাংলা ১২৬৮ সালের ৯ই আশ্বিন (১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর) তারিখে লেখা।

'বীরাঙ্গনা' কাব্য রচনা-কালেই তিনি রাজনারায়ণকে একটি পত্রে জানালেন :

> I am making arrangements to go to England to study for the Bar and must bid adieu to Muse! You will be pleased to hear that the great Vidyasagar is almost a convert to the new poetical cried and is beginning to treat the 'apostle' who has propagated it with great attention, kindness, and almost affection! He is not quite habituated to the new music yet—but

of the genuine character of the poetry he does not appear to entertain any doubt. He has taken great interest in my proposed visit to England, and, in fact, is the most active promoter of my views on the subject. He has undertaken to raise a sufficient sum for me on easy terms on the mortgage of my property. The thing will cost me aboud 20,000 Rs. and I can spare that. No more Modhu the 'কবি', old fellow, but Michael M. S. Dutt Esquire of the Inner Temple Barrister-at-law !! Ha !! Ha !! Isn't that grand ?…

কিন্তু মধুসূদন জানতেন না, তাঁর নিয়তি অলক্ষ্যে বিদ্রূপের হাসিই হাসছিলেন। এ ছিল আশার ছলনা মাত্র। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ, মাদ্রাজ প্রবাস, সবই ছিল আশার ছলনা। আবার সেই আশার নেশা তাঁকে পেয়ে বসলো।

তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!

১১
প্রবাসে

ইউরোপ যাত্রার জন্য অর্থসংগ্রহ ও অন্যান্য প্রস্তুতির জন্য ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার পাঁচ মাস কেটে গেল। মহাদেব চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি ছিলেন মধুসূদনের পিতার কর্মচারী। মহাদেবকে মধুসূদন সৎ ও বিশ্বস্ত ব'লেই জানতেন। কারণ, মহাদেব চট্টোপাধ্যায় মধুসূদনকে তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন, এমন কি মোকদ্দমার জন্য টাকাপয়সার ব্যবস্থাও করেছিলেন। তাই মধুসূদন মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী মোক্ষদা দেবীর নামেই তাঁর পৈতৃক ভূসম্পত্তির সুন্দরবনের চক মুনকিয়া ও গদারডাঙার পত্তনিদার নিযুক্ত করলেন। পত্তনিদার নিয়োগের ঐ দলিল ৯ই আশ্বিন ১২৬৮ (১ অক্টোবর, ১৮৬১) তারিখে লেখা হয়।

দলিল থেকে জানা যায়, ২৯৯৭।৷০ টাকা মোক্ষদা দেবী চার কিস্তিতে মধুসূদনকে ইউরোপে পাঠাবেন। যাতে তিনি নিয়মিত ভাবে কাজ করেন, সেজন্য দিগম্বর মিত্র (পরে রাজা) ও মধুসূদনের পিসতুত ভাই বৈদ্যনাথ মিত্রকে প্রতিভূ নিয়োগ করা হয়। দলিলে এঁদের বছরে তিন শ টাকা দেওয়ার নির্দেশও আছে।

দলিলের প্রথমাংশে লেখা আছে:

> আমার (মধুসূদনের) বিষয় উদ্ধার ও দেনা পরিশোধের জন্য আপনার (মোক্ষদা দেবীর) স্বামী অনেক সাহায্য ও যত্ন এবং পরিশ্রম করিয়াছেন এবং অদ্য পর্য্যন্ত আমার মোকদ্দমার খরচ ও দেনা পরিশোধের জন্য ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। তাহাতে উক্ত দুই চক তাঁহাকে কামি বন্দবস্ত করিয়া দিবার অঙ্গীকার ছিল। তদনুযায়ী তাঁহার প্রার্থনা মতে উপরের লিখিত ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা পণে উক্ত চক

মুনকিয়া ও গদারডাঙা ১৮৬৮ সালের প্রথমাবধি আপনাকে মফস্বলে তালুক ও গাঁতিদার করিয়া দেওয়া গেল...।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মধুসূদন তাঁর বাল্যবন্ধু ও কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট ভাই হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে খিদিরপুরের পৈতৃক বাড়িটি সাত হাজার টাকায় বিক্রি করেন।

বিলাত যাওয়ার প্রাক্কালে, ১৮৬২ সালের ৭ই জুন, তিনি একটি দানপত্র ক'রে তাঁর পিতার নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর দুই পিসতুত ভাই বৈদ্যনাথ মিত্র ও দ্বারিকানাথ মিত্রকে আনুমানিক দুই হাজার টাকা দামের চক মুনকিয়ার।১০ অংশ লিখে দেন। ঐ সঙ্গে তিনি নিজেও তিন হাজার টাকা দামের তাঁর সাগরদাঁড়ির পৈতৃক বাসভবনের নিজস্ব অংশ ও অন্যান্য জমিও তাঁদের লিখে দেন।

এইভাবে মধুসূদন তাঁর বিষয়-সম্পত্তির যেসব বিলি-ব্যবস্থা করেন, তাতে তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধির অভাবই প্রমাণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁর বাল্যবন্ধু গৌরদাস বসাক একটি পত্রে লিখেছেন:

> He rode roughshod through his patrimony, for the sake of an idea—the fulfilment of his life's dream, a visit to England.
>
> His talook which one Mohadeb Chatterjee with somewhat like unfair means, got out of him and which yields to the present proprietor an annual income of six thousand rupees, was parted with for a song, in a moment of desperate need. He was improvident, unworldly, unbusinesslike in the extreme.

মধুসূদন স্থির করেন, তিনি একাই ইউরোপ যাবেন এবং তাঁর পত্নী হেনরিয়েটা কন্যা শর্মিষ্ঠা ও শিশুপুত্র মিল্টনকে নিয়ে কলকাতায় থাকবেন। পত্তনিদার মোক্ষদা দেবী তাঁদের ব্যয়নির্বাহের জন্য মাসে

মাসে দেড়শ টাকা দেবেন। মধুসূদন তাঁদের জন্য কিছু টাকা ব্যাঙ্কেও জমা রাখেন। এইভাবে ইংলণ্ড গমনের প্রস্তুতিপর্ব শেষ হয়। তিনি ১৮৬২ সালের ৪ঠা জুন রাজনারায়ণকে একটি চিঠিতে লেখেন:

You will be pleased to hear that I have completed my arrangements, and God willing, purpose to be starting, on the morning of 9th instant, for the steamer "Candia". You must not fancy, old boy, that I am a traitor to the cause of our native Muse. If it hadn't been for the extraordinary success, the new verse has met with, I should have certainly delayed my departure, or not gone at all. I should have stood at my post manfully. But an early triumph is ours, and I may well leave the rest to younger hands, not ceasing to direct the movements from my distant retreat.…

Well—I am off, my dear Rajnarayan! Heaven alone knows if we are to see each other again! But you must not forget your friend. It's a long seperation;—years! But what is to be done? Remember your friend and take care of his fame.

Being a poetaster, I would not think of bolting away without rhyming, and I enclose the result—and I hope the thing is,—if not good—at least *respectable*.

"My Native Land, Good Night!"—*Byron*

বঙ্গভূমির প্রতি

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বসে জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হ'তে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি, মা, ডরি শমনে ;
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে !
সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন ;—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে।
Here you are, old Raj !—All that I can say is—
মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে।

রাজনারায়ণকে এই পত্র এবং শ্যামা জন্মদা বঙ্গভূমির প্রতি এই বিদায়-সম্ভাষণ লেখার পাঁচদিন পরে, ৯ই জুন, ১৮৬২, তারিখে মধুসূদন 'ক্যাণ্ডিয়া' জাহাজে ইউরোপ যাত্রা করলেন। তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যা পূর্ব-ব্যবস্থা মতোই কলকাতায় রইলেন। পথে মধুসূদন সম্ভবতঃ

জাহাজ বদল করেছিলেন। কারণ মাল্টা দ্বীপ পার হয়ে ভূমধ্যসাগর থেকে তিনি যে চিঠি গৌরদাসকে লেখেন, তাতে তিনি S. S. Ceylon জাহাজের ঠিকানা দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ সিংহলে পৌঁছার পর তিনি জাহাজ বদল করেছিলেন। গৌরদাসকে তিনি ১৮৬২ সালের ১১ই জুলাই ঐ পত্রে লেখেন :

> I sit down to scribble a few lines to you my good old friend, from on board the good steamship 'Ceylon'—quite a fairy-castle afloat, my Boy. You have no idea of the magnificence that characterises almost everything on board. The saloon is worthy of a palace, the cabins fit for princes.

তিনি ঐ পত্রে একথাও জানান যে, ঐ সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা ও বিবরণ তিনি 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' কাগজের জন্য লিখে পাঠাবেন। সম্ভবতঃ তাঁর এই ইচ্ছা ইচ্ছামাত্রই থেকে যায়। যাই হ'ক, তিনি ১৮৬২ সালের জুলাই মাসের শেষভাগে ইংলণ্ডে গিয়ে পৌঁছেন। তাঁর আবাল্য স্বপ্নস্বর্গ ইংলণ্ডে পৌঁছে তিনি যে স্বর্গসুখ বোধ করেন নি, তা কিন্তু তাঁর গৌরদাসকে লেখা একটি পত্র থেকে বেশ বোঝা যায়। এখানে তিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও বন্ধু-বান্ধব থেকে দূরে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করতে থাকেন—"The wildness of solitudes in London is more apalling than that of a desert." অবিলম্বে তিনি ব্যারিস্টারি শিক্ষার জন্য লণ্ডনের বিখ্যাত গ্রেজ্ ইনে (Gray's Inn) ভর্তি হলেন। দিনগুলি একরকম শান্তিতেই কাটছিল এবং তিনি পড়াশুনোয় মনোনিবেশ করেছিলেন। এই সময় একটি অভাবনীয় কাণ্ড ঘটলো, যা তাঁর সমস্ত শান্তিকে বিনষ্ট ক'রে দিলো।

ইউরোপ যাত্রার আগে মধুসূদন তাঁর পত্তনিদার ও প্রতিভূদের সঙ্গে এই ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছিলেন যে, তাঁরা ইউরোপে তাঁর ব্যয়-

নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে টাকা পাঠাবেন এবং কলকাতায় তাঁর স্ত্রীকে মাসিক দেড় শ' টাকা ক'রে দেবেন। কিন্তু কিছুদিন ঐ ব্যবস্থা মতো কাজ করবার পর তাঁরা মধুসূদনকে ইউরোপে ও তাঁর স্ত্রীকে কলকাতায় টাকা পাঠানো বন্ধ ক'রে দিলেন। ফলে ইংলণ্ডে মধুসূদন ও কলকাতায় তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা সকলেই মহা বিপদে পড়লেন। হেন্‌রিয়েটা নিতান্ত নিরুপায় হয়ে কোনরকমে পাথেয় সংগ্রহ ক'রে পুত্রকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ১৮৬৩ সালের ২রা মে ইংলণ্ডে মধুসূদনের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। মধুসূদন নিজে অর্থাভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন। এই অবস্থায় তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যা এসে পড়ায় মহা সংকটে পড়লেন। মধুসূদন যে দিগম্বর মিত্রের নামে তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য' উৎসর্গ করেছিলেন, তিনিই ছিলেন তাঁর প্রধান প্রতিভূ। দিগম্বর মিত্র দীর্ঘকাল মধুসূদনের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার ক'রে এসেছেন, সেইজন্য তাঁর প্রতি মধুসূদনের ছিল অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু এই আপৎকালে তিনিও বিমুখ হলেন। মধুসূদন তাঁকে পর পর আটটি চিঠি লিখেও কোন জবাব পেলেন না। মধুসূদন অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লেন।

লণ্ডনে থাকা ব্যয়বহুল হওয়ায় এবং ফ্রান্সের জলবায়ু তাঁর স্ত্রীর দুর্বল শরীরের পক্ষে অধিক অনুকূল হবে না ভাবায় মধুসূদন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে চলে এলেন। পরে তিনি প্যারিস থেকে ভের্সাইয়ে চলে যান। মধুসূদন এই অভাব-অনটন ও অর্থচিন্তার মধ্যেও কাব্য-রচনায় মন দেন। তিনি ভের্সাইয়ে অবস্থানকালে 'ভারত-বৃত্তান্ত' নামে একটি কাব্য রচনা করবার কথা ভাবেন এবং 'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর' নামে অংশটি লিখতে শুরু করেন। 'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর' অংশ তিনি ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর লিখতে শুরু করেছিলেন। 'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর' মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে না লিখে মিত্রাক্ষর ছন্দে লিখতে থাকেন। পয়ারের মতো এতে অন্ত্যমক থাকলেও তিনি এতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতা অক্ষুণ্ণ রাখেন। যেমন—

বিঁধিলা লক্ষ্যেরে পার্থ, আকাশে অপ্সরী
গাইল বিজয়-গীত, পুষ্পবৃষ্টি করি
আকাশসম্ভবা দেবী সরস্বতী আসি
কহিলা এ সব কথা কৃষ্ণারে সম্ভাষি।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের হস্তে এই প্রবহমান পয়ার এক অপূর্ব মাধুর্য, মহিমা ও গতিবেগ লাভ করেছিল এবং এই ছন্দ রবীন্দ্রনাথের একটি অতি প্রিয় ছন্দ হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু শ্রেষ্ঠ কবিতা এই ছন্দেই রচনা করেছিলেন। মধুসূদন এই প্রবহমান পয়ার ছন্দের প্রবর্তক হ'লেও তাকে তিনি সার্থক রূপ দিতে পারেন নি, কারণ, 'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর' তিনি সামান্য রচনার পরই পরিত্যাগ করেছিলেন। এই সময়ে তাঁর মানসিক অবস্থা যে ঠিক কাব্য রচনার উপযোগী ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। পরে তিনি ইউরোপে প্রবাস-কালেই 'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের' পরিবর্তে 'সুভদ্রা হরণ' কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তা-ও তিনি প্রতিকূল মানসিক অবস্থার ফলে পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি সীতা-চরিত্র অবলম্বন ক'রে ইংরেজীতে 'Queen Seeta' নামে একটি কাব্যও রচনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু তা-ও শুরু মাত্রই ছিল।

বিগত কয়েক মাস দেশ থেকে একটি পয়সাও না আসায় মধুসূদনের দুরবস্থা এমন হয়েছিল যে, তিনি স্ত্রীর গহনা, বাড়ির আসবাব. বই ইত্যাদি বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। হোটেলে, দোকানে, সর্বত্রই তাঁর প্রচুর দেনা হয়েছিল। বাড়িভাড়া বাকি পড়েছিল। শেষে অবস্থা এমন চরমে উঠেছিল যে, কেবল অর্ধাহার; অনাহার নয়, ঋণের দায়ে জেলে যাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দিলো। এই অবস্থায় তিনি ১৮৬৪ সালের ২রা জুন—ইতিমধ্যে ইউরোপে মধুসূদনের কিছু কম দুবছর অতিবাহিত হয়েছিল—বিদ্যাসাগরকে একখানি পত্র লিখলেন:

My dear Sir, If you had been an ordinary man,. I should begin this letter with a well-

worded apology for not having written to you so long. But you know well that we never go to a man in the hour of distress unless we regard that man as the truest and sincerest of our well-wishers and friends

You will be startled, I am sure, and grieved to learn that I am at this moment the wreck of the strong and hearty man who bade you adieu two years ago with a bounding heart and this calamity has been brought upon me by the cruel and inexplicable conduct of men, one of whom at least, I felt strongly persuaded, was my friend and well-wisher, namely Baboo D—. The whole thing is a tale of cruel shame, but I must tell it to you in confidence, of course.

তারপর মধুসূদন ঐ পত্রে মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর কি বন্দোবস্ত হয়েছিল এবং দিগম্বরবাবু মহাদেব যাতে তার প্রতিশ্রুতি পালন করেন সে সম্পর্কে কি দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সব কথা জানালেন। তাঁরা উভয়েই তাঁদের প্রতিশ্রুতি পালন না করায় তিনি ইউরোপে এবং তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কলকাতায় ভয়ানক বিপদে পড়েন। স্ত্রী হেন্‌রিয়েটা বাধ্য হয়ে পুত্রকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ১৮৬৩ সালের ২রা মে ইংলণ্ডে তাঁর কাছে চলে আসেন। মধুসূদন লেখেন:

From that day to the present, we have not received a pice from India, although there has been money due, some for the year 1862, and some since December last from the Talooks, and the only letter which Baboo D— wrote to us,

was written just ten months ago. We have since written to him no less than 8 letters, but not a line have we received from him.

মহাদেব চট্টোপাধ্যায় ও দিগম্বরবাবুর এই প্রতিশ্রুতিভঙ্গের ফলে মধুসূদন ও তাঁর পরিবার যে মহাসংকটে পড়েছেন, মধুসূদন ঐ পত্রে তাঁর বর্ণনা দেন :

I am going to a French jail and my poor wife and children must seek shelter in a charitable institution, tho' I have fairly 4000 Rs. due to me in India. The Benchers of Gray's Inn, from whom I was compelled to draw 450 Rs., have suspended me and this is the third term I am losing this time. I also owe 260 Rs. to Monou, who, poor follow, is no doubt quite inconvenienced by my failure to pay him.

মধুসূদন এখানে যে Monou-র নাম উল্লেখ করেছেন, তিনি ছিলেন মধুসূদনের জীবনের শেষ পর্বের অত্যন্ত গুণগ্রাহী বন্ধু মনোমোহন ঘোষ। তিনিও ঐ সময় ব্যারিস্টারি পড়তে বিলাত গিয়েছিলেন। মধুসূদন ঐ পত্রের শেষাংশে বিদ্যাসাগরের কাছে এই মহা বিপদে তাঁকে রক্ষা করবার জন্যে আবেদন জানান :

You are the only friend who can rescue me from the painful position to which my confidence in D— has placed me, and in this, you must go to work with that grand energy which is the companion of your genius and manliness of heart. Not a day is to be lost.…

মধুসূদন ঐ পত্র লেখার কয়েকদিন বাদে ৯ই জুন আবার একটি

পত্র বিদ্যাসাগরকে লেখেন। পাছে বিদ্যাসাগর তাঁর 'ঐ দুখানি পত্র না পান, এইজন্য তাঁকে পরবর্তী ১৮ই জুন (১৮৬৪) তিনি আর একখানি চিঠি কলকাতা পুলিস অফিসের প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের মারফত পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। এই পত্রে তিনি লিখলেন:

February and March, April and the first part of May are gone and not a penny! My God! Have these men conspired among themselves to make me perish in Europe?

তিনি লিখলেন:

If we perish, I hope, our blood will cry out to God for vengeance against our murderers. If I had not little helpless children and my wife with me, I should kill myself, for there is nothing in the instrument of misery and humiliation, however base and low, which I have not sounded. God has given me a brave and proud heart, or it would have broken long ago.

I hope, I shall not have to cry out with Ram in my poem of Meghanad, 'বৃথা হে জলধি বাঁধিনু তোমারে।'...

I hope you will write to me in Frence and that I shall live to go back to India and tell my country that you are not only Vidyasagar, but Karunasagar (করুণাসাগর) also.

ইউরোপ থেকে চিঠি জাহাজ যোগেই আসতো, তাই কিছু কম দু-মাসের আগে চিঠি বিদ্যাসাগরের হাতে পৌঁছা সম্ভব ছিল না। বিদ্যাসাগরের হাতে চিঠি পৌঁছার আগে মধুসূদন জুলাই মাসেও তাঁকে

কয়েকখানি পত্র পর পর লেখেন। ৪ঠা জুলাই তারিখে তিনি জানান:

> I have lost all the terms of this year, and unless you send me money. I shall not be able to return to England by November to keep my Michealmas term.

ঐ সময়ে দেশে তাঁর বিরোধীরা অনেকেই তাঁর সম্পর্কে নানাপ্রকার কুৎসা রটাচ্ছিল। সে সম্পর্কে মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে সতর্ক ক'রে দিয়ে লেখেন:

> I hope, my dear friend, you will not listen to anything the people there may have to say to you. I know my own affairs better than any body else, and I assure you I must have money raised on my property without delay.

মধুসূদন প্রবাসে এই ভয়ংকর অর্থকষ্ট এবং উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার মধ্যেও তাঁর জীবনের চিরসহচর ও পড়াশুনো ও নূতন্ নূতন ভাষা শিক্ষার প্রতি অবহেলা করেননি। হয়তো এই অবস্থায় এগুলিই তাঁর নিরন্তর উদ্বেগ ও অশান্তিকে ভুলিয়ে রাখবার উপায় হয়ে উঠেছিল। তিনি বিদ্যাসাগরকে লেখেন:

> Though I have been very unhappy and full of anxiety here, I have very nearly mastered French. I speak it well and write it better. I have also commenced Italian and mean to add German to my stock of knowledge,—if not Spanish and Portuguese, before I leave Europe.

১১ই জুলাই তিনি অন্য একটি পত্রে লেখেন:

> I hope to be a capital sort of European

scholar before I leave Europe. I am getting well on French and Italian. I must commence German soon. Spanish and Portuguese will not be difficult after Latin, French and Italian. You cannot imagine what beautiful poetry there is in Italian. Tasso is really the Kalidas of Europe.

জুলাই মাসের শেষাশেষি বিদ্যাসাগর মধুসূদনের প্রথম পত্রখানি পেলেন। বিদেশে মধুসূদনের এই বিপদে তিনি অধীর হয়ে উঠলেন। পত্তনিদার ও জামিনদারের সঙ্গে হিসাবনিকাশ ক'রে টাকা পেতে পাছে দেরি হয়, এই ভয়ে বিদ্যাসাগর মধুসূদনের চিঠি পেয়েই ২রা আগস্ট (১৮৬৪) মধুসূদনের নামে দেড় হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলেন। ২রা আগস্ট বিদ্যাসাগর ভের্সাইয়ের ঠিকানায় টাকা পাঠালেও টাকা পৌঁছতে মাসখানেক দেরি হওয়ার কথা। ইতিমধ্যে দিগম্বর মিত্র আট শ' টাকা পাঠিয়েছিলেন এবং ২০শে জুন একটি পত্রে আরও এক হাজার টাকা পাঠাবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দিগম্বর মিত্র-প্রেরিত টাকা হাতে পেয়ে দিনকয়েক মধুসূদন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। কিন্তু দিগম্বরের প্রতিশ্রুত টাকা না পৌঁছায় মধুসূদন আবার অত্যন্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েছিলেন। তাই যেদিন বিদ্যাসাগর মধুসূদনকে ভারত থেকে টাকা পাঠান, সেদিনই, ২রা আগস্ট, ১৮৬৪, তিনি বিদ্যাসাগরকে একটি পত্র পাঠান। তাতে লেখেন :

You cannot imagine how unhappy I am!··· But you must save me, My dear Vidyasagar; for if you do not send me all the money I want by October next, I shall lost another term and remain buried in France as I am at this moment.

তিনি ঐ পত্রে জানান : দিগম্বর তাঁকে এক মাসের মধ্যে এক

হাজার টাকা পাঠাবেন বলেছিলেন। কিন্তু সারা জুলাই মাস কেটে গেল, তাঁর আর কোনও খবর নেই এবং মধুসূদনের অবস্থা আবার পূর্ববৎ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। তিনি ঐ পত্রে বিদ্যাসাগরকে আরও জানান যে, আলিপুর আদালতে তাঁর এক হাজার টাকা প্রাপ্য রয়েছে। ঐ টাকা বি. এন্. মিত্র অতি ত্বরায় পাঠাবেন ব'লে গত ফেব্রুয়ারিতে লিখেছিলেন, কিন্তু আগস্ট হয়ে গেল, এক কানা কড়িও এলো না। খিদিরপুরের জনৈক হরি বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদনের কাছে পাঁচ শ টাকা ধারতেন, তাঁরও কোন সাড়াশব্দ নেই। এই অবস্থায় বিদ্যাসাগর ছাড়া মধুসূদনের আর কি গতি আছে। ঐ সময়ে মধুসূদনের মনের অবস্থা কি রকম ছিল, তা তাঁর পত্রের কয়েক লাইন থেকে বেশ বোঝা যায়:

God help me! My great hope now is in you, and, I am sure, you will not disappoint me. If you do, I must work my way back to India to commit one or two murders—wilful premeditated murders—and then be hanged!

১৮ই আগস্ট তারিখের পত্রে তিনি জানান, ঐ চিঠির জন্য প্রয়োজনীয় টিকিট কেনার পয়সা তাঁকে নিজের জিনিস বন্ধক রেখে সংগ্রহ করতে হয়েছে—অর্থাৎ তিনি কপর্দকহীন, তাঁর সমগ্র পরিবার ও তিনি ঋণের ওপর অপরের দয়ার ওপর বেঁচে আছেন।

তবে মধুসূদনের এই শোচনীয় আর্থিক ও মানসিক অবস্থার শীঘ্রই অবসান হলো, যখন আগস্ট মাসের শেষে তিনি বিদ্যাসাগর-প্রেরিত অর্থ হাতে পেলেন। টাকা পেয়ে অজস্র ধন্যবাদের সঙ্গে তিনি বিদ্যাসাগরকে লিখলেন:

On the morning of last Sunday, the 28th ultimo, as I was seated in my study, my poor wife came to me with tears in her eyes and said "the children want to go to the Fair and I have

only 3 Francs." Why do these people in India treat us this way ?" I said—"The mail will be in to-day and I am sure to receive news, for the man to whom I have appealed, has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother ! I was right ; an hour afterwords, I received your letters and the 1500 Rs. you have sent me. How shall I thank you, my noble, my illustrious, my great friend ? You have saved me.…

মধুসূদন বিদেশে অর্থাভাবে অত্যন্ত বিপদে পড়েছেন জেনে বিদ্যাসাগর তাঁকে মাত্র দেড় হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। তিনি নিজ দায়িত্বে অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তিন হাজার এবং শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছ থেকে পাঁচ হাজাব টাকা ধার নিয়ে ঐ আট হাজার টাকাও মধুসূদনকে পাঠিয়ে দিলেন। বিদ্যাসাগর মধুসূদনের পাওনা এবং মধুসূদনকে টাকা না পাঠাবার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে মহাদেব চ্যাটার্জী তাঁকে বলেছিলেন যে, মধুসূদন তাঁর কাছে টাকা পান না, তাঁর সঙ্গে টাকা-পয়সার হিসাব তাঁর বিলাত যাওয়ার আগেই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেকথা বিদ্যাসাগর মধুসূদনকে জানালে মধুসূদন ৩রা অক্টোবর (১৮৬৪) বিদ্যাসাগরকে লেখেন :

I must confess to you candidly that I feel a great deal troubled about the account with M. Chatterjee. I have given you a list of all the money he has yet paid me. I cannot and do not believe that he settled all accounts with

me before I left India. I therefore hope that you will satisfy yourself on the subject. If you are satisfied, I shall hold my tongue and regret all the hard words I have used with reference to Chatterjea.

বিদ্যাসাগর-প্রেরিত অর্থ পেয়ে মধুসূদন যে তাঁর অভ্যস্ত জীবন-যাত্রার মধ্যে ফিরে এসেছিলেন, তা আমরা জানতে পারি গৌরদাস বসাককে লেখা তাঁর চিঠি থেকে। ঐ সময়ে কলকাতায় তাঁর সম্পর্কে নানা নিন্দা ও অপবাদ শত্রুরা রটনা করছিল। তিনি ইংলণ্ডে এমন সব জঘন্য কাজ করেছিলেন, যার জন্য ইংলণ্ড ছেড়ে ফ্রান্সে গিয়ে তাঁকে বাস করতে হয়েছে এবং তিনি এখন ফ্রান্সের জেলে আছেন, ইত্যাদি নানা অপবাদ তাঁর সম্পর্কে রটনা করা হয়েছিল কলকাতায়। গৌরদাস সে সম্পর্কে মধুসূদনকে লিখলে মধুসূদন এই পত্রে তার জবাব দিয়েছিলেন।

মধুসূদন লিখলেন, তিনি অসুস্থ থাকায় বন্ধুর পত্রের জবাব যথাসময়ে দিতে পারেন নি। তবে তাঁর বন্ধু তাঁর সম্বন্ধে যেসব খবর পেয়েছেন, সেগুলি সবই ভিত্তিহীন—কোনও কল্পনাপ্রবণ দুষ্টবুদ্ধি লোকের সৃষ্টিমাত্র।

"My good friend, know that I am writing this letter to you, not from within the gloomy and frowning walls of a French prison, a modern Bastille, but from a room elegantly fitted up with all the comforts (if not luxuries) of European Civilisation and so forth, and that I have done nothing in London of which even the most virtuous among my friends need be ashamed."

ফ্রান্সে তিনি কেন আছেন, সে সম্পর্কে লেখেন:

.....London is not half so pleasant a place

to live in as this country and its brutal climate does not agree with Mrs. Dutt's health, though I myself am strong enough for any country under the sun. Besides, here I have greater facilities for mastering French and Italian than there......I wish I could live here all the days of my life, with means to take occasional runs to India to see my friends; but I am too poor for that though you needn't have very large fortune to do all that. This is unquestionably the best quarter of the globe. I have better dinners for a few Francs than the Raja of Burdwan ever dreams of! I can for a few Francs enjoy pleasures that it would cost him half his enormous wealth to command,—no, even that would be too little. Such music, such dancing, such beauty! This is the অমরাবতী of our ancestral creed. Come here, and you will soon forget that you sprang from a degraded and subject race. Here you are master of your masters. The man that stands behind my chair, when I dine, will look down upon the best of our princes in India. The girl that pulls off my muddy boots on a wet day, would scorn to touch our richest Rajah in India. Everyone, whether high or low, will treat you as a man, not as a "d—d nigger". But this is Europe, my boy, and not India.

ঐ পত্রে তিনি গৌরদাসকে জানান, কিছুদিন পূর্বে তাঁর একটি মেয়ে হয়েছিল, সে অকালে মারা গেছে। তাঁর কন্যা শর্মিষ্ঠা ও পুত্র মিল্টন ফরাসী কায়দায় মানুষ হয়ে উঠছে। মধুসূদনের ইচ্ছা, গৌরদাসও তাঁর ছেলেকে ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তোলার জন্যে তার বাল্যকালে ইউরোপে পাঠিয়ে দেন। তাতে বছরে দু হাজার টাকার মত খরচ হবে।

মধুসূদন জানান, তিনি স্থির করেছেন, তিনি তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যাকে ফ্রান্সে রেখেই দেশে যাবেন। তাই গৌরদাস তাঁর বালক পুত্রকে তাঁদের কাছে রাখতে পারেন; হেন্‌রিয়েটা বাংলা জানেন, তাই তার কোনও অসুবিধা হবে না। মধুসূদন বলেন, 'Europeanised' হ'তে হ'লে অল্পবয়সেই ইউরোপে আসা চাই। মনোমোহন (ঘোষ) ও সত্যেন্দ্রনাথ (ঠাকুর) বেশি বয়সে বিলাতে আসায় অসুবিধায় পড়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত সর্বপ্রথম ভারতীয় রূপে সাফল্য দেখাতে পারলেও মনোমোহন সিভিল সার্ভিসে উত্তীর্ণ হ'তে পারছেন না।

গৌরদাস বসাককে লেখা এই পত্র থেকে বেশ বোঝা যায়, মধুসূদন অভাব-অনটনের মধ্যেও ব্যয়-হ্রাসের জন্য সচেষ্ট হন নি। তিনি অভ্যস্তভাবেই ইউরোপীয় পদ্ধতিতে পুরোমাত্রায় জীবনযাপন করছিলেন। তাই বিদ্যাসাগর-প্রেরিত অর্থ তাঁর প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাই নভেম্বর মাসের গোড়াতেই (৩রা নভেম্বর) তিনি বিদ্যাসাগরকে একটি পত্রে লেখেন:

> For reasons which I have, as I hope, sufficiently explained to you in one of my late letters, I wish to go to London alone. I, therefore, trust you will manage the matter so for me, that we might not again be driven to the stormy waters from which you have rescued us.

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি (১৬ই নভেম্বর) আর একটি পত্রে তিনি লেখেন:

Knowing as I do, how your time is occupied, feel reluctant to trouble you ; but my apology is that of a desperate man. I have no one who apparently cares for me ! If you abandon me. I must sink ! Unless called to the bar, I could never return to India, for, in the first place, what am I to do there ? My miserable income is too small for a man of my habits to live comfortably upon ; in the second place such a step would make my enemies laugh, and I am sorry to see that I have many. Who are the rascals that are constantly giving currency to lying reports about me at Calcutta ! They cannot be friends—of that I am sure.

দুই সপ্তাহ কাল পরে ২রা ডিসেম্বর (১৮৬৪) মধুসূদন পুনরায় বিদ্যাসাগরকে লেখেন :

…You will have by this time (I hope) learnt from my late letters that I have lost the last 'Term' of the year, now hastening to complete its term of existence, and that all my money is over ! Am I destined to experience again the horrors to which I was exposed by the merciless silence of Digumber Mitter about the beginning of the year ? The idea is frightful !

মধুসূদনের জন্য নিয়মিত এত টাকা বিদ্যাসাগরের সরবরাহ করা নিজের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি মধুসূদনের নামে ঋণ সংগ্রহের জন্য মধুসূদনকে তাঁকে পাওয়ার অব এটর্নি বা ওকালতনামা লিখে

পাঠাতে বললেন। মধুসূদন একটি ওকালতনামা লিখে পাঠালেন: কিন্তু তাতে ত্রুটি থাকায় বিদ্যাসাগর তা সংশোধন ক'রে লিখে পাঠাতে বললেন। মধুসূদন প্যারিসের একজন এটর্নিকে দিয়ে ওকালতনামা লিখে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে পাঠালেন। ঐ ওকালতনামার সঙ্গে তিনি পত্রও পাঠালেন। তাতে লিখলেন:

> Should the new 'Power' fail to satisfy, you must send me telegraphic message and then write your letter in English and get me a certificate, (duely attested) from the Head Office of the French Bank at Calcutta in French to say that I am a man of property and not a penniless adventurer. If you cannot or do not do all that, I shall be in the greatest distress imaginable! Why does not Chatterjea pay and settle his accounts?...

বিদ্যাসাগর ওকালতনামা পাওয়ার পরে মধুসূদনের ইউরোপে থাকা ও পড়াশুনো করবার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করলেন, প্রায় আরও বারো হাজার টাকা বিভিন্ন সময়ে সংগ্রহ ক'রে পাঠালেন। মধুসূদন তাঁর ভূসম্পত্তি বিক্রয় ক'বে তাঁকে অর্থ সংগ্রহ ক'রে দিতে বার বার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তা করেন নি। তিনি মধুসূদনের সম্পত্তিকে যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখেছিলেন, মধুসূদন বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এলে তাঁর ভূসম্পত্তি বিক্রয়ের প্রয়োজন হবে না, নিজ আয় থেকে সহজেই তিনি ঋণ শোধ করতে পারবেন, এই দৃঢ় ধারণা বিদ্যাসাগরের ছিল। এ সম্বন্ধে গৌরদাস তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছিলেন: "He (Madhu) was reckless, extravagant, improvident and woeful spendthrift. But when he was thrown overboard by D—, he was

worth 30000 Rs. and no wonder that he should insist on Vidyasagar to sell his property and save him. Vidyasagar could have easily sold that *Abad* which Mahadeb held in Patnee, but refrained from doing the extreme step in hopes of leaving Madhoo free to do what he liked or thought best on his return to his country……"

বিদ্যাসাগর মধুসূদনের আর্থিক সমস্যা সমাধান করলে মধুসূদন ১৮৬৫ সালের শেষভাগে ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ডে যান এবং ব্যারিস্টারি পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হ'তে থাকেন। বিদ্যাসাগরের অকুণ্ঠ ও আন্তরিক প্রচেষ্টা ছাড়া মধুসূদনকে যে বিদেশে অনাহারে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ মরতে হ'তো, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে এক দুরপনেয় কলঙ্ক হ'তো। বিদ্যাসাগর শুধু মহাসংকটে সেদিন মধুসূদনকেই রক্ষা করেননি, সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে এক দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা থেকে নিষ্কৃতি দেন। বাঙ্গালী জাতি সেজন্যে বিদ্যাসাগরের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। মধুসূদনও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন একটি অমর কবিতায়ঃ

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হিমাদ্রির হেমকান্তি অম্লান-কিরণে।
কিন্তু ভাগ্যবলে পেয়ে সে মহা পর্ব্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সে জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ! কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;

যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘশিরঃ তরুদল, দাসরূপ ধরি ;
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে ;
দিবসে শীতলশ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে।

কিন্তু ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ডে যাওয়ার আগে, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, মধুসূদন আর একটি সাহিত্যকীর্তি স্থাপন করলেন—বাংলা ভাষায় সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার প্রবর্তন ক'রে। কয়েক বছর আগে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসেই তিনি তাঁর এই ইচ্ছার কথা রাজনারায়ণ বসুকে একটি পত্রে জানিয়েছিলেন। নমুনাস্বরূপ একটি সনেট—'কবি-মাতৃভাষা'—লিখেও পাঠিয়েছিলেন। ফ্রান্সে অবস্থান-কালে তাঁর সনেট রচনার ইচ্ছা পুনরায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। তিনি দেশে থাকার সময়ে ইতালীয় ভাষা শিখলেও, ফ্রান্সে এসে ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় পরিপূর্ণ অধিকার লাভ করেছিলেন। ঐ সময়ে ইতালির বিখ্যাত কবি ফান্সিস্কো পেত্রার্কার কবিতা তাঁকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল এবং পেত্রার্কা-রচিত সনেটের অনুকরণে বাংলা ভাষায় মধুসূদন সনেট লিখতে শুরু করেছিলেন। তিনি ১৮৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে গৌরদাসকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে লেখেন :

You again date your letter from Bagirhat. Is this Bagirhat on the bank of my own native river? I have been lately reading Petrarca, the Italian Poet, scribbling some 'sonnets' after his manner. There is one addressed to this very river কবতক্ষ।

ঐ চিঠির সঙ্গে মধুসূদন গৌরদাসকে চারটি সনেট পাঠান—অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, জয়দেব, সায়ংকাল ও কবতক্ষ নদ। তিনি কবিতাগুলি যতীন্দ্রমোহন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং রাজনারায়ণ বসুকে দেখাতে

বলেন এবং তাঁদের মতামত জানতে চান। তিনি লেখেন: "I dare say the sonnet "চতুর্দশপদী" will do wonderfully well in our language." তিনি ঐ পত্রে লেখেন যে, তিনি পত্রের সঙ্গে তিনটি সনেট পাঠাচ্ছেন। কিন্তু গৌরদাস বসাককে লেখা যতীন্দ্রমোহনের চিঠি থেকে জানা যায়, চিঠির সঙ্গে চারটি সনেট ছিল। ভারতচন্দ্র সম্পর্কে সনেটটি ('অন্নপূর্ণার ঝাঁপি') সম্পর্কে মধুসূদন বলেন: "I add a third: I flatter myself that since the day of his death ভারতচন্দ্র রায় never had such an *elegant* compliment paid to him." অন্যপক্ষে যতীন্দ্রমোহন তাঁর চিঠিতে লেখেন: "Of the four I give greater preference to two. I mean the one addressed to Jaideb and the other describing Evening." মধুসূদন সম্ভবত তাঁর চিঠিখানি লেখার পরে "জয়দেব" সম্পর্কে তাঁর সনেটটিও ঐ সঙ্গে দিয়েছিলেন। ঐ চিঠিতে লিখেছিলেন: "I hope to come out with a small volume, one of these days." এ থেকে মনে হয় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই তিনি অনেকগুলি সনেট লিখে ফেলেছিলেন।

ঐ পত্রে তিনি বাংলা ভাষার শক্তি সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় মতামত পুনরায় ব্যক্ত করেন:

> Believe me, my dear Fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up. Such of us as, owing to early defective education, know little of it and have learnt to despise it, are miserably wrong. It is, or rather, it has the elements of a great language in it.

তিনি লেখেন, তিনি এই ভাষার উন্নতিসাধনে জীবন উৎসর্গ করতে

পারতেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠছে না। তাছাড়া, আমাদের দেশে অর্থ ছাড়া কারো কোনও মানমর্যাদা নেই। সুতরাং অর্থোপার্জন অবশ্য প্রয়োজন। অর্থোপার্জনের জন্য তিনি যদি বাংলা সাহিত্যের সেবা পুরোপুরি করতে না পারেন, তবে তিনি যা করেছেন, তা নিয়েই দেশবাসীর সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

> I wish I could devote myself to its cultivation, but, as you know, I have not sufficient means to lead a literary life and do nothing in the shape of real work for a living. I am too poor, perhaps too proud to be a poor man always. There is no honour to be got in our country without money. If you have money, you are বড়মানুষ, if not, nobody cares for you। We are still a degraded people. Who are the "বড়মানুষ" among us? The nobodies of Chorebagan and Barrabazar! Make money, my Boy, make money! If I haven't done something in the literary line, if I do possess talents, I have not the means of cultivating them to their utmost content and our nation must be satisfied with what I have done.

মধুসূদন-প্রেরিত চারটি সনেটের দুটি—কবতক্ষ নদ ও সায়ংকাল—রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'রহস্য সন্দর্ভ' কাগজে প্রকাশ করেন। মধুসূদনের অন্যান্য রচনার মতোই সনেটও তাঁর সুধী বন্ধুমহলে প্রশংসিত হয়। মধুসূদনের কোন কোনও ইউরোপীয় বন্ধুও ঐগুলির মধুসূদনকৃত অনুবাদ প'ড়ে সেগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। মধুসূদন শত অভাব-অনটন, উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা এবং অশান্তির মধ্যেও অতি দ্রুত একশটি সনেট রচনা করেন।

মধুসূদনের এই সনেটের মাত্র পাঁচটি ইউরোপীয় বিষয় বা ব্যক্তিদের নিয়ে লেখা। বাকী সবগুলিই লেখা এদেশীয় বিষয় ও ব্যক্তিদের নিয়ে। তিনি বিদেশে দূর প্রবাসে থাকলেও তাঁর মন যে সর্বদা স্বদেশের পুণ্য স্মৃতিতে ও স্বপ্নে বিভোর ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। 'বিদ্যাসাগর' সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত সনেটটি আগেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তন করেছিলেন—প্রাচীনের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছিলেন। তাই বলে প্রাচীন বা তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র উপেক্ষা বা অশ্রদ্ধার মনোভাব ছিল না। তিনি তাঁর সনেটগুলিতে কাশীরাম দাস, কবি কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, জয়দেব, কালিদাস, বাল্মীকি প্রভৃতি পূর্বসূরীদের প্রায় সকলকেই একে একে প্রণাম জানিয়েছেন। তিনি কবিকঙ্কণ সম্পর্কে লিখেছেন :

কবিতা-পঙ্কজ-রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে!

ভারতচন্দ্রকে উদ্দেশ ক'রে বলেছেন :

তব বংশ-যশঃ-ঝাঁপি অন্নদামঙ্গল—
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে॥

কবি কাশীরাম দাস সম্পর্কে লিখেছেন :

—ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে!
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্॥

কবি কৃত্তিবাস সম্পর্কে বলেছেন :

জনক জননী তব দিলা শুভক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা !—কীর্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে···

কালিদাস সম্পর্কে বলেন :

কবিতা নিকুঞ্জে তুমি পিক-কুলপতি !
কার গো না মজে মনঃ ও মধুর স্বরে ?

যে কবি ঈশ্বর গুপ্তের রাজত্বকালে মধুসূদন কাব্যসাহিত্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর সম্পর্কেও মধুসূদন লিখেছিলেন :

···এই ভাবি মনে,—
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতাভস্ম রাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে ?

রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরলেন (তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় যিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন), তখন মধুসূদন তাঁকে একটি সনেটে আশীর্বাদ জানালেন :

···দূর বঙ্গে বহিবে সত্বরে
এ তোমার কীর্তিবার্তা ।—যাও দ্রুতে তরি,
নীলমণিময় পথ অপথ সাগরে !
অদৃশ্যে রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী
বঙ্গলক্ষ্মী ! যাও, কবি আশীর্বাদ করে !—

'বউ কথা কও' পাখি থেকে 'হিড়িম্বা রাক্ষসী', 'মেঘদূত' থেকে 'বটবৃক্ষ', 'সূর্য' থেকে 'সীতা দেবী', 'শ্রীপঞ্চমী' থেকে 'শনি গ্রহ', 'ঈশ্বর পাটনী' থেকে 'উর্বশী'—মধুসূদনের কল্পনার রথ সর্বত্রই বিচরণ করেছে। ইউরোপীয় বিষয় নিয়ে তিনি যেসব কবিতা লিখেছিলেন, সেগুলিতে

তিনি সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিত গোল্ডস্টুকার, ইংরেজ কবি আলফ্রেড টেনিসন, ফরাসী কবি ভিক্তর হিউগো এবং ইতালীয় কবি আলিঘিয়েরি দান্তেকে নমস্কার জানিয়েছেন, আর বর্ণনা করেছেন ভের্সাইয়ে অবস্থিত রাজা চতুর্দশ লুইয়ের বিখ্যাত প্রাসাদ ও উদ্যানের।

মধুসূদন যখন ফ্রান্সে ছিলেন, তখন ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে বিখ্যাত ইতালীয় কবি দান্তের (জন্ম মে, ১২৬৫ খ্রীঃ—মৃত্যু সেপ্টেম্বর, ১৩২১) ষষ্ঠশত জন্মবার্ষিকী মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হচ্ছিল। সমগ্র পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ কবিরা দান্তের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। কিন্তু প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের তখনও সাহিত্য-সংস্কৃতির যোগসূত্র এমনভাবে গ্রথিত হয়নি, যাতে প্রাচ্যও এই কবি-মহোৎসবে যোগ দেয়। কিন্তু সে অভাব মেটালেন মধুসূদন। ঐ সময়ে প্রাচ্যে আর কোনও কবি ছিলেন না, যিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের অমৃতধারায় আকণ্ঠ নিমগ্ন ছিলেন। সত্যকথা বলতে কি, আজ পর্যন্ত প্রাচ্যের আর কোনও কবি পাশ্চাত্যের এতোগুলি ভাষা ও সাহিত্যকে—গ্রীক, লাতিন, ইংরেজী, ফরাসী, ইতালীয় ও জার্মান ভাষাও সাহিত্যকে এমনভাবে অধিগত করতে সমর্থ হন নি। তাই পাশ্চাত্য কবির জন্ম-মহোৎসবে প্রতিনিধিত্ব করবার পক্ষে মধুসূদনের মতো উপযুক্ত পাত্র আর কে ছিলেন বা আজও আছেন?

মধুসূদন মহাকবি দান্তের উদ্দেশে একটি সনেট রচনা ক'রে নিজে ঐ কবিতা ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় কবিতাকারে অনুবাদ ক'রে ইতালির রাজা ভিক্তর ইমানুয়েলের কাছে পাঠালেন। মধুসূদনের "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" কাব্যগ্রন্থের এটি ৮২তম কবিতা, নাম 'কবিগুরু দান্তে'।

নিশান্তে সুবর্ণ-কান্তি নক্ষত্র যেমতি
(তপনের অনুচর) সুচারু কিরণে
খেদায় তিমির-পুঞ্জে ; হে কবি, তেমতি
প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে
অজ্ঞান। জনম তব পরম সুক্ষণে।

নব কবিকুল পিতা তুমি, মহামতি,
ব্রহ্মাণ্ডের এ সুখণ্ডে। তোমার সেবনে
পরিহরি নিদ্রা পুনঃ জাগিলা ভারতী।
দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে
সে বিষম দ্বার দিয়া বিষম নরকে,
যে বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি আশা, পশে
পাপ প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে।
যশের আকাশ হ'তে কভু কি হে খসে
এ নক্ষত্র? কোন্ কীট কাটে এ কোরকে?

রাজা ভিক্তর ইমানুয়েল এই কবিতাটি পড়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর পরিবার-সচিবের মারফত স্বীয় নামাঙ্কিত একটি পত্র লিখে মধুসূদনকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। রাজ-পরিবারের সচিব মধুসূদনকে লিখেছিলেন:

> ···The king, my august sovereign, has received the poem on Dante which you have so graciously offered on the occasion of the centenary of our national poet.
>
> His Imperial Majesty has heard with lively satisfaction that the profound and noble harmony of the Italian genius finds an echo on the shores of the Ganges and he welcomes with pleasure the oriental flower, which you desiré to place on the grave of Alighieri and he thinks that the moment is not very distant when Italy will see accomplished her auspicious destiny of being the ring which will unite the orient with the accident.···

মধুসূদন ফ্রান্সে অবস্থানকালে 'সুভদ্রাহরণ' নামে একটি কাব্যও রচনা করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাও 'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের' মতো বেশী দূর এগোয়নি। তিনি তাঁর 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যকে নূতন ক'রে লিখতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টাও তিনি শীঘ্রই ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ইংরেজী অনুবাদও কিছুটা করেন। ঐ সময়ে তিনি ফরাসী কবি লা ফঁতেনের অনুকরণে কতকগুলি নীতিগত কবিতাও লেখেন—'ময়ূর ও গৌরী', 'কাক ও শৃগালী', 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা'। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে মধুসূদন ভের্সাই থেকে চতুর্দশপদী কবিতাগুলি, এবং অসমাপ্ত কাব্যাংশগুলি কলকাতায় পাঠান। ঐসব কবিতা একত্রিত ক'রে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ স্ট্যানহোপ প্রেসের মালিক ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানী ১৮৬৬ সালের ১লা আগস্ট প্রকাশ করেন। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'ই মধুসূদনের শেষ কাব্যগ্রন্থ। নগেন্দ্রনাথ সোম লিখেছেন: " 'সমাপ্তে' নামক কবিতায় 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' সমাপ্ত। এই কবিতায় মধুসূদনের কবি-জীবনেরও যবনিকাপাত হইয়াছে।"—একথা সত্য।

১৮৬৫ সালের শেষাশেষি মধুসূদন ব্যারিস্টারি পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হওয়ার ইচ্ছায় সপরিবারে ইংলণ্ডে চলে এলেন। বিদ্যাসাগরের কৃপায় আর্থিক দুশ্চিন্তা তাঁর অনেক পরিমাণেই এখন লাঘব হয়েছিল। সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিত গোল্ডস্টুকার মধুসূদনকে এখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঐ পদটি অবৈতনিক হওয়ায় মধুসূদন এই সম্মান প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি ১৮৬৭ সালের ১৭ই জানুয়ারি বিদ্যাসাগরকে লেখা তাঁর পত্রে জানান: Dr. Goldstucker (of whom you have no doubt heard) was very anxious to have me, but I told him plainly that I was too poor to live in England without a handsome salary…"

পরীক্ষায় পাশ করা মধুসূদনের জীবনে কখনও কঠিন হয় নি, ব্যারিস্টারির ক্ষেত্রেও হ'লো না। তিনি ১৮৬৬ সালের ১৭ই নভেম্বর গ্রেজ্ ইন্ থেকে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় পাশ ক'রে বেরুলেন। পরীক্ষা দিয়েই মধুসূদন আবার সপরিবারে ফ্রান্সে চ'লে এসেছিলেন। সেখান থেকেই তিনি পরীক্ষার ফল জানতে পারলেন এবং স্বদেশে ফেরার সংকল্প বিদ্যাসাগরকে ১৮৬৬ তারিখের ৯ই ডিসেম্বর একটি পত্রে জানালেন :

I am now in France with my family, for we can live here for less money than in England. If the mail, now approaching us fast, bring money, I hope to leave Europe by the Bombay steamer of the fifth January and reach Calcutta about the early part of February, just to see our Indian winter expire.

মধুসূদন জানালেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যাকে ফ্রান্সে রেখে একাই দেশে ফিরতে চান। বিদ্যাসাগর তাঁকে সপরিবারে দেশে ফিরতেই পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাই তিনি ঐ পত্রে লিখলেন :

I earnestly entreat you not to fancy that I am capable of treating your advice lightly, but in this matter, I think you are misled by the idea that living in Europe is dear. However strange the assertion might appear to you, I assure you that Europe is the cheapest quarter of the globe in many respects.···

তাই তিনি স্থির করেছিলেন, যতোদিন না ব্যারিস্টারিতে তাঁর আয় ঠিকমত শুরু হয়, ততোদিন তিনি ফ্রান্সেই তাঁর পরিবারকে রাখবেন। মাসে দু শ থেকে তিন শ টাকা হ'লে ইউরোপে তাঁর স্ত্রী ও

পুত্রকন্যার ভালোভাবেই চলে যাবে। আর তিনি একটি দোতলা বাড়ির উপরতলা ভাড়া নিয়ে একজন পাচক ও একজন চাকর নিয়ে কলকাতায় থাকবেন।

বিদ্যাসাগর-প্রেরিত টাকা সময়মতো পৌঁছায় মধুসূদন ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি একাকীই স্বদেশে রওনা হলেন এবং যথাসময়ে স্বদেশে ফিরলেন। এইভাবে প্রবাসে মধুসূদনের অতি মূল্যবান জীবনের পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হ'লো। ঐ পত্রে মধুসূদন লিখেছিলেন: "It now remains to be seen এ বৃক্ষে কি ফল ফলিবে।" কেবল মধুসূদন নয়, তাঁর সকল শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ও অনুরাগীই তা সাগ্রহে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

১২

আশা কুহকিনী

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়াতেই মধুসূদন স্বদেশে ফিরলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর বন্ধু সুকিয়া স্ট্রীটের রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনের বাইরের অংশে দোতলার ঘরগুলি মধুসূদনের থাকার জন্যে ইউরোপীয় রুচি অনুযায়ী সজ্জিত ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু মধুসূদন সে বাড়িতে না উঠে উঠলেন সাহেব-পাড়ার স্পেন্সেস্ হোটেলে। হোটেলটি ছিল রাজভবনের পশ্চিম দিকে। এই হোটেলে থাকা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য ছিল। সুতরাং মধুসূদনের ঐ হোটেলে ওঠা ও বাস করা নিতান্তই অবিবেচনার কাজ হয়েছিল। তিনি যদি বিদ্যাসাগরের ব্যবস্থা মতো বাঙ্গালী-পল্লীতে থাকতেন এবং জীবনযাত্রার মান ও ব্যয় হ্রাস করতেন, তবে তাঁকে নিশ্চয় আবার এতো তাড়াতাড়ি সংকটের সম্মুখীন হ'তে হ'তো না। এই হোটেলে তিনি আড়াই বছর ছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কিছুদিন মিসেস্ হেরিংস্ হোটেলে ছিলেন।

কলকাতায় পৌঁছার অল্পকাল পরেই ২০শে ফেব্রুয়ারি তিনি হাইকোর্টে ব্যারিস্টাররূপে যোগদানের অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বার্নস্ পীককের কাছে আবেদন করলেন। বিচারপতি পীকক তাঁর আবেদন মঞ্জুর করতে চাইলেন এবং তাঁকে লক্, বেলী, নরম্যান, কেম্প্, গ্লোভার, সিটন্কার প্রভৃতি বিচারপতিরা সমর্থন করলেন। কিন্তু বিচারপতি জ্যাকসন ও ম্যাক্ফারসন বললেন, "আগে এঁর চরিত্র সম্পর্কে তদন্ত করা হ'ক।" বিচারপতি সিটন্কার ও বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত মধুসূদনের চরিত্র হাইকোর্টে তাঁর প্রবেশাধিকার পাওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ব'লে লিখলেন। বিচারপতি

জ্যাক্সন ও ম্যাক্ফারসন ছিলেন ঘোর ভারতীয়-বিদ্বেষী। ভারতীয়রা ব্যারিস্টাররূপে হাইকোর্টে যোগদানের সুযোগ যতো কম পায়, সেজন্যে তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। এ দেশীয় কিছু ব্যারিস্টারও মধুসূদনের মতো একজন প্রতিভাবান্, ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ও সুবক্তা ব্যক্তি যাতে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে আবির্ভূত হ'তে না পারেন, সেজন্যে সচেষ্ট হলেন। তাঁরা মধুসূদনের চরিত্র সম্পর্কে নানা কাল্পনিক কুৎসা রটাতে লাগলেন। এর ফলে যেসব বিচারপতি প্রথমে তাঁর প্রবেশাধিকার অনুমোদন ক'রে মত দিয়েছিলেন, তাঁদেরও অনেকে সমর্থন প্রত্যাহার ক'রে নিলেন। এই অবস্থায় প্রধান বিচারপতি বার্ন্‌স্ পীকক নিজের পরিপূর্ণ ইচ্ছাসত্ত্বেও মধুসূদনকে হাইকোর্টে প্রবেশাধিকার দিতে ইতস্তত করতে লাগলেন। বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত তখন মধুসূদনকে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে এদেশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করতে পরামর্শ দিলেন।

মধুসূদন প্রথমে তাঁর আবেদনপত্রের সঙ্গে দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি কয়েকজনের প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন। কিন্তু সেগুলি যথেষ্ট নয় বিবেচনা ক'রে তিনি এখন আরও কিছু প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করতে বাধ্য হলেন। তাঁকে সানন্দেই প্রশংসাপত্র দিলেন রাজা কালীকৃষ্ণ, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ, রমানাথ ঠাকুর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, রাজকৃষ্ণ ব্যানার্জী, রায় বাহাদুর কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, হীরালাল শীল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, টিপু সুলতানের পুত্র গোলাম মহম্মদ, রাজেন্দ্র মল্লিক, দেবেন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ফলে হাইকোর্টে মধুসূদনের প্রবেশাধিকার রোধ করা সম্ভব হ'ল না। হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চ্ ১৮৬৭ সালের ৩রা মে মধুসূদনকে হাইকোর্টের অ্যাডভোকেটরূপে যোগদানের অনুমতি দিলেন।

মধুসূদন সম্ভবত বন্ধুদের চেষ্টায় ও নিজের পূর্বখ্যাতির ফলে

গোড়ার দিকে যথেষ্ট মামলা পেতে শুরু করেন। তা থেকে তাঁর যে বেশ আয়ও হ'তে থাকে, ঐ সময়ে গৌরদাস বসাককে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে তা বেশ বোঝা যায়। মধুসূদন লেখেন :

> I am afraid, old Fellow, I shall not be able to go to your part of the world this time, unless very dearly paid for. I have work (criminal) almost everyday and you know I am bound to make as much money as I can and not to neglect work for pleasure.

কিন্তু আইনব্যবসায়ে মধুসূদনের সূচনা আশাপ্রদ হ'লেও তিনি এই ব্যবসায়ে আশানুরূপ উন্নতি করতে পারেন নি। যে মনোমোহন ঘোষ ইংলণ্ডে মধুসূদনের অনুরাগী সহচর ছিলেন, তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষায় বিফল হওয়ায় তাঁর ব্যারিস্টারি শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে লিখেছিলেন :

> I suppose poor Monu will have to take to the Bar; but then the question is—has he abilities enough to succeed in that? Does he know English enough to address an English jury for hours in the teeth of English opposition without breaking down?

একথা সত্য, সে যুগে মধুসূদনের মতো ইংরেজী-জানা ভারতীয় অতি অল্পই ছিলেন। কিন্তু ইংরেজী জানাই যে ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ের প্রধান কথা নয়, তা মনোমোহন ঘোষই প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছিলেন। মনোমোহন ঘোষ ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ও সুবক্তা মধুসূদন তাতে সাফল্য লাভ করেন নি। হিন্দু প্যাট্রিয়টের সম্পাদক লিখেছিলেন, "nurshed on the lap of poetry he (মধুসূদন) was not the man

to suck the moisture of life from the dry bones of law."

তাঁর ব্যারিস্টারি-ব্যবসায়ের প্রধান অন্তরায় ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। মধুসূদনের কৈশোর ও যৌবনের সে মধুর কণ্ঠস্বর আর ছিল না—দূর মাদ্রাজ প্রবাসেই বসন্ত রোগের ফলে বা অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা করায় তাঁর ভগ্ন কণ্ঠস্বর বিচারকদের কাছে প্রীতিকর মনে হ'তো না।

তাছাড়া বিচারকদের মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তিনি অনেক সময় বিচারকদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক ও বাদানুবাদ করতেন এবং তাঁদের মুখের উপর রূঢ় সত্য কথা বলতেও কুণ্ঠিত হতেন না। একবার বিচারপতি জ্যাক্‌সন মধুসূদন উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা করায় বিরক্ত হয়ে মধুসূদনকে বললেন: "The Court orders you to plead slowly, the Court has ears." মধুসূদন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "But pretty too long, my Lord." (ইংরেজীতে "লম্বা কান আছে" বলার অর্থ গাধার সঙ্গে তুলনা করা।) তাঁর বন্ধু গৌরদাস তাঁকে বিচারকদের সঙ্গে বাদানুবাদ না করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন: Michael can ne'er brook anybody's bullying."

তার ওপর ছিল মধুসূদনের সাহিত্য ও নাটকের নেশা। সাহিত্যালোচনা বা নাট্যাভিনয় সম্পর্কে আলোচনা পেলে মধুসূদন মামলার কথা ভুলে যেতেন। তিনি সাহিত্যিক ও নাট্যরসিক বন্ধুদের নিয়ে মেতে উঠতেন। এইসব নানা কারণে মধুসূদন ব্যারিস্টারি-ব্যবসায়ে আশানুরূপ উন্নতি করতে পারেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যদি অমিতব্যয়ী না হতেন, তবে তিনি যা আয় করতেন, তাতে তাঁর অসুবিধা হ'তো না। কিন্তু তিনি যে রাজোচিত মন নিয়ে জন্মেছিলেন, তাতে 'মিতব্যয়িতা' ব'লে কোনও শব্দের স্থান ছিল না। তাই অর্থচিন্তা তাঁর অন্যান্য চিন্তাকে সর্বদাই আচ্ছন্ন ক'রে রাখতো।

আইন-ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যে দীর্ঘ ধৈর্য ও সংযমের প্রয়োজন হয়, তা-ও মধুসূদনের বিন্দুমাত্র ছিল না। ইংলণ্ডে কয়েক বৎসর অত্যন্ত উদ্বেগ ও অশান্তির মধ্যে কাটানোর ফলে মধুসূদনের শারীরিক ও মানসিক শক্তিও অত্যধিক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল। ভূদেববাবু বিলাত-প্রত্যাবৃত মধুসূদন সম্পর্কে বলেছেন :

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মধু একবার আমার সহিত চুঁচুড়ার বাটীতে দেখা করিতে আসিয়াছিল। তখন তাহার পূর্বের মত চেহারা ছিল না। চক্ষু আর সেরূপ সমুজ্জ্বল ছিল না, পূর্বের মত সেই অতি সুমিষ্ট স্বর এক্ষণে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছিল, ঠোঁট পুরু এবং শরীরও স্থূল হইয়াছিল। মধুর পোশাক সাহেবী, কিন্তু আমার সহিত কথাবার্তার পর কিরূপ মনের ভাব উপস্থিত হওয়ায় মধু কাপড় চাহিল, বলিল, "আমাকে কাপড় দেও, আমি কাপড় পরিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া খাইব।" ঐ সময়ে মধুর মনে কি ভাব উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। বোধ হয়, আমার মনে তখন যাহা হইয়াছিল তাহার মনেও তাহাই হইয়া থাকিবে। আমার মার কথা মধুর স্মরণ হইয়া থাকিবে, কিন্তু আমি সে সময়ে মুখ ফুটিয়া তাহার নিকট আমার মার নাম আনিতে পারিলাম না, কারণ এ মধু আর সে মধু ছিল না। সে মধু প্রকৃতির হস্ত-বিনির্মিত প্রোজ্জ্বল প্রতিভাসম্পন্ন এবং যশোলিপ্সু পবিত্র মানবরত্ন ছিল, কিন্তু এ মধু এক্ষণে বিজাতীয় শিক্ষা ও সংসর্গে বিকৃত, অনুকরণাধিক্যে মলিনীকৃত এবং কবির চক্ষে "নিমে দত্তের" আদর্শীভূত।

ভূদেববাবুর এই বর্ণনা অতীব সত্য ছিল। যে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে মধুচক্র রচনা করেছিলেন, বিলাত-প্রত্যাগত মধুসূদন আর সে মধুসূদন ছিলেন না। তাঁর সৃজনীশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়েছিল, তবে পূর্বের মতো তিনি এখনও নাট্যামোদী ছিলেন। তিনি আর কোনও নূতন নাটক রচনায় হাত না দিলেও নাট্যাভিনয় সম্পর্কে তাঁর

উৎসাহের সীমা ছিল না। তিনি যখন বিলাতে ছিলেন, তখন ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনটি এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে "কৃষ্ণকুমারী" নাটকটি শোভাবাজার থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক অভিনীত হয়েছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'পদ্মাবতী' নাটকখানিও কলকাতার বহু ধনী গৃহে অভিনীত হয়েছিল। মধুসূদন ফিরে আসার পর গরানহাটার 'বেঙ্গল অ্যামেচার থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি' তাঁর 'পদ্মাবতী' নাটকখানি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর অভিনয় করে। কয়েকজন ধনীপুত্র এই অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁরা মধুসূদনকে প্রায়ই এই নাটকের বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে নিয়ে আসতেন এবং প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করতেন। নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর মধুস্মৃতিতে লিখেছেন:

> 'পদ্মাবতী' নাটক প্রথমে আদ্যোপান্ত গদ্যে লিখিত হয়। তাঁহারা তাঁহাকে ঐ নাটকের কিয়দংশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিলে, মধুসূদন বলেন, 'তবে বুড়ী বেটীকে ডাকি'। পরে তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'তোরা লেখাপড়া ত কিছু করিস্ নি, তোদের ভিতর কি কেউ কলম ধরতে পারে?' তখন মণিলাল সেন নামক ছোট-আদালতের জনৈক উকীল কাগজ কলম লইয়া বসিলেন। মধুসূদন তখন নাটকের অঙ্কের গদ্যাংশ দেখিয়া, এমনিভাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দে উক্ত অংশ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন যে, সকলের মনে হইল, তিনি পুস্তক দেখিয়া শ্রুতিলিখন (dictation) লিখাইতেছেন।

'পদ্মাবতী' নাটক আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত হয়েছিল, সত্য। কিন্তু *গরানহাটার শৌখিন নাট্যসম্প্রদায় যখন 'পদ্মাবতী' নাটক অভিনয়* করেছিলেন, তা মুদ্রিত পুস্তক থেকেই করা হয়েছিল। তখন ঐ নাটক আদ্যোপান্ত গদ্যে ছিল না। মধুসূদন 'পদ্মাবতী' নাটক আদ্যোপান্ত গদ্যে রচনা করলেও পাণ্ডুলিপিতেই তিনি কিছু কিছু অংশ পরিবর্তিত ক'রে অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখেছিলেন। 'পদ্মাবতী' নাটক

'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের আগে প্রকাশিত হওয়ায় অনেকেরই এই ভুল ধারণা হয়েছিল বা এখনও প্রচলিত আছে যে, মধুসূদন 'পদ্মাবতী' নাটকেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। সম্ভবত 'পদ্মাবতী' নাটকের আরও কোন কোন অংশ তিনি ঐ নাট্য সম্প্রদায়ের জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে পরিবর্তিত ক'রে দিয়েছিলেন। তবে সেসব অংশ আর পরবর্তী সংস্করণে মুদ্রিত গ্রন্থে সংযোজিত হয় নি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মধুসূদনের খুবই সৌহার্দ্য ছিল। হেমেন্দ্রনাথের বাড়িতে ঐ সময় 'বুঝলে কি না' প্রহসনের জবাবে 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনখানি অভিনীত হয়েছিল—১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর। প্রহসনটির অভিনয়কালে মধুসূদন উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় এতো ভালো হয়েছিল যে, মধুসূদন ব'লে উঠেছিলেন: "মৃত্তিকে রে বাবা, মৃত্তিকে!" অর্থাৎ এই অভিনয়ের তুলনায় অন্যান্য সব অভিনয়ই মাটি।

বিলাত থেকে ফেরার পর মধুসূদন আইন-ব্যবসায়, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাহিত্য-চর্চা, হোটেলে বন্ধুদের প্রীতিভোজে আপ্যায়ন, বন্ধুদের বাড়িতে বা বাগানবাড়িতে প্রীতিভোজ, সমাদর বা সংবর্ধনা লাভ এবং নাট্যাভিনয় নিয়ে মেতে থাকতেন। এক বছরের মধ্যে তাঁর মাসিক আয় এক হাজার থেকে দেড় হাজার পর্যন্ত উঠেছিল। তিনি মফস্বলেও মামলা চালাতে যেতেন, ফলে বাংলাদেশের নানা স্থলেই বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হতেন। কিন্তু যে কারণেই হ'ক, এর বেশি আর তাঁর আয় বাড়েনি। বরং তাঁর পশার ও আয় ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিল। অন্য পক্ষে, আয় হিসাবে ব্যয় করতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি যা আয় করতেন, তাতে তাঁর হোটেলের ব্যয়, ফ্রান্সে পত্নী ও পুত্রকন্যাদের নিয়মিত টাকা পাঠানো, অকৃপণ দান ও বকশিস প্রভৃতির জন্যে বিপুল অর্থ সঙ্কুলান সম্ভব ছিল না। তিনি স্পষ্টই বলতেন, বছরে চল্লিশ

হাজার টাকার কমে কোন ভদ্রলোকের চলা সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যারিস্টারি ব্যবসায়েও তাঁর সর্বোচ্চ আয় কখনো বছরে বিশ হাজার টাকার উপরে ওঠেনি।

ফলে তিনি সর্বদাই ঋণ সংগ্রহ ক'রে দেওয়ার জন্যে বিদ্যাসাগরের দ্বারস্থ হতেন। বিদ্যাসাগর মধুসূদনকে এতোই স্নেহের চক্ষে দেখতেন যে, তাঁর সকল অবিবেচনাই তিনি ক্ষমা করতেন। তিনি মধুসূদনের জন্যে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির বাইরের অংশ সজ্জিত ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু মধুসূদন সাহেব-পাড়ায় সাহেবী কেতায় হোটেলে ওঠায় যে অবিবেচনা এবং বিদ্যাসাগরের পরামর্শের প্রতি যে উপেক্ষা দেখিয়েছিলেন, তা যে কোন সাধারণ মানুষকে মধুসূদনের প্রতি বিরূপ করতে যথেষ্ট ছিল। মধুসূদনের অমিতব্যয়িতা, তাঁর পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণের আধিক্য, তাঁর অপরিমিত মদ্যপান, সব কিছুই বিদ্যাসাগর অত্যন্ত ক্ষমার চক্ষেই দেখতেন। বিদ্যাসাগরের এই মনোভাব সম্পর্কে গৌরদাস ঠিকই লিখেছেন :

> In writing this part of Modhu's account in relation to Vidyasagar I can say that Vidyasagar's goodness of heart was not the only cause of his kind offices to Modhu. He knew that Modhu was a genius and was no ordinary character. He was a man far above his countrymen. He was sure to leave a stamp behind, and to die in competency, if not in rolling wealth.

কিন্তু বিদ্যাসাগরের এই ধারণা ও আশা পূর্ণ হয় নি। পরে তিনি তাই হতাশ হয়ে বলেছিলেন, "তাকে ঈশ্বরচন্দ্র কেন, ঈশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না।"

মধুসূদনের অমিতব্যয়িতা তাঁর নিজের ভোগবিলাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর দানশীলতাও ছিল অপরিসীম। তিনি

ভৃত্যদের সাধারণ কাজের জন্তেও প্রায়ই বকশিস দিতেন এবং সে বকশিস কখনো দশ টাকার নিচে নামতো না। তাঁর মুক্তহস্ততা সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। একদিন তিনি একটি ঠিকা গাড়িতে ক'রে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে গিয়ে পৌছলেন। তিনি গাড়ি থেকে নেমে গাড়োয়ানকে একটি মোহর দিলেন। এই অপব্যয় সম্পর্কে সাবধান হওয়ার জন্তে বিদ্যাসাগর (যিনি দানের জন্য চিরস্মরণীয়) উপদেশ দিলে মধুসূদন বললেন, "বিদ্যাসাগর, আজ দুদিন ধরে ঐ গাড়োয়ান আমাকে গাড়িতে ক'রে নানা জায়গা নিয়ে গেছে। ওকে আর এমন কি বেশি দিলাম?" একবার একজন নিজের অভাব-অনটনের কথা জানিয়ে মধুসূদনের কাছে কিছু টাকা চাইলো। মধুসূদন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পকেটে যা ছিল, সব তাকে দিয়ে দিলেন। ঐ সময় এক বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, "ওকে কত দিলেন?" মধুসূদন বললেন, "Raj Narayan Dutt's son never counts money."

"সমাজ-দর্পণ" কাগজের সম্পাদক মধুসূদনের চরিত্র সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি মধুসূদনকে অলিভার গোল্ডস্মিথের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। গোল্ডস্মিথও ঐরূপ অমিতব্যয়ী ছিলেন এবং অমিতব্যয়িতার ফলে তিনি অর্থসংকটে পড়লে ডঃ স্যামুয়েল জনসন অর্থ সাহায্য দিয়ে তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করতেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারেন নি। সমাজ-দর্পণ সম্পাদক লিখেছিলেন:

> মাইকেল অসাধারণ মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি কখন কখন স্পষ্টই বলিতেন, ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার টাকা বৎসরে না হইলে ভদ্রলোকের কিরূপে চলিতে পারে? আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি, মাইকেলের অনেকটা ধরন গোল্ডস্মিথের সহিত এক হয়। গোল্ডস্মিথ কখনও শান্তিভোগ করিতে পারেন নাই। আমোদ-প্রিয়তা বিষয়ে মাইকেল তাঁহার অপেক্ষা অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয়। গোল্ডস্মিথ উলঙ্গ হইয়া অর্থীকে সর্বস্ব দান করিতেন;

আমাদের মাইকেলও ঐরূপ ছিলেন। ঘরে খাবার নাই, স্ত্রী-পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্বাহিত হওয়াই ক্লেশকর, অথচ মাইকেলের দানশক্তি কমে না।

...আমরা এস্থলে ইহাও বলি যে, মাইকেল গোল্ডস্মিথের অপেক্ষা উন্নতমনা ছিলেন। যে জনসন তাঁহার এত উপকার করিতেন, গোল্ডস্মিথ তাঁহারই ঈর্ষা ও নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আমাদের মাইকেল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট উপকৃত হইয়া চিরকাল তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

মাদ্রাজে ও ইংলণ্ডে দীর্ঘকালের দৈন্যদশাও মধুসূদনকে অর্থ সম্পর্কে সতর্ক করতে পারেনি। তিনি যখন মাদ্রাজে ছিলেন, তখন ছিলেন অপরিচিত যুবক। কিন্তু তিনি যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, তখন ছিলেন সুবিখ্যাত কবি এবং জমিদারির মালিক। বিদ্যাসাগরের কৃপায় তিনি বহু হাজার টাকা ঋণ লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই ঋণ পাওয়ার সুযোগ এবং ব্যারিস্টারি ব্যবসায় থেকে অদূর ভবিষ্যতে বিপুল অর্থোপার্জনের আশা তাঁকে আরও অমিতব্যয়ী ক'রে তুলেছিল। তিনি কেবল বিদ্যাসাগরের মারফতই নয়, অন্যান্য যে কোনও সূত্রে ঋণ পাওয়ার সুযোগ থাকলেই ঋণ গ্রহণ করতেন। পুরাতন ঋণ শোধ করাও যে একান্ত প্রয়োজন, সে বোধটুকুও যেন তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি প্রচুর ঋণের বোঝা নিয়েই ইউরোপ থেকে দেশে ফিরেছিলেন। বিদ্যাসাগরের পরামর্শ না শুনে স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাকে ইউরোপে রেখে এসেছিলেন এবং এখানে বাসা ভাড়া ক'রে না থেকে হোটেলে উঠেছিলেন। ফলে আর্থিক সংকট, মানসিক উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা তাঁর চিরসঙ্গী হয়ে উঠেছিল। দেশে ফেরার প্রথম বৎসর থেকেই তিনি এখানে আবার ঋণ গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন। অন্য কোনও উপায়ে ঋণলাভ সম্ভব না হ'লে বিদ্যাসাগরের কাছেই ছুটতেন। বিদ্যাসাগরকে ঋণ সংগ্রহ ক'রে দেওয়ার জন্যে বার বার অনুরোধ করতে তাঁর বিন্দুমাত্রও দ্বিধা, কুণ্ঠা, সংকোচ, লজ্জা কিছুই

ছিল না। বাঙ্গালী জাতি তাঁকে বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্রবেশের প্রথম থেকেই দু-হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিয়েছিল, তবু নিজের অবিবেচনা ও অমিতব্যয়িতা তাঁকে যে বিপদের মধ্যে ক্রমাগত টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, সে বিষয়ে সতর্ক না হয়ে তাঁর প্রতি নির্দয়তার দায়ে দায়ী ক'রে বাঙ্গালী জাতিকে তিরস্কার করতেও তিনি বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নি। তাই বিদ্যাসাগরকে লেখা ঐ সময়ের মধুসূদনের অনেক চিঠি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির উদ্রেক না ক'রে বিরক্তিরই উদ্রেক করে। বিলাত থেকে ফেরার প্রথম বছরেই তিনি অসুস্থ বিদ্যাসাগরকে লেখেন ঃ

> I am glad you are better, for I want you to get me a thousand 1000 Rs. from Onoocool for Europe. If you had been a vulgar or common man like most of those who surround you, I should hesitate to ask you to involve yourself again on my account, especially as old Srish is assuming warlike attitudes. But though a Bengali, you are a man, and I believe you would risk anything to help a friend in such distress as I am in. My poor wife is almost badly off as I was when I first wrote to you and I am perfectly helpless.…

বিদ্যাসাগর ঐ সময়ে নিজেও অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে অত্যধিক অর্থব্যয় করায় নিজেও আর্থিক সংকটে পড়েছিলেন। তবু তিনি যথাসাধ্য মধুসূদনকে সাহায্য করেন। কিন্তু ইউরোপে থাকার সময়ে মধুসূদনকে তিনি শ্রীশ বিদ্যারত্নের কাছ থেকে যে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ ক'রে পাঠিয়েছিলেন, সেই পাঁচ হাজার টাকার জন্য শ্রীশ বিদ্যারত্ন বিদ্যাসাগরকে উত্ত্যক্ত ক'রে তুলেছিলেন। বিদ্যাসাগর ঐ ঋণ শোধের জন্য মধুসূদনকে লেখেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের

নভেম্বর মাস থেকে মধুসূদনের শরীর ভালো যাচ্ছিল না। তার ওপর তিনি ঘোড়ার গাড়িতে ওঠার সময়ে পা পিছলে প'ড়ে পা ভেঙে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের চিঠি পেয়ে মধুসূদন লেখেন :

> I am sorry you are not well. I can't leave my bed ! Now what shall I say about S. ? If it would "mortify" you to be dragged to a Court of Law, it would make me mad. Surely, S. can't be so hard-hearted. You know I have no money and have been getting on very indifferently since last November on account of my throat and general health. Don't you think Onoocool could be induced to do something ? I have not been out for the last fortnight and don't know when I shall be on my legs again. People who dislike the idea of your being so kind to me, might have told you a hundred things about my careless extravagance and all that ; but I tell you that nothing but a miracle could enable a fellow to pay off a debt of 5000 Rs., live like a gentleman, maintain a wife and children in Europe, etc., the very first year of his professional career !

মধুসূদন যেভাবে জীবনযাপন করছিলেন, তা দেখে পাওনাদারদের সহজেই মনে করার কথা যে মধুসূদন তাঁদের প্রাপ্য সম্বন্ধে অমনোযোগী ও উদাসীন। সুতরাং তাঁদের প্রাপ্য সম্পর্কে তাগাদা দেওয়া, পীড়াপীড়ি করা, মামলার ভয় দেখানো, কিছু অস্বাভাবিক ছিল না। পাওনাদারদের পীড়াপীড়িতে বিদ্যাসাগর নিজেও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন।

পাওনাদারদের টাকা সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থা করবার জন্তে মধুসূদনকে তিনি তাঁর রোগশয্যা থেকে পুনরায় লিখে পাঠান। শ্রীশ বিদ্যারত্ন ২১০০০ টাকায় মধুসূদনের ভূসম্পত্তি কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দেন। ঐ প্রস্তাব সম্পর্কে মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে জানান:

> Your letter which reached a few minutes ago, has given me great pain. You know that there is scarcely anything in this world that I would hesitate to do for you, of course you have my full permission to adopt any steps you think proper to relieve yourself of the unpleasant burden. Shris has written to me offering Rs. 21,000. But don't you think Onoocool would advance fresh money enough to pay off that man and hold the property by way of mortgage—usufructuary mortage—I paying him the difference in the interest? If we can in this way save the estates, let us do so, if not, let them go. I wish I could run over and see you.···

মধুসূদনের কথা মতো বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় অনুকূল মুখোপাধ্যায় সম্ভবত আরও কিছু টাকা ঋণ দেন এবং সেই টাকা দিয়ে শ্রীশ বিদ্যারত্নের ঋণ শোধ ক'রে দেওয়া হয়। অল্পদিন পরেই, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে, মধুসূদন তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি ক'রে অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের ঋণও শোধ ক'রে দেন এবং এইভাবে বিদ্যাসাগরকে তাঁর ঋণের জন্তে সমস্ত দায়িত্ব ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত করেন। মধুসূদন তাঁর বাংলা ১২৭৪ সালের ১৩ই মাঘ তারিখে লিখিত একটি কোবালার দ্বারা চক মুনকিয়া ও চক গদারডাঙ্গা মহল দুটি পত্তনিদার মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী মোক্ষদা দেবীকেই বিশ হাজার

টাকায় বিক্রি করেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারি (১৮৬৮) তারিখে এই দলিল রেজিস্ট্রি করা হয়। দলিলে লেখা হয়:

> …এইক্ষণ আমি শ্রীযুত বাবু অনুকূল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রায় ১৯০০০৲ উনিশ হাজার টাকার দায়িক হইয়াছি—তাহা পরিশোধের জন্য আমি উক্ত উভয় মহাল সংক্রান্ত আমার দরহস্ত হকুক মবলগ ২০০০০৲ বিশ হাজার টাকা মূল্যে আপনার নিকট বিক্রয় করিলাম।

বৈষয়িক দিক থেকে এতো স্বল্প মূল্যে এই তালুক বিক্রি করা নির্বুদ্ধিতাই ছিল। কিন্তু মধুসূদনের অমিতব্যয়িতা তাঁকে যে বিষম অর্থসংকটের মধ্যে ফেলেছিল এবং বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিকে উদ্বেগ ও অশান্তির সম্মুখীন করেছিল, তাতে মধুসূদনের এছাড়া গত্যন্তর ছিল না। গৌরদাস বসাক এই ভূসম্পত্তি বিক্রয় সম্পর্কে লিখেছেন: "That *Abad* is now yeilding the Proprietor Rs. 8000 a year. He (Modhu) could have lived like a Raja, if he had not been in a hurry to run up in debts and sell all to gratify his extravagant habits."

বিদ্যাসাগর ও মধুসূদনের অনেক জীবনীকার লিখেছেন যে, মধুসূদন বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে ঋণস্বরূপ যে টাকা নিয়েছিলেন, তার সবটা শেষ পর্যন্ত তিনি শোধ করতে পারেন নি। বিদ্যাসাগর শ্রীশ বিদ্যারত্ন ও অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকেই টাকা ধার ক'রে মধুসূদনকে দিয়েছিলেন; সে টাকা যে মধুসূদন সম্পূর্ণরূপে শোধ ক'রে দিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। বিদ্যাসাগর ও মধুসূদনের চিঠিপত্রে অন্য কোনও মহাজনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে ভের্সাই থেকে মধুসূদনের প্রথম পত্র পেয়েই বিদ্যাসাগর যে দেড় হাজার টাকা দিয়েছিলেন, তা তিনি সাহায্য হিসাবেই দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর সে টাকা সম্পর্কে কখনো উল্লেখ করেন নি; চিরঋণগ্রস্ত মধুসূদনও সে টাকা ফেরত দেওয়ার সুযোগ পান নি।

মধুসূদন তাঁর স্ত্রী, কন্যা ও পুত্রদের জন্য ইউরোপে নিয়মিত টাকা পাঠাতে পারছিলেন না। সেজন্য হেন্‌রিয়েটা পুত্রকন্যাদের নিয়ে অত্যন্ত বিপদেই পড়েছিলেন। মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে একটি পত্রে স্ত্রীপুত্রকন্যার জন্য ইউরোপে টাকা পাঠাবার অত্যাবশ্যকতার কথা লিখে জানিয়েছিলেন, এবং কিছু টাকা সংগ্রহ ক'রে দিতে বলেছিলেন। বিদ্যাসাগর ঐ টাকা সংগ্রহ ক'রে দিতে পেরেছিলেন কিনা জানা যায় নি। অনুকূলবাবুর কাছে মধুসূদনের ঋণের পরিমাণ দেখে মনে হয়, অনুকূলবাবু তাঁকে ঐ সময় আরও কিছু টাকা ঋণ দিয়েছিলেন এবং মধুসূদন হেন্‌রিয়েটাকে ফ্রান্সে টাকা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর জন্য নিয়মিত টাকা পাঠানো মধুসূদনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে হেন্‌রিয়েটাকে প্রায়ই বিদেশে অর্থ-সংকটের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। মধুসূদন দেশে চলে আসার পর হেন্‌রিয়েটা দু বছরেরও বেশি ফ্রান্সে ছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে নিয়মিত টাকা না যাওয়ায় তিনি মাঝে মাঝে খুবই অসুবিধায় পড়তেন। ঐ সময়ে কন্যা শর্মিষ্ঠার বয়স ছিল আট-ন বছর। পুত্র মিল্টনের বয়স সাত-আট। তাদের কেবল লালনপালন নয়, শিক্ষার ব্যবস্থাও করতে হয়েছিল। হেন্‌রিয়েটা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও মিতব্যয়িনী হ'লেও স্বামীর কাছ থেকে নিয়মিত টাকা না পাওয়ায় মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিপদে পড়তেন। ১৮৬৯ সালের গোড়ার কয়েক মাসে নিয়মিত টাকা না পাওয়ায় তিনি ঐ সময় অত্যন্ত অর্থকষ্টে পড়েছিলেন। তাই তিনি আর ফ্রান্সে না থেকে পুত্রকন্যাদের নিয়ে ভারতে স্বামীর কাছে ফিরে আসাই স্থির করলেন।

কিন্তু তাঁর হাতে যা টাকা ছিল, তাতে সেখানকার খরচ ও ধার-দেনা মিটিয়ে ভারতে আসার খরচ সংকুলান হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তিনি স্টীম নেভিগেশন কোম্পানির ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রে তাঁদের ভাড়া হ্রাস করবার জন্যে ম্যানেজিং কোম্পানির কাছে আবেদন করলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ তারিখে লেখা ঐ আবেদনপত্রে তিনি লিখলেন :

…I will leave France with my two children; the elder of whom is nine years old. I have no longer any money to maintain them. A longer sojourn in France would do me no good, but make my condition worse, which is already very painful.

By collecting all the assets that I possess, I shall have at my disposal from 900 to 1000 Francs. I beg that the Managing Company will be pleased to remain satisfied with that sum….

ম্যানেজিং কোম্পানি ঐ টাকায় রাজী না হ'লেও ভাড়া কিছু পরিমাণে হ্রাস করেছিল। ম্যানেজিং কোম্পানির কাছে আবেদন করবার পর হেন্‌রিয়েটা মধুসূদনপ্রেরিত কিছু টাকা পেলেন। ঐ টাকা পেয়েই তিনি জাহাজ কোম্পানির দাবী মতো টাকা দিয়ে এপ্রিল মাসের (১৮৬৯) গোড়াতেই পুত্রকন্যাকে নিয়ে ভারতে রওনা হলেন এবং মে মাসের গোড়ায় কলকাতায় এসে পৌঁছলেন।

মধুসূদন এখন হোটেল ছেড়ে ৬নং লাউডন স্ট্রীটে একটি দোতলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে তাতে বাস করতে লাগলেন। ঐ বাড়ির ভাড়া ছিল মাসিক ৪০০ টাকা। বাড়িটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের উপযুক্ত ছিল। বাড়ির সঙ্গে একটি সুন্দর বাগানও ছিল। বাড়িটিকে মধুসূদন ফরাসী রুচি অনুযায়ী সুন্দর ক'রে সাজিয়েছিলেন। বাগানটি নানাপ্রকার ফুলের গাছে ও লতাপাতায় সুশোভিত ছিল। বাগানটিকেও মধুসূদন ফরাসী রুচি অনুযায়ী সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করেছিলেন। নগেন্দ্রনাথ সোম লিখেছেন :

(ঐ বাড়ির) কক্ষসমূহের আভ্যন্তরিক সাজসজ্জাও বিচিত্র। প্রাচীর গাত্রে য়ুরোপীয় পৌরাণিক কাব্যসমূহ হইতে নির্বাচিত বিষয়ের

চিত্রাবলী সুশোভিত। কৌচ, কেদারা, টেবিল, আলমারী, ঝালর, পর্দা যে কত অভিনব প্রকারের ছিল, তাহা বলা যায় না। পুস্তকাগারে য়ুরোপীয় বিবিধ ভাষায় রচিত মহাকবিগণের গ্রন্থাবলী (Classical Works) সঞ্চীভূত। তিনি য়ুরোপ হইতে আসিবার সময় হোমর, দান্তে, ভার্জ্জিল, টাসো, সেক্‌সপীয়র, মিল্টন প্রভৃতি মহাকবিগণের ধাতু ও প্রস্তর প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত অর্ধমূর্তিসমূহ (Bust) বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। ঐ প্রতিমূর্তিগুলি তাঁহার পাঠাগারের শোভাবর্ধন করিত। এতদ্ভিন্ন তাঁহার পত্নী, কন্যা, পুত্র প্রভৃতির গৃহগুলিতেও নূতন ধরনের সাজসজ্জার অভাব ছিল না।...

বহির্গমনের জন্য কয়েকটি অশ্ব ও অশ্বযান ছিল। তন্মধ্যে একখানি শকট এরূপ বহুমূল্য ছিল যে, তাঁহার ইউরোপীয় বন্ধুরা তাহার 'grand carriage' নাম দিয়াছিলেন।

এই ভবনে প্রায় প্রতি মাসেই ২।৩ বার তিনি নির্বাচিত বন্ধুবর্গকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিতেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পাচক তাঁহার সুপকার্যে নিযুক্ত ছিল। সে নানাবিধ রসনাতৃপ্তিকর সুখাদ্যে তাঁহার সুহৃৎগণের রসনারঞ্জন করিত; এজন্য মধুসূদন তাহার উপর যারপরনাই সন্তুষ্ট ছিলেন।

মাঝে মাঝে চন্দননগরে গঙ্গাতীরে একটি 'ভিলা' ভাড়া নিয়েও মধুসূদন অবসরবিনোদনের জন্যে বাস করতেন। সর্বদা ঋণগ্রস্ত এবং আর্থিক উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকলেও মধুসূদনের জীবনযাত্রা অত্যন্ত রাজসিক ছিল। ঐ সময়ে তাঁর ব্যারিস্টারিতে কিছু আয়ও বেড়েছিল। তিনি ঐ সময়ে হাইকোর্টে অনেকগুলি বড় বড় মামলা পরিচালনা করেছিলেন। বিশেষভাবে ফৌজদারী মামলা পরিচালনায় তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতেন। কেম্প্‌, নরম্যান, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, সীটন্‌কার, ফিয়ার প্রভৃতি বিচারপতিরা সকলেই তাঁর প্রশংসা করতেন। সেই সঙ্গে তাঁরা মধুসূদন আইন-ব্যবসায় যথেষ্ট সময় ও মনোযোগ দিচ্ছেন না

ব'লেও অভিযোগ করতেন। মধুসূদন মাঝে মাঝে মফস্বলে মামলা চালাতেও যেতেন। কিন্তু আয়ের তুলনায় তাঁর ব্যয় বেশি থাকায় তাঁর শান্তি ছিল না। কোন কিছুতেই সন্তোষ ছিল না।

ব্যারিস্টারি-ব্যবসায়ে আয়ের কোনও নিশ্চয়তা ও পরিমাণের স্থিরতা ছিল না। তাই কোনও বেশি মাইনের সরকারী চাকরির কথা মধুসূদন মাঝে মাঝে চিন্তা করতেন। হেন্‌রিয়েটা কলকাতা আসার কিছুদিন পূর্বে মধুসূদন ঐ রকম চেষ্টা একবার করেছিলেন। ১৮৬৮ সালের ১৭ই অক্টোবর তিনি বিদ্যাসাগরকে একটি পত্রে লেখেন যে, ফেগান সাহেব অবসর নিচ্ছেন এবং তাঁর স্থলে লুই টমাস আসছেন ব'লে তিনি শুনেছেন। ঐ শূন্য পদটি যাতে মধুসূদন পান, সেজন্য বিদ্যাসাগর তাঁর বন্ধু তৎকালীন ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবকে জানালে তিনি উপকৃত হবেন। মধুসূদন লেখেন :

> ...They want a barrister and a post like that would save me and mine. Although a Brahmin, you are no descendent, I am sure, of that irascible old fellow Durvasa, and I can't believe that any folly of mine could turn away that noble heart from me.
>
> Your very loving but unfortunate,
>
> P. S.—There is no time to be lost. There isn't another man in Calcutta (Black or White) from whom I would ask such a favour. If you have ceased to be my friend, the sooner I hear of the calamity the better.

কিন্তু মধুসূদনের খবর ভুল ছিল। ফেগান সাহেব অবসর নিলেন না। তিনি আরও প্রায় দু বছর ঐ পদেই নিযুক্ত ছিলেন। ফলে ঐ সময়ে মধুসূদন সরকারী চাকরির সুযোগ পান নি। সে সুযোগ

এলো প্রায় দেড় বছর পরে। ঐ সময়ে হাইকোর্টের প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের অনুবাদ বিভাগে পরীক্ষকের পদ শূন্য হ'লো। মধুসূদন ঐ পদে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে নিযুক্ত হলেন। ঐ পদে তাঁর নিয়োগ সম্পর্কে তৎকালীন ইউরোপীয়দের মুখপাত্র 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা তার সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখলো :

> The appointment of Mr. M. S. Dutta, Barrister-at-law, to the post of Examiner of the Privy Council Records in the High Court, appears from every point of view quite unobjectionable. The duties pertaining to the office are of great importance, and can adequately be discharged by an officer of approved ability and high professional character. A better choice therefore could hardly have been made, nor would it be easy to find another Native gentleman so thoroughly intimate with the English language.

এই পদের বেতন ছিল প্রায় দেড় হাজার টাকা। ব্যারিস্টারিতে তিনি চেষ্টা করলে ঐ টাকা উপার্জন করতে পারতেন সত্য। কিন্তু তাতে তিনি বিশ্রামের অবকাশ পেতেন না। তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে কিছু বিশ্রামের প্রয়োজনও ছিল। সামান্য বিশ্রাম হয়তো পেয়েছিলেনও। কিন্তু স্বাস্থ্য উদ্ধারের পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না। দেশে ফেরার প্রথম বছর থেকে, ১৮৬৭ সালের নভেম্বর থেকে, তিনি প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন, সেই সঙ্গে গাড়ি থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিল। কিছু অর্থ সংগ্রহের জন্যে তিনি এই সময় তাঁর গদ্যে লেখা উপাখ্যান 'হেক্টর-বধ' ছাপতে দেন।

সাহিত্যের মন্দিরে প্রবেশের পূর্বে তিনি দমদমে কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাগানবাড়িতে বড়াই ক'রে বলেছিলেন, তিনি যে গদ্যের সৃষ্টি

করবেন, তা-ই বাংলা গদ্যের আদর্শ হয়ে উঠবে। 'মেঘনাদবধ' কাব্য রচনার পরে একটি পত্রেও তিনি রাজনারায়ণ বসুকে দম্ভের সঙ্গেই জানিয়েছিলেন, তিনি গদ্য সাহিত্যেও অবতীর্ণ হবেন :

> I am thinking of blazing out in prose to reduce to cinders the impudent pretensions of the "mob of gentlemen" who pass for great authors! great authors !! great *fiddle-sticks* !! But of that by and by, you may take my word for it, friend Raj, that I shall come out like a tremendous comet and no mistake.

সে প্রায় এক যুগ আগের কথা। সে যুগও আর নেই, সে মধুসূদনও আর নেই। তবু ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ের ফাঁকে ঋণজর্জরিত, অর্থচিন্তায় সদা-চিন্তিত, মধুসূদন তাঁর দুরন্ত যৌবনের সেই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যে একবার বুঝি সচেষ্ট হয়েছিলেন। গদ্য সাহিত্যে তিনি অগ্নিপুচ্ছ ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হবেন, তাঁর জ্যোতিঃপ্রভায় শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক ব'লে যাদের কিছু দম্ভ আছে, তারা নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, এই ছিল তাঁর অঙ্গীকার। কিন্তু গদ্য সাহিত্যে তিনি যখন এলেন, তখন মধুসূদনের সেই জ্বলন্ত প্রতিভা আর ছিল না, ছিল কিছু নির্বাণোন্মুখ অঙ্গারমাত্র। তাই তাঁর "মেঘনাদবধ" যে দুন্দুভিনিনাদে বাংলা সাহিত্যে অভিনন্দিত হয়েছিল, 'হেক্টর-বধ' তেমন কিছুই করতে পারলো না। কারণ, বাংলা সাহিত্যের দিগন্তে তখন আর এক প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছিল—'হেক্টর-বধ' রচনার দু বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস নিয়ে বাংলা গদ্যের আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং বাংলা গদ্যের স্বর্ণ-সরণি রচনার কাজ শুরু ক'রে দিয়েছিলেন।

'হেক্টর-বধ' যে মধুসূদন রচনা করেছিলেন ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে অসুস্থ হওয়ার পরে, তাঁর হেক্টর-বধের উৎসর্গ-লিপি থেকে তা জানা

যায়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর 'হেক্টর-বধ' প্রকাশিত হয়। মধুসূদন তাঁর হেক্টর-বধ উপাখ্যান-গ্রন্থ বাল্যবন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নামে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গলিপিতে মধুসূদন লেখেন :

> প্রায় চারি বৎসর হইল, আমি শারীরিক পীড়িত হইয়া, এমন কি, ৩।৪ মাস স্বকর্মে হস্ত নিক্ষেপ করিতে অশক্ত হইয়াছিলাম, সময়াতিপাতার্থে উরূপা খণ্ডের ভগবান্ কবিগুরুর জগদ্বিখ্যাত ঈলিয়াস নামক কাব্য সদা সর্ব্বদা পাঠ করিতাম। পাঠের সময় মনে এইরূপ ভাব উদয় হইল, যে এ অপূর্ব্ব কাব্যখানির ইতিবৃত্ত স্বদেশীয় ইংলণ্ড ভাষানভিজ্ঞ জনগণের গোচরার্থে মাতৃভাষায় লিখি। লিখিত পুস্তকখানি চারি বৎসর মুদ্রালয়ে পড়িয়াছিল ; এমন সময় পাই নাই যে, ইহাকে প্রকাশি। এক স্থলে কয়েকখানি কপির কাগজ হারাইয়াছে (৪র্থ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে) ; সেটুকুও সময়াভাব প্রযুক্ত পুনরায় রচিয়া দিতে পারিলাম না। বোধ হয়, এতদিনের পর জনসমূহ সমীপে আমি হাস্যাস্পদ হইতে চলিলাম।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কেমন ছিল, তা এই লিপি থেকেই বোঝা যায়। বস্তুতঃপক্ষে, 'হেক্টর-বধ' মধুসূদনের বিজয়মাল্যে একটিও নূতন ফুল সংযোজিত করে নি, বরং তাঁকে তীব্র সমালোচনা ও নিন্দারই সম্মুখীন করেছিল। বাঙ্গালী পাঠক তখন বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনীর' মতো অনবদ্য গদ্যের আস্বাদ পেয়েছে। 'হেক্টর-বধ' তাদের মনে সাড়া জাগাবে কেমন ক'রে ?

মধুসূদনের শরীর ও মনের অবস্থা যখন এই রকম, তখন তিনি, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের খুব সম্ভব সেপ্টেম্বর মাসে, ঢাকায় গিয়েছিলেন। ঐ সময় তিনি পীড়িত অবস্থায় আট দশ দিন ঢাকায় ছিলেন। সে সংবাদ ঢাকার 'হিন্দু-হিতৈষিণী' কাগজে ছাপা হয়েছিল এবং পরে ১৮৭১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তা 'এডুকেশন গেজেটে' উদ্ধৃত হয়েছিল :

গত শনিবার ঢাকায় জ্ঞানকরী সভায় বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ের আন্দোলন হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় মনুবচনে বহুবিবাহের ব্যবস্থার স্থূল উল্লেখ করিয়াছিলেন। তথায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত উপস্থিত ছিলেন। শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, দত্তজ মহাশয় মন্বাদি শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া তাহা বুড়ীগঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

ইতিমধ্যে মধুসূদন তাঁর সরকারী চাকরি ছেড়ে দিয়ে আবার ব্যারিস্টারি ব্যবসা শুরু করেছিলেন মনে হয়। নইলে সরকারী পদে নিযুক্ত থাকলে তাঁর পক্ষে স্বাধীনভাবে ব্যারিস্টারি করা সম্ভব ছিল না। তিনি সম্ভবতঃ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে আবার ঢাকায় যান। তখন ঢাকাবাসী তাঁকে একটি মানপত্র দেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মধুসূদনের জীবনবৃত্তান্তে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ সংবাদ উদ্‌ধৃত করেছেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মধুসূদন যখন ঢাকা যান, তখন তাঁকে মানপত্র দেওয়া হ'লে ঐ সংবাদ এতো বিলম্বে—প্রায় ছ মাস পরে—প্রকাশ হওয়ার কথা নয়। ঐ সংবাদে বলা হয়ঃ

শ্রীযুক্ত মাইকেল দত্ত ঢাকায় গেলে সেখানকার জনকয়েক যুবক তাঁহাকে একখানি আড্রেস দেন। তখন একজন বক্তৃতা কালীন বলেন যে, "আপনার বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা প্রভৃতি দ্বারা আমরা যেমন মহা গৌরবান্বিত হই, তেমনি আপনি ইংরাজ হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া আমরা ভারি দুঃখিত হই, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়া আমাদের সে ভ্রম গেল।" মাইকেল ইহার উত্তরে বলেন, "আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে ভ্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি, এ ভ্রমটি হওয়া ভারী অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে এক একখানি আর্শি রাখিয়া দিয়াছি এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যে (মনি) বলবৎ হয়, অমনি

আর্শিতে মুখ দেখি। আরো, আমি সুদ্ধ বাঙ্গালি নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটি যশোহর।

'ঢাকা-প্রকাশ' কাগজের সহকারী সম্পাদক অনাথবন্ধু মৌলিক লিখেছেন:

মাইকেল একটি মোকদ্দমা উপলক্ষে ঢাকায় আসিয়া আরমানিটোলা পোগজ সাহেবের বাড়ীতে থাকেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ঢাকায় দুটি সভা হয়। একটি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলগৃহে এবং অপরটি ঢাকা পোগজ স্কুলে। সে সভায় ঢাকার যাবতীয় বিশিষ্ট লোক উপস্থিত ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, গোবিন্দ রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকও উপস্থিত ছিলেন। 'ঢাকা প্রকাশ' কার্যালয়ে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটি party (সম্মিলন) হইয়াছিল। কবি গোবিন্দ রায় সে সময়ে 'ঢাকা প্রকাশের' সম্পাদক ছিলেন।

একদিন মাইকেল তাঁহার বাসায় হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে সাহিত্য-বিষয়ক গল্প করিতে করিতে সেখানেই একটি কবিতা লেখেন এবং কবি হরিশ্চন্দ্রও তৎক্ষণাৎ তদুত্তরে একটি কবিতা লিখিয়া মাইকেলকে দেন। কবিতা দুটি আমার মনে পড়িতেছে 'হিন্দু-হিতৈষিণী'তে ছাপা হইয়াছিল। সে সময় ঐ কাগজের সম্পাদক ছিলেন কবি হরিশ্চন্দ্র ও তাঁহার সহকারী ছিলেন রাধারমণ ঘোষ।

মধুসূদন ঢাকাবাসীর সংবর্ধনার উত্তর একটি কবিতায় দিয়েছিলেন:

নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে,
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
পূর্ববঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা রাজাসনে রাণী।
প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাক এইখানে)
নিত্য অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি।

পীড়ায় দুর্বল আমি, তেঁই বুঝি আনি
সৌভাগ্য, অর্পিলা মোরে (বিধির বিধানে)
তব করে, হে সুন্দরি ! বিপজ্জাল যবে
বেড়ে কারো, মহৎ যে সেই তার গতি ।
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে ?
দ্বৈপায়ন হ্রদতলে কুরুকুলপতি,
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে,
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি ভাগ্যবতি !

মধুসূদন দুর্বল শরীর সত্ত্বেও সংসার নির্বাহ ও ঋণশোধের জন্যে ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নিজের ব্যয়ও কিছু পরিমাণে হ্রাস করবার চেষ্টা করছিলেন। তিনি ৬নং লাউডন স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে ইঁটিলি (এন্‌টালি) বেনিয়াপুকুর রোডের একটি বাড়িতে চ'লে এসেছিলেন। ঐ সময়ে একটি পত্রে তিনি গৌরদাসকে লেখেন :

I have left my old lodging. In my new, I shall be most happy to see my own dearest friend. Alas ! I am miserable. Come to see your unworthy but loving M. S. D.

তিনি সংসারের ব্যয় হ্রাসের জন্য যে সচেষ্ট ছিলেন, তার অন্য একটি প্রমাণ, তিনি তাঁর বাবুর্চিকে ঐ সময়ে ছুটি দিয়ে দেন এবং তাকে যদি গৌরদাস রাখেন, সেজন্যে একটি অনুরোধ জানিয়ে চিঠিও দেন :

> The bearer of this is just the man that would suit you. He is a capital cook, etc. etc. ! If you can give him some suitable employment in your new establishment, you will not be sorry for having such a convenient fellow. He served Dwarkanath Tagore, Kissory and your humble friend. Yours in haste.

মধুসূদন তাঁর ব্যয় যদি আরও কিছু পূর্বে হ্রাস করতেন, তবে হয়তো তাঁকে এতো দ্রুত ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হ'তে হ'তো না। এখন তিনি তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও কলকাতার বাইরে অনেক সময় মামলা চালাতে যেতেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তিনি একটি মামলা চালাবার জন্যে পুরুলিয়া গিয়েছিলেন। সেখানকার খ্রীষ্টানরা তাঁকে মিশন হাউসে একটি সভায় অভিনন্দিত করেছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি একটি চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন। তিনি ঐ সময়ে পুরুলিয়ায় একটি বালকের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে ধর্মপিতার (God-father) কাজও করেছিলেন। ঐ উপলক্ষেও তিনি একটি কবিতা রচনা করেন। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর ঐ বালকের নাম হয়েছিল খ্রীষ্টদাস সিংহ।

পঞ্চকোটের মহারাজা মধুসূদনের প্রতিভা ও বিদ্যা-বুদ্ধির কথা লোকমুখে শুনেছিলেন। মধুসূদন পুরুলিয়া এসেছেন শুনে তিনি তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন এবং হাতী, ঘোড়া ও পালকিসহ লোকজন পাঠালেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই মধুসূদন কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। মধুসূদন মহারাজার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং কলকাতা থেকে মহারাজার লোকজনের সঙ্গে পঞ্চকোট রাজ্যে গেলেন। মহারাজা মধুসূদনকে পঞ্চকোটের দেওয়ান নিযুক্ত করতে চাইলে মধুসূদন তাতে সম্মত হলেন। সম্ভবত মধুসূদন পার্বত্য অঞ্চলে থাকলে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'তে পারবে, এই আশাতেই এই চাকরি নিয়েছিলেন। তাছাড়া, তিনি ছিলেন ঋণভারে জর্জরিত। পাওনাদারদের নিত্য তাড়না তাঁর সকল শান্তি বিনষ্ট করেছিল। কলকাতা থেকে দূরে থাকলে তিনি পাওনাদারদের তাড়না থেকে কিছুটা অব্যাহতি পাবেন, এমনও হয়তো আশা করেছিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই মধুসূদন পঞ্চকোটের দেওয়ান বা ঐ ধরনের কোনও পদে যোগ দেন। মধুসূদনের পদটি ঠিক কি ছিল, জানা যায় নি। তিনি প্রকৃতপক্ষে আইন পরামর্শ-দাতা নিযুক্ত হয়েছিলেন মনে হয়।

মধুসূদন পঞ্চকোটে এসে দেখলেন, রাজ্যের সকল ব্যবস্থাতেই বিশৃঙ্খলা। অসাধু কর্মচারীদের জন্যে প্রজারা যেমন নিপীড়িত, তেমনি রাজভাণ্ডারও প্রায় শূন্য। মধুসূদন রাজ্যের সকল ব্যবস্থাতেই দ্রুত পরিবর্তন ঘটাতে এবং অসাধু কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইলেন। তাঁর এই চেষ্টা ও অভিপ্রায় তিনি তাঁর 'পঞ্চকোট গিরি বিদায়-সঙ্গীতে' সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন।

ভেবেছিনু গিরিবর। রমার প্রসাদে,
তাঁর দয়াবলে,
ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি
জলশূন্য পরিখায়; ধনুর্ব্বাণ ধরি দ্বারিগণ
আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতূহলে।

কিন্তু মধুসূদনের সে ইচ্ছা ও চেষ্টা ফলবতী হ'লো না। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁকে পঞ্চকোটের চাকরি ছাড়তে হ'লো। কেন মধুসূদন পঞ্চকোট ত্যাগ করেছিলেন, কিভাবে তিনি হঠাৎ মহারাজার বিরাগ-ভাজন হয়েছিলেন, সে সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, মধুসূদনের বিরুদ্ধে অসৎ কর্মচারীরা দলবদ্ধ হয়ে তাঁকে তাড়াবার জন্যে চক্রান্ত করেছিল। মহারাজার এক বিশ্বস্ত নাপিত ছিল। অসৎ কর্মচারীরা তার সাহায্য নিলো। মধুসূদন অত্যধিক মদ্যপান করতেন। তাই কথা বলার সময়ে যাতে মদের গন্ধ মহারাজার নাকে না যায়, সেজন্যে তিনি মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কথা বলতেন। অসৎ কর্মচারীদের পরামর্শক্রমে নাপিত এই ব্যাপারটির দিকে মহারাজার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললো যে, মহারাজার গায়ের গন্ধ নাকি খারাপ, তাই মধুসূদন সর্বদাই নাকে রুমাল চাপা দিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। মহারাজা এই কথা শুনে মধুসূদনের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। মধুসূদন যে কোনও অজ্ঞাত কারণে মহারাজার বিরাগভাজন হয়েছেন জেনে ১৮৭২ সালের আগস্ট মাসেই পঞ্চকোটের চাকরি ছেড়ে দিলেন। চাকরি ছাড়ার সময় তাঁর বাকী বেতন ১৬০০ টাকা তো পেলেনই না,

উপরন্তু মধুসূদন পঞ্চকোট থেকে চ'লে আসার সময় যাতে পালকি কুলী প্রভৃতি কিছুই না পান, সে সম্পর্কেও মহারাজার নির্দেশ প্রচারিত হয়েছিল। মধুসূদন ঐ রাজবংশীয় এক ব্যক্তির সাহায্যে নিরাপদে পুরুলিয়ায় পৌঁছেন। আসবার সময় তাঁকে রিক্ত হস্তেই আসতে হয়েছিল। তাই মধুসূদন ঐ সময়ে অত্যন্ত অর্থক্লেশে পড়েন। তাঁর মন ও স্বাস্থ্য আবও ভেঙে যায়। তাঁর জীবননাট্য দ্রুত শেষ অঙ্কের দিকে ধাবিত হ'তে থাকে।

মধুসূদনের পঞ্চকোটে চাকবি ও পঞ্চকোট ত্যাগ সম্পর্কে রাজা প্যারীমোহন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

> The one that I at present recollect was in connection with his appointment as legal adviser of the Raja of Purulia. He said that after he was for a few days with the Raja, the idea struck him that he could be happily compared to a street-hydrant of the Calcutta Water Works. Anybody who choose had only to pull it by the ear and then drink his fill! Mr. Datta was obliged to give up the appointment after a few months' service. He found it intolerable and quite at the mercy of the Raja's barber and other menials, a whispered hint from whom was enough to mar the fortunes even of his high officials.

সম্ভবত এই সময়ে বা এর কিছু পূর্বে, তিনি তাঁর কন্যা শর্মিষ্ঠার বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সময়ে শর্মিষ্ঠার বয়স সনাতনী হিন্দু পরিবারে বিবাহের উপযুক্ত হ'লেও পাশ্চাত্য পরিবারে দূরের কথা,

প্রগতিশীল হিন্দু পরিবারেও বিবাহের উপযুক্ত ছিল না। তরুণ মিঃ ফ্লয়েড ছিলেন হাইকোর্টের অনুবাদ বিভাগের কর্মচারী, তিনি সংস্কৃত ভাষাও ভালো জানতেন। মধুসূদন মিঃ ফ্লয়েডের সঙ্গেই বালিকা শর্মিষ্ঠার বিবাহ দিলেন। অত্যন্ত অর্থকষ্টের মধ্যে থাকলেও কন্যার বিবাহ তিনি সমারোহের সঙ্গেই দিয়েছিলেন। শর্মিষ্ঠার বিবাহে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী শর্মিষ্ঠাকে ঐ সময় সাড়ে তিন শ টাকার একটি গাউন উপহার দিয়েছিলেন।

শর্মিষ্ঠার বিবাহের পর মধুসূদনের সংসারটি অপেক্ষাকৃত ছোট হয়ে গিয়েছিল। মধুসূদন, হেনরিয়েটা, জ্যেষ্ঠপুত্র মিল্টন ও কনিষ্ঠ পুত্র অ্যালবার্ট নেপোলিয়নকেই নিয়ে ছিল মধুসূদনের সংসার। নগেন্দ্রনাথ সোম লিখেছেন: "১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগস্ট, প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে বাই-সাইকেলে চড়িয়া বাসায় প্রত্যাগমনের সময় লক্ষ্মৌ নগরে অ্যালবার্ট দত্তের মৃত্যু হইয়াছিল।" এই উক্তি ঠিক হ'লে, অ্যালবার্ট ঐ সময়ে তিনচার বছরের শিশু ছিলেন এবং মিল্টনের বয়স ছিল দশ-এগারো।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মধুসূদন আবার ব্যারিস্টারি শুরু করেন। কিন্তু তখন মধুসূদন ছিলেন মধুসূদনের স্মৃতিমাত্র।

১৩

শেষ অঙ্ক

মধুসূদন আবার যখন ব্যারিস্টারি শুরু করলেন, তখন তিনি অত্যন্ত অসুস্থ। তিনি কণ্ঠনালীর প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা, প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি, জ্বর ও রক্ত বমন প্রভৃতি নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অসুস্থতার জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে ব্যারিস্টারি-ব্যবসা একেবারে বন্ধ করতে হ'লো। দারিদ্র্য চরমে এসে পৌঁছলো। রোগের চিন্তা, ঋণের চিন্তা, অভাব-অনটন তাঁর ভগ্ন দেহ-মনকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে চুরমার ক'রে দিলো। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করবার পথ না দেখেই তিনি যেন মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবার জন্যেই শরীরের উপর আরও অত্যাচার করতে লাগলেন। একদিন ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ দুপুরবেলা মধুসূদনের বাড়িতে গিয়ে দেখলেন, মধুসূদন দোর-জানালা বন্ধ ক'রে দিয়ে নির্জলা উগ্র মদ গেলাসের পর গেলাস খাচ্ছেন। মনোমোহন বললেন, "আপনি এ কি করছেন?" মধুসূদন বললেন, "জানি, এভাবে মদ খাওয়া ও আত্মহত্যা করা একই কথা। কিন্তু অন্য উপায়ে আত্মহত্যার চেয়ে এতে কষ্ট অনেক কম। This is a process equally sure, but less painful."

মধুসূদনের সংস্কৃত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রায়ই তাঁকে দেখতে আসতেন। তিনি বলেছেন, এক-একদিন মধুসূদন এতো রক্ত বমন করতেন যে, এক-একটা বড় পাত্র ভ'রে যেতো। ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্তী তাঁকে ব্র্যাণ্ডি খেতে নিষেধ করলে তিনি তাঁকে বলেছিলেন, মরলেও তিনি ব্র্যাণ্ডি ছাড়তে পারবেন না। এই সময় মধুসূদন তাঁর আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে এতোই নিশ্চিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি তাঁর

সমাধির জন্যে তাঁর বিখ্যাত সমাধিলিপিটি (epitaph) রচনা করেছিলেন।

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধি স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।

ঐ সময়ে মধুসূদনের মনের স্থিরতা একদম ছিল না। তিনি কবিতাটি লিখে ছেঁড়া কাগজের চুপড়িতে ফেলে দিয়েছিলেন। শর্মিষ্ঠা তা দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে রেখেছিলেন। তাঁর আর একটি সুন্দর কবিতা তিনি একটি খামের উপর লিখে ফেলে দিয়েছিলেন। সেটি তাঁর ক্লার্ক কৈলাসচন্দ্র বসু কুড়িয়ে সযত্নে রেখেছিলেন। কবিতাটি মধুসূদনের মৃত্যুর বহু পরে, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, 'আর্য দর্শন' কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল:

ভেবেছিনু মোর ভাগ্য, হে রমাসুন্দরি,
নিবাইবে সে রোষাগ্নি,—লোকে যাহা বলে,
হ্রাসিতে বাণীর রূপ তব মনে জ্বলে;—
ভেবেছিনু হায়! দেখি, ভ্রান্তিভাব ধনি!
ডুবাইছ, দেখিতেছি, ক্রমে এই তরী,
অদয়ে, অতল দুঃখ-সাগরের জলে
ডুবিনু; কি যশঃ তব হবে বঙ্গ-স্থলে?

এই সময়ে, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে, কলকাতার বিখ্যাত ধনী আশুতোষ ঘোষের (ছাতুবাবু) দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে পাশ্চাত্য নাট্যশালার অনুকরণে একটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের জন্যে

উদ্যোগী হন। এই রঙ্গমঞ্চের নাম 'বেঙ্গল থিয়েটার'। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নাট্যাভিনয় ও নাট্যশালা সম্পর্কে মধুসূদনের উৎসাহের সীমা ছিল না। শরৎবাবুরা প্রায়ই মধুসূদনের পরামর্শ নিতে আসতেন। এ পর্যন্ত নাটকের স্ত্রীভূমিকাগুলিতে পুরুষরাই অভিনয় করতো। মধুসূদন তাঁদের স্ত্রীভূমিকাগুলি স্ত্রীলোকদের দিয়ে অভিনয় করাতে বলেন। তাঁর পরামর্শ অনুসারেই 'বেঙ্গল থিয়েটার' এদেশে সর্বপ্রথম স্ত্রীভূমিকাগুলি স্ত্রীলোকদের দিয়ে অভিনয় করাবার ব্যবস্থা করেন। মধুসূদন এই দুরন্ত রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে তাঁদের জন্যে নাটক লিখে দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেন। শরৎচন্দ্র এই নাটক লেখার জন্যে ও তাঁর চিকিৎসায় সাহায্যের জন্যে অগ্রিম টাকাও দেন। মধুসূদন বেঙ্গল থিয়েটারের জন্যে 'মায়াকানন' নামে একটি নাটক লেখেন এবং "বিষ না ধনুর্গুণ" নামে একটি নাটক লিখতে শুরু করেন। "বিষ না ধনুর্গুণ" নাটকখানি তিনি শেষ ক'রে যেতে পারেন নি। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে নাটক নিয়েই প্রবেশ করেছিলেন। তিনি নাটক দিয়েই বাংলা সাহিত্য থেকে কেন, এ ধরাধাম থেকে চিরবিদায় নিলেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ও জাতীয় রঙ্গশালার স্বপ্ন মধুসূদনের বহুদিনের। কিন্তু ঐ স্বপ্ন যে বাস্তবায়িত হয়েছে তা তিনি দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর প্রায় ছমাস পরে 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এর উদ্বোধন হয় তাঁর লেখা 'শর্মিষ্ঠা' নাটক দিয়ে—১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট। ঐ নাট্যাভিনয় তাঁর অনাথ পুত্রদের সাহায্যকল্পেই করা হয়েছিল। 'মায়াকানন' নাটকখানি 'বেঙ্গল থিয়েটার' মঞ্চস্থ করেন প্রায় ন মাস পরে, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তারিখে। 'মায়াকানন' ও 'বিষ না ধনুর্গুণের' গ্রন্থস্বত্ব ছিল বেঙ্গল থিয়েটারের। তাঁরাই ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'মায়াকানন' প্রকাশ করেন।

ইউরোপে প্রবাসকালে মধুসূদন তিনটি নীতি-কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। সেগুলি চতুর্দশপদী কবিতাগুলির সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে তিনি আরও কয়েকটি নীতি-কবিতা রচনা

করেন—'সিংহ ও মশক', 'কুক্কুট ও মণি', 'গদা, ও সদা' 'মেঘ ও চাতক' ইত্যাদি।

মধুসূদনের জীবন-নাট্যের শেষ দৃশ্যগুলি দ্রুত যবনিকার দিকে এগিয়ে চলেছিল। রোগ, ঋণ ও অভাবের যন্ত্রণায় তিনি অধীর হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একবার মাস তিনেকের জন্যে গঙ্গাতীরে উত্তরপাড়ার গ্রন্থাগার ভবনের দোতালায় ছিলেন। মধুসূদনকে সেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকবার জন্যে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আমন্ত্রণ জানালে মধুসূদন উত্তরপাড়ার গ্রন্থাগারে গিয়ে কিছুদিন রইলেন। কিন্তু এখানে এসে তাঁর শরীর বা মনের কোনও উন্নতি হ'লো না। তিনি দুর্বল ও চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। তার ওপর হেন্‌রিয়েটা-ও অসুস্থা হয়ে পড়েছিলেন—প্রবল জ্বরে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। এই সময়কার একদিনের ঘটনা গৌরদাস তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন:

I shall never forget the heart-rending sight I witnessed on the last occasion on which I visited Modhu in the rooms of the Uttarparah Public Library, where he was staying for a change. He was in bed, gasping under the excruciating effects of his disease, blood oozing from his mouth, his wife lying in high fever on the floor. Seeing me enter the room, Modhu sat up a little and burst into tears. The pitiable condition of his wife had unmanned him, he heeded not his own pangs and suffering; "afflictions in battalion" were the words he uttered. I knelt down to feel her pulse and

temple ; she pointed with her finger towards her husband, heaved a deep sigh and sobbed out in a low voice, "Look to him, tend him, leave me alone, I care not to die."

উত্তরপাড়ায় রোগের কোন প্রশমন হ'লো না দেখে মধুসূদন তাঁর বেনিয়াপুকুরের বাসায় ফিরে এলেন। এখানে তাঁরা মাত্র দুসপ্তাহ কাটিয়েছিলেন।

বেনিয়াপুকুরের বাসায় মধুসূদনের সুচিকিৎসা হওয়া সম্ভব নয় বুঝে তাঁর বন্ধুরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ, মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ও বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী ও মধুসূদনের অন্যান্য বন্ধুরা পরামর্শ ক'রে তাঁকে আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করাবার ব্যবস্থা করলেন। জেনারেল হাসপাতালে তখন এদেশীয়দের চিকিৎসা করা হ'তো না— কেবলমাত্র ইউরোপীয়দেরই চিকিৎসা করা হ'তো। কিন্তু ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্তী এবং মধুসূদনের কয়েকজন পদস্থ ইংরেজ বন্ধুর চেষ্টায় তাঁকে জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা সম্ভব হ'লো। ঐ সময় বিখ্যাত ডাক্তার জে. ডাব্লিউ. পামার জেনারেল হাসপাতালের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি আগে মধুসূদনের বাড়িতে চিকিৎসা করতেন এবং মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল। তাই জেনারেল হাসপাতালে সুচিকিৎসা ও সেবার কোনও ত্রুটি হলো না।

মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন :

তাঁহারা যদি কোনরূপে মধুসূদনের দাতব্য চিকিৎসালয়ে মৃত্যুবরণ নিবারণ করিতে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে বঙ্গসমাজ একটি গুরুতর লজ্জা হইতে রক্ষা পাইত। বঙ্গদেশের আধুনিক সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি যে অনাথ ও ভিক্ষুকদের সঙ্গে প্রাণত্যাগ

করিয়াছেন, পরে কবির স্বর্ণময় প্রতিমূর্তি স্থাপন করিলেও এ কলঙ্ক মোচন হইবে না।

যোগীন্দ্রনাথের এই উক্তি সমীচীন নয়। জেনারেল হাসপাতাল অনাথ ও ভিক্ষুকদের হাসপাতাল ছিল না ; সেখানে শ্বেতাঙ্গ ছাড়া অন্য কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। তাছাড়া ঐ হাসপাতাল তখন এদেশে সর্বাপেক্ষা সুচিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য বিখ্যাত ছিল। সে যুগে একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ মধুসূদনই ঐ হাসপাতালে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছিলেন। সুতরাং মধুসূদনের সুচিকিৎসার কোনও ত্রুটি হয়নি বা তাঁর সম্মানের কোনও হানি হয়নি। ঐ অবস্থায় তাঁর বন্ধুরা যা করেছিলেন, তার চেয়ে ভালো কিছু করা সম্ভব ছিল না। তাই যোগীন্দ্রনাথের এই খেদ নিতান্তই যুক্তিহীন।

মধুসূদনকে ১৮৭৩ সালের জুন মাসের শেষভাগে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এখানে সর্বপ্রকার সুচিকিৎসার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত জীর্ণ দেহ সুস্থ হ'লো না। মধুসূদনের অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে যেতে লাগলো।

জেনারেল হাসপাতালে মধুসূদন যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন বেনিয়াপুকুরের বাসায় হেন্‌রিয়েটার অসুস্থতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেলো এবং ১৮৭৩ সালের ২৬শে জুন তাঁর অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো। একদিন মধুসূদনকে ভালোবেসে তিনি নিজের সমাজ ও আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ ক'রে মধুসূদনের চিরসঙ্গিনী হয়ে চলে এসেছিলেন এবং নিজের জীবনকে স্বামীর সেবায় সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছিলেন। আজ সেই স্বামীও তাঁর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে ছিলেন না। দূরে হাসপাতালের একটি কক্ষে রোগশয্যায় মৃত্যুর ক্ষণ গুনছিলেন। মধুসূদনের বন্ধুরা হেন্‌রিয়েটার অন্ত্যেষ্টি উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গেই সম্পন্ন করলেন। লোয়ার সার্কুলার রোডে তাঁকে সমাহিত করা হলো।

এই সময়কার বর্ণনা নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর মধু-স্মৃতিতে সুন্দরভাবেই দিয়েছেন ঃ

হেন্‌রিয়েটার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মধুসূদনের এক পূর্বতন কর্মচারী আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় প্রভুকে তাঁহার পত্নী-বিয়োগ-বার্তা জ্ঞাপন করিল। মুমূর্ষু আর্ত্ত মধুসূদন শুষ্ককণ্ঠে, রুদ্ধস্বরে কেবল বলিলেন, 'জগদীশ! আমাদিগের দুইজনকেই একত্র সমাধিস্থ করিলে না কেন? কিন্তু আমার আর অধিক বিলম্ব নাই, আমি সত্বরই হেন্‌রিয়েটার অনুবর্তী হইব।' এই শোক-সংবাদেই মধুসূদনের জীর্ণ বক্ষপঞ্জর চূর্ণ হইয়া গেল।...

সেই নিশীথের ঘন অন্ধকারে বিষাদক্লিষ্ট হৃদয়ে, ম্লান বদনে ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ, মধুসূদনের দুইজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া আলিপুরের চিকিৎসালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন।...তাঁহারা ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মধুসূদনের কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মুমূর্ষু মধুসূদন মুদিত নেত্রে শয্যায় শায়িত হইয়া আছেন। জনৈক বালক ভৃত্য তাঁহার শয্যাতলে বসিয়াছিল। তাঁহাদের পদশব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র মধুসূদন চক্ষু চাহিয়াই অতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন মনোমোহন, সকল ত ভদ্রোচিতভাবে সম্পন্ন হইয়াছে? কোনও ত্রুটি হয় নাই? কে কে উপস্থিত ছিলেন? বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্র ও দিগম্বর উপস্থিত ছিলেন কি?' মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, 'সকলই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে, কোন ত্রুটি হয় নাই। বিদ্যাসাগর প্রভৃতিকে সংবাদ প্রেরণের সময় হয় নাই।' এই কথা শুনিয়া মধুসূদন কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে মনোমোহনকে বলিলেন, 'তুমি ত শেক্‌স্‌পীয়র পড়িয়াছ, সেই কয়টি পংক্তি কি তোমার স্মরণ হয়?' মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, 'কোন্ কয়টি পংক্তি?' মধুসূদন 'লেডী ম্যাকবেথের মৃত্যুতে ম্যাকবেথ যাহা বলেন? আমার স্মৃতিলোপ হইয়া আসিতেছে কোন কথাই আর আমার স্মরণ হয় না।' এই বলিয়াই তিনি ম্যাকবেথের নিম্নোদ্‌ধৃত উক্তিগুলি সুস্পষ্টরূপে আবৃত্তি করিলেন :—

To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time,
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out brief candle,
Life's but a walking shadow ; a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more ; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing—

মৃতকল্প মধুসূদনের মুখে উক্ত প্রাণময় আবৃত্তি শুনিয়া মনোমোহন ঘোষ বিচলিত হইয়া বলিলেন, "এ সকল কথায় কাজ নাই। আপনি আরোগ্য লাভ করিবেন, চিন্তা নাই।" এই কথায় ঈষৎ হাসিয়া মধুসূদন বলিলেন, "ডাঃ পামার অদ্য যখন আমার প্লীহা-যকৃতের অবস্থা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে আসেন, তখন আমার নির্বন্ধাতিশয্যে নিতান্ত অনিচ্ছায় জানাইয়াছেন যে, আর দুই তিন দিনের মধ্যেই আমাকে ইহজগৎ হইতে বিদায় লইতে হইবে। অতএব ভাবিয়া দেখ, আমার দিন, ঘণ্টা, মিনিট সীমাবদ্ধ। You see, Monu, my days are numbered, my hours are numbered, even my minutes are numbered. এক্ষণে আমার এই শেষ অনুরোধ, "তোমার অন্ন থাকিলে যেন আমার পুত্র দুটি তোমার পুত্রগণের সহিত অন্ন পায়। তুমি যদি ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্তমনে প্রাণত্যাগ করিতে পারি। If you have one bread, you must divide it between yourself and my children ; if you say you will, I depart with consolation." প্রত্যুত্তরে মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, "আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যদি

আমার পুত্রগণ এক মুষ্টি খাইতে পায়, তাহা হইলে তাহারা আপনার পুত্রদ্বয়কে না দিয়া কখনও খাইবে না। Certainly, I assure you, so long as my children have bread to eat, they shall divide it with yours." এই কথায় পুলকপূর্ণ হইয়া, মনোমোহনের হস্ত ধারণ করিয়া মধুসূদন আবেগে বলিয়া উঠিলেন, "God bless you, my boy."

ক্রমেই মধুসূদনের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগলো। তাঁর মৃত্যু যে আসন্ন, সে বিষয়ে কারো সংশয় ছিল না। তাই তাঁর অন্ত্যেষ্টি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন ও আলোচনা দেখা দিলো। মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের অল্পকাল পর থেকেই গির্জার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক ছিল না। তিনি চার্চ অব ইংলণ্ডের অধীন ওল্ড মিশন চার্চে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ঐ চার্চের সঙ্গেও তাঁর কোন সংস্রব ছিল না। তাই চার্চ অব ইংলণ্ডের পাদরিরাও তাঁকে স্বীকার করছিলেন না। এজন্য মধুসূদনের খ্রীষ্টান বন্ধুরা মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টি সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। একদিন রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হাসপাতালে কথাপ্রসঙ্গে মধুসূদনকে বললেন: "তুমি কোন গীর্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলে না। তাই তোমার অন্ত্যেষ্টি নিয়ে নানা বিতর্ক দেখা দিয়েছে। তোমার অন্ত্যেষ্টিতে বিঘ্ন দেখা দিতে পারে। আমি এ ব্যাপারে লর্ড বিশপের অনুমতি নেওয়ার চেষ্টা করব।"

অন্তিম শয্যায় শুয়েও মধুসূদন তেজের সঙ্গেই বললেন: "আমি মানুষের তৈরি গির্জার সঙ্গে সংস্রব রাখা প্রয়োজন মনে করি না। আমার কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। I am going to rest in my Lord. He will hide me in His best resting place."

হেন্‌রিয়েটার মৃত্যুর তিনদিন পরে ২৯শে জুন, ১৮৭৩, রবিবার সকাল থেকেই মধুসূদনের জীবনীশক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এলো। ঐদিন, বেলা দুটোর সময় মধুসূদন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তখন মধুসূদনের বয়স মাত্র উনচল্লিশ বছর কয়েক মাস।

মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টি নিয়ে সত্যই গোলযোগ দেখা দিল। তাই রবিবার অপরাহ্ণে মধুসূদনের মৃত্যু হ'লেও ঐদিন তাঁকে সমাহিত করা গেল না। তাঁর বন্ধুরা বিচলিত হয়ে পড়লেন। ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপযুক্ত মর্যাদায় মধুসূদনকে সমাহিত করবার সমস্ত ব্যয় বহন করেছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টান পাদরিরা তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত করতে ইতস্ততঃ করায় তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই তাঁর মরদেহ সমাহিত করতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা বিলম্ব হ'লো। নগেন্দ্রনাথ মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন :

> মধুসূদনের মৃত্যুসংবাদ বিদ্যুৎগতিতে শহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ...অবিরাম জনসমাগমে, খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগণের মতভেদ ও বাদানুবাদে, বন্ধুগণের পরামর্শ প্রভৃতি নানা কারণে সেইদিন তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। তাঁহার মরদেহ পুষ্পাচ্ছন্ন করিয়া ২৪ ঘণ্টারও অধিক কাল মৃতাগারে সুরক্ষিত হইয়াছিল। ..
>
> পরদিন ৩০শে জুন সোমবার (খ্রীঃ ১৮৭৩) অপরাহ্ণে মধুসূদনের মৃতদেহ টমাস অ্যাণ্ড কোম্পানী লোয়ার সার্কুলার রোড সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ করিবার জন্য লইয়া গেলেন। ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মধুসূদনের ব্যারিস্টার বন্ধুগণ, তাঁহার পুত্রকন্যা-জামাতা ও অন্যান্য কুটুম্বগণ, বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র এবং তাঁহার স্বদেশবাসী প্রায় সহস্র ব্যক্তি ধীরে, নীরবে সাশ্রুনয়নে তাঁহার শবাধারবাহী মন্থরগতি শকটের অনুগমন করিয়াছিলেন।...
>
> যখন মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টির বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল, যখন মতভেদ-নিবন্ধন পাদরিগণ লর্ড বিশপ মহোদয়ের অনুমতি গ্রহণের জন্য যুক্তি ও পরামর্শ করিতেছিলেন,—তৎপূর্বেই সেণ্ট জেম্‌স্ গির্জার আচার্য (Chaplain) রেভারেণ্ড ডাক্তার পিটার জন জারবো স্ব-ইচ্ছায় মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টি নির্বাহের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি কাহারও মতামত গ্রাহ্য করেন

নাই। এমন কি তিনি মধুসূদনের পারলৌকিক ক্রিয়ার নিমিত্ত লর্ড বিশপের অনুমতির অপেক্ষা রাখেন নাই। মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টি-সমস্যার সময়, মহামতি জার্‌বো নির্ভীকচিত্তে মতবিরোধী পাদরি-দিগকে বলেন যে, "যখন তিনি খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজ হইয়া মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছিলেন, তখন কেন আমরা তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিব না? তাঁহার খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস ছিল না, এ কথা কে বলিতে পারেন?" ..

কবির শবাধার সমাধি-বিবরের উপরিভাগে সুরক্ষিত হইলে রেভারেণ্ড জার্‌বো মহোদয় Anglican Church-এর ক্রিয়াপদ্ধতি ও বিধি-অনুষ্ঠানুযায়ী মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ডাক্তার জার্‌বো ও কবির আত্মীয়-স্বজন সকলে এক-এক মুষ্টি মৃত্তিকা শবাধারের উপর নিক্ষেপ করিলে, শেষ-ক্রিয়া সমাধার পর বন্ধুবর্গ ও উপস্থিত জনমণ্ডলী শবাধার পুষ্পে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শববাহকেরা উন্মুক্ত ধরিত্রীগর্ভে কবিদেহসমন্বিত শবাধার ধীরে ধীরে নামাইয়া দিল। তৎপরে মৃত্তিকারাশির দ্বারা সমাধিবিবর পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইল। .....

কবির সমাধিস্থান অযত্নেই কয়েক বছর পড়েছিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইউনিটারিয়ান পাদরি রেঃ ডালের মৃত্যু হ'লে তাঁর সমাধি উপলক্ষে সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ সমাধিক্ষেত্রে যান। সেই সময় তাঁরা জানতে পারেন যে, মধুসূদনের সমাধির ওপর কোন স্মৃতিসৌধ নেই। তখন থেকে মধুসূদনের সমাধির ওপর উপযুক্ত স্মারক স্তম্ভ নির্মাণের জন্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 'মাইকেল মধুসূদন সমাধিস্তম্ভ স্থাপন তহবিল' নামে একটি তহবিল খোলা হয়। ঐ তহবিলে মহারাণী স্বর্ণময়ী, ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়, মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, শের-পুরের হরচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি ধনী ব্যক্তিরা প্রচুর অর্থ দান করেন।

অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং জনসাধারণও মুক্তহস্তে ঐ তহবিলে অর্থ দান করেন। এইভাবে অর্থ সংগৃহীত হ'লে Messrs. Llewelyn and Co.-কে কবির সমাধির ওপর একটি মর্মর স্মারকস্তম্ভ নির্মাণ ও স্থাপনের ভার দেওয়া হয়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ মহাসমারোহে অসংখ্য মধুসূদন-অনুরাগীর উপস্থিতিতে ঐ সমাধিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করেন। ঐ স্মারক-স্তম্ভের একদিকে মধুসূদনের স্বরচিত 'দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে' ইত্যাদি সমাধিলিপিটি উৎকীর্ণ করা ছিল। স্মারক-স্তম্ভের অপর পার্শ্বে উৎকীর্ণ করা ছিল ইংরেজীতে:

In memory of
MICHEAL MADHUSUDAN DATTA
One of the greatest poets of Bengal,
especially distinguished
AS AN EPIC POET
and as the first writer of blank verse.
BORN AT SAGARDARI IN THE DISTRICT
OF JESSORE in 1823 A. D.
DIED ON THE 29TH JUNE, 1873, A. D.
This tomb is erected in the year 1888
by his greatful and admiring
COUNTRYMEN

———

ঘটনাপঞ্জী

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ	হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা।
১৮২০ "	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম।
১৮২৪ "	মধুসূদনের জন্ম (২৫শে জানুয়ারি), সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা।
১৮২৬ "	গোলদীঘিতে সংস্কৃত কলেজ ভবনে হিন্দু কলেজের স্থানান্তরণ।
১৮৩১ "	রাজনারায়ণ দত্তের কলকাতায় সদর দেওয়ানি আদালতে ওকালতি আরম্ভ।
১৮৩৩ "	মধুসূদনের কলকাতা আগমন ও হিন্দু কলেজের সর্বনিম্ন শ্রেণীতে প্রবেশ ; রামমোহন রায়ের মৃত্যু।
১৮৩৯ "	মধুসূদনের সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়ন ও সহপাঠিরূপে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ।
১৮৪০ "	মধুসূদনের ষষ্ঠ শ্রেণীতে (জুনিয়র স্কুলের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে) অধ্যয়ন এবং গৌরদাস বসাকের সঙ্গে সহপাঠিরূপে ঘনিষ্ঠতা।
১৮৪১ "	সিনিয়র স্কুলের সর্বনিম্ন শ্রেণী পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ এবং জুনিয়র বৃত্তি লাভ।
১৮৪২ "	জুনিয়র বৃত্তিলাভের ফলে পঞ্চম থেকে একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তরণ ; স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ইংরেজী প্রবন্ধ রচনায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে স্বর্ণপদক লাভ ; ইংলণ্ড গমনের জন্য ব্যাকুল উচ্চাশা ; তমলুক ভ্রমণ।
১৮৪৩ "	মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ (৯ই ফেব্রুয়ারি)।
১৮৪৪ "	বিশপ্‌স্ কলেজে প্রবেশ (নভেম্বর)।
১৮৪৮ "	মাদ্রাজ গমন ; মাদ্রাজ মেল অরফ্যানস অ্যাসাইলামে অধস্তন শিক্ষকের পদ লাভ ; Captive Ladie কাব্যের প্রকাশারম্ভ ; রেবেকা ম্যাক্‌টাভিসের সঙ্গে বিবাহ।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ Captive Ladie ও Visions of the Past কাব্য ও কবিতার গ্রন্থাকারে প্রকাশ; কলকাতায় সহাধ্যায়ী গৌরদাস ও ভূদেবের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন; রেবেকার ও মধুসূদনের প্রথম সন্তানের (কন্যা) জন্ম; বীটন (বেথুন) সাহেবকে Captive Ladie উপহার দান; মিঃ বীটনের পরামর্শ— মধুসূদনের বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি।

১৮৫১ " জননী জাহ্নবী দেবীর মৃত্যু; মধুসূদনের গোপনে কলকাতা আগমন, পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও মাদ্রাজ প্রত্যাগমন; Hindu Chronicle নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদন।

১৮৫২ " মাদ্রাজ 'বিশ্ববিদ্যালয়ের' হাইস্কুল বিভাগে দ্বিতীয় টিউটরের পদ লাভ; Hindu Chronicle-এর সম্পাদনা ত্যাগ।

১৮৫৫ " 'স্পেক্টেটর' দৈনিক কাগজের সহ-সম্পাদকের পদে কাজ; সম্ভবতঃ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজ ত্যাগ; পিতা রাজনারায়ণ দত্তের মৃত্যু; হেন্‌রিয়েটার সঙ্গে প্রণয়; সম্ভবতঃ রেবেকার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও হেন্‌রিয়েটাকে পত্নীরূপে গ্রহণ।

১৮৫৬ " মাদ্রাজ ত্যাগ, কলকাতায় প্রত্যাবর্তন (২রা ফেব্রুয়ারি); পুলিস কোর্টে হেড ক্লার্কের পদ লাভ; দোভাষীর পদ লাভ; ৬নং আপার চিৎপুর রোডে বাস আরম্ভ; হেন্‌রিয়েটার কলকাতা আগমন।

১৮৫৮ " 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ; 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা; 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ। কন্যা শর্মিষ্ঠার জন্ম।

১৮৫৯ " 'শর্মিষ্ঠা' নাটক প্রকাশ (জানুয়ারি); 'পদ্মাবতী' নাটক রচনা; 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন রচনা; 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য' রচনা; বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'শর্মিষ্ঠা'-র মঞ্চাভিনয় (৩রা সেপ্টেম্বর); "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" রচনা।

১৮৬০ " 'পদ্মাবতী' নাটক প্রকাশ (এপ্রিল); 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য' প্রকাশ (মে); অসমাপ্ত 'সুভদ্রা-হরণ' নাট্যকাব্য ও 'রিজিয়া' নাটকের সার-সংক্ষেপ রচনা: 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনারম্ভ (এপ্রিল); 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা (আগস্ট-সেপ্টেম্বর); "মেঘনাদবধ কাব্য" ১ম খণ্ড রচনা সমাপ্ত।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ "মেঘনাদবধ কাব্য" প্রথম খণ্ড প্রকাশ (৪ঠা জানুয়ারি); বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা লাভ (১২ই ফেব্রুয়ারি); মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড রচনা শেষ ও প্রকাশ (আগস্ট); জ্যেষ্ঠপুত্র ফ্রেডেরিক মাইকেল মিল্টন দত্তের জন্ম (জুলাই); বীরাঙ্গনা কাব্য রচনা; পৈতৃক ভূ-সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা (অক্টোবর)।

১৮৬২ " "বীরাঙ্গনা কাব্য" প্রকাশ (মার্চ); Hindu Patriot কাগজ সম্পাদনা; খিদিরপুরের পৈতৃক ভবন বিক্রয় (মে); বিলাত-যাত্রা (৯ই জুন); ইংলণ্ডে উপস্থিতি ও ব্যারিস্টারি শিক্ষার জন্য 'গ্রেজ্ ইনে' প্রবেশ।

১৮৬৩ " মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, বিলাতে অর্থকষ্ট, পুত্র-কন্যাসহ হেন্‌রিয়েটার ইংলণ্ড গমন (২রা মে); ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্সে গমন; 'দ্রৌপদী স্বয়ম্বর' প্রভৃতি কয়েকটি কাব্য রচনা-প্রয়াস; ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা।

১৮৬৪ " চরম অর্থ সংকট; বিদ্যাসাগরের নিকট সাহায্য ভিক্ষা; বিদ্যাসাগর কর্তৃক অর্থ প্রেরণ শুরু (২রা আগস্ট)।

১৮৬৫ " "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" রচনা; ইংলণ্ডে আগমন।

১৮৬৬ " "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" প্রকাশ (১লা আগস্ট); ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় পাস (নভেম্বর)।

১৮৬৭ " স্বদেশে একাকী প্রত্যাবর্তন; স্পেন্‌সেস হোটেলে বাস; হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায়ের অনুমতি লাভ (৩রা মে); আইন-ব্যবসায়; গাড়ি থেকে পতন, অসুস্থতা; 'হেক্টর-বধ' রচনা।

১৮৬৮ " পৈতৃক ভূ-সম্পত্তি বিক্রয় এবং বিদ্যাসাগরকৃত ঋণ-শোধ।

১৮৬৯ " ফ্রান্স থেকে পুত্রকন্যাসহ হেন্‌রিয়েটার প্রত্যাবর্তন; ৬নং লাউডন স্ট্রীটে বাস।

১৮৭০ " হাইকোর্টে প্রিভি কাউন্সিলের অনুবাদ-বিভাগের পরীক্ষকের পদ লাভ। সম্ভবতঃ কনিষ্ঠ পুত্র অ্যালবার্ট নেপোলিয়নের জন্ম।

১৮৭১ " "হেক্টর-বধ" প্রকাশ; সরকারী চাকরি ত্যাগ ও পুনরায় ব্যারিস্টারি।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ ঢাকা গমন ও সংবর্ধনা লাভ; পুরুলিয়া গমন ও পঞ্চকোটের মহারাজার আইন-পরামর্শদাতার কাজ গ্রহণ; ঐ চাকরি ত্যাগ; কন্যা শর্মিষ্ঠার বিবাহ।

১৮৭৩ মধুসূদনের অসুস্থতা বৃদ্ধি; বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্বোধন; 'মায়াকানন' ও 'বিষ না ধনুর্গুণ'-এর রচনা; উত্তরপাড়ার সাধারণ গ্রন্থাগারে কিছুদিন বাস; রোগ বৃদ্ধি; হেন্‌রিয়েটার অসুস্থতা; বেনিয়াপুকুরের বাসায় প্রত্যাবর্তন; মধুসূদনের আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা; হেন্‌রিয়েটার মৃত্যু (২৬শে জুন); মধুসূদনের মৃত্যু (২৯শে জুন)।

প্রধান প্রধান গ্রন্থের রচনার ও প্রকাশের কাল

	রচনাকাল (খ্রীঃ অঃ)	প্রকাশকাল (খ্রীঃ অঃ)
Captive Ladie & Visions of the Past	১৮৪৯	১৮৪৯
Translation of রত্নাবলী	১৮৫৮	১৮৫৮
শর্মিষ্ঠা	১৮৫৮	১৮৫৯
Translation of শর্মিষ্ঠা	১৮৫৮	১৮৫৯
পদ্মাবতী	১৮৫৯	এপ্রিল, ১৮৬০
একেই কি বলে সভ্যতা	১৮৫৯	১৮৬০
বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ	১৮৫৯	১৮৬০
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য	১৮৫৯	মে, ১৮৬০
ব্রজাঙ্গনা কাব্য	১৮৬০	জুলাই, ১৮৬১
মেঘনাদবধ কাব্য (প্রথম খণ্ড)	১৮৬০	জানুয়ারি, ১৮৬১
কৃষ্ণকুমারী নাটক	আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৬০	১৮৬১
মেঘনাদবধ কাব্য (দ্বিতীয় খণ্ড)	১৮৬১	আগস্ট, ১৮৬১
বীরাঙ্গনা কাব্য	১৮৬১	মার্চ, ১৮৬২
চতুর্দশপদী কবিতাবলী	১৮৬৫	আগস্ট, ১৮৬৬
হেক্টর-বধ	১৮৬৭	১৮৭১
মায়াকানন	১৮৭৩	মার্চ, ১৮৭৪

অশুদ্ধি-সংশোধন

৩৮ পৃঃ	১৫ পঙ্‌ক্তি	'খ্রীষ্টরবাদী'	স্থলে	'খ্রীশ্বরবাদী' হবে।
১৭৮ পৃঃ	২৫ „	"মে"	„	"জানুয়ারি" হবে।
